কবিতা সংগ্রহ ১

বাংলা একাডেমী : ঢাকা

উৎসর্গ

মানব মুখোপাধ্যায়

সূচি

ভ্রমণকাহিনি

সূচি

যন্ত্রণালিপি : ২

মানভয়, নির্মমতা হঠাৎ শরীরে ডেকে ওঠে, স্বাদু শব্দ, মৃত্তিকার গাঢ় রস, ধানবালকের কণ্ঠে দুর্গাটুনটুনি, লঙ্কাখেতের পাশে হেঁটে যায় চিদ্‌পসারিণী, তার বিরানব্বই নং দয়িতের চরসকটাক্ষ থেকে ঝরে পড়ে মুগ্ধ বিবমিষা—এমত দৃশ্যটি থেকে আমার অহং আমি খুলে নিয়ে আসি, দৃশ্যটি পড়ে থাকে নিছক দৃশ্যের মতো অসহায়, প্রাথমিক ইস্কুলের গুরু যেন, মাস গেলে ছাত্রের হাত থেকে কুমড়ো-কাঁকরোল আর তরুণী লঙ্কার ঝুড়ি নিতে হয়, লঙ্কা, ফের এসে লঙ্কাতে ঢলে পড়া গেল, গড়িয়াহাটের মোড়ে লঙ্কারা স্বল্পবাসে ঘোরাফেরা করে, এটুকু লিখেই ভাবি পংক্তিটি হয়তো বা বিনয়ী দেখাল, তাই তিক্ত থুতু ঠোঁটে নিয়ে চারটি দেয়াল আরো গড়ে নিই, চারটি নিরেট-সুউচ্চ আর মহান দেয়াল আমাকে সুনিশ্চিত টেবিলের দিকে ঠেলে দেয়, মাথা তোলবারও কোনো অবকাশ নেই, আ, এইবার মনোনিবেশের জন্য যথেষ্ট কারণ পাওয়া গেছে, আমার চশমার কাচ উল্লাসে ঝাপসা হতে গিয়ে সহসা থমকে যায়, প্রাণপণে দেওয়ালের মুখগুলো বিষণ্ণ শ্যাওলা দিয়ে ঢাকি, এইবার কোনো ছবি কখনো ভাসবে না, শাদা কাগজের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ি, নীল পেন...নীল পেন...না : , আর কিছুই ভাবিনা, কেবল শব্দগুলো লিখে যাই, ফুটে ওঠে চ্যাটার্লিগিন্নীর হাঁটাচলা, জন্মদরজায় গোঁজা ফুলকুঁড়ি, তাদের করুণগন্ধ দমবন্ধ করে দেয়, নির্জীব করে দেয়, যেমন নির্জীব হয়ে পড়ে আছে বাংলার লিরিক কবিতা।

ইস্তাহার

তোমাকে লিখছি, শোনো, এবারের শীতে আর আচ্ছাদন অবশিষ্ট নেই; পুরোনোপোশাক থেকে সমস্ত তুলো ছিঁড়ে আকাশে ছুঁড়েছি, হাঃ, এখন শরৎ; বিরুদ্ধ ঘূর্ণিঝড়ে বাংলাদেশ নিঃস্ব হয়ে গেছে, মাটি বড় দুর্বিনীতা আজ, গাছপালা আরো বেশি সবুজ কুমারী; তোমাকে লিখছি তবু, শ্যামল ভিনাস—তোমার পোশাক থেকে মুক্তাকীট ঝরে পড়ে, স্বরবৃত্তে যৌনকথামালা—তুমি শোনো, আভূমি বিষণ্ণতা আজ জমে উঠছে চোখে, ফেটে যাচ্ছে মাঝরাতে জমাট বাতাস, আর হঠাৎই ঘুমের মধ্যে বোবাকান্না : "বেঞ্জামিন...বেঞ্জামিন...কুথা গেলি, জাড়ে মাথা ফেট্যে যেচো বাপ্, জাড়ে বুক ফেট্যে যেচ্যে, হেখাকে মানুষজন ভাঙাচোরা, চিন্‌তে লারচি বাপ্, কুথা গেলি...", আঃ, ম্যালিগ্না আমার, তোমার শাসন থেকে দূরে এসে বাচ্চা হয়ে গেছি, আমার রক্তে কারা কথা বলে এর আগে কখনো বুঝিনি, কখনো ছুঁইনি আমি এর আগে বালিকার হাসি; তোমায় ধন্যবাদ—আমার অর্ঘ তুমি এতকাল নষ্ট করেছ, তোমায় ধন্যবাদ—আমার কষ্ট তুমি কখনো বোঝনি, ভালো থেকো, সুখে থেকো. শরীরচর্চায় তুমি ভুলে থেকো দারিদ্র্যের স্মৃতিশব্দদেশ, জীবাণুগ্রস্ত

ঐ পৃথিবীতে আর আমি কখনো যাবনা; কয়েকশো মাইল দূরে শীত আজ ভীষণ চ্যালেঞ্জ, আবিল মগজ জুড়ে স্মৃতি আজ চোরাহন্তারক, যে কোনো একক পথে সে আমাকে তাড়া করে, পিছনে ককিয়ে ওঠে শুভস্বস্তিদিন, কখনো মধ্যরাতে যখন স্নায়ুর দেহ অবশ অসাড়, সহসা দরজা ভেঙে ঢুকে পড়ে তোমার প্রদাহ—এবং, তখন শোনো, পৃথিবীতে বামপন্থা নেই, এবং তখন শোনো, টিলাবৃন্তে ঘর নেই কোনো, কেবল দুচোখ জুড়ে লিপ্সায় কেঁপে ওঠে তোমার ঐ প্রিটোরিয়া ঠোঁট, আর, তখনই শীতের চাড়ে ফেটে যায় মাটি, ফাটলের অন্ধকার গলা থেকে চিৎকার উঠে আসে, "বেঞ্জামিন...বেঞ্জামিন...কনে গেলি, এহানে মানুষগুলা ঘুম যায়, পিখিমিতে জ্ঞান কই বাপধন, কনে গেলি, ক্যান হেরা তোরে গাইতে দিলনা, তুই গাইবার পারলিনা..."

উন্মোচিত চিঠি : ১

উঠে আসছে সুভাষিত সহৃদয়হৃদয়সংবাদ। কোথায় এখন তুমি বসে আছ শীতকাল শরীরে জড়িয়ে? আমাকে জানাও ওগো, সেখানে তেমন কোনো মাঠ আছে কিনা, আছে কিনা দূর্বাদল, শিশিরের গাহনকাঁপুনি। এখানে জানলা দিয়ে অচিনরোদ্দুর, অনাবৃত ডিসেম্বরে জামার কলারে আছে আপাতত শান্তিকল্যাণ। তাই, বিপ্রদাস ভাই, এসো বার্নপুর বার্নপুর খেলি। এইভাবে প্রসূনসম্ভাষ এসে বলে যায়, "অপদার্থ, তুমি শুধু কবির আর্দালি। তোমার নিজস্ব কোনো কোষ নেই, রক্ত নেই, নেই কবির কথিত সেই কল্পনাপ্রতিভা।" কেবল নখের নীচে প্রতিদিন জমে উঠছে উন্মত্ত স্বজাতীয় ব্যালাস্টিক রাগ।

তাহলে কীভাবে বল পদ্য হবে অনাবিল ফসলের মতো? কীভাবে তোমার চোখে চোখ রেখে জলের দাগের মতো মুছে দেব ব্যক্তিগত কুষ্ঠফোঁটাগুলি? যখন পার্টিক্রিয়া ব্রহ্মচর্যা চায়, যখন পিতারা চান ভালো ছেলে, নিপাট নম্বর, তখন অবোধজনে কোল দিতে তুমি ছাড়া কে আছে আমার? উইনি ম্যাণ্ডেলা তুমি, শান্তশিষ্ট, মৃণালিনী, সানাইয়ে ভৈরোঁ শুনে মনে পড়ে উন্মাদের কথা? অন্ধকারে পাশাপাশি কবে যেন হেঁটেছি পাহাড়ে, কিংবা নন্দনবনে সেইবার ঋত্বিকের ফুটন্ত জীবন!

খঞ্জ অক্ষর অ্যাতো, এদেরও কোথাও কোনো মানে আছে কিনা, বলে দেবে আমাদের নাতিপুতি—তাদের সময়। আমি তো অমিত রায়, ক্রমাগত মাটি ছেড়ে কেটে পড়তে চাই—লোকগাথা এরকমই বলে। আরো যারা বেশি চেনে তারা বলে, "ঐ দেখ, ডোরিয়ান নিজের ছবির কাছে বসে আছে।" তবু কি সকলে চেনে? কেউ কেউ, অন্তত তুমি কি জাননা, কীভাবে রগের মধ্যে দপ্‌দপ্ করে উঠছে বোলপুর উপনির্বাচন? কীভাবে রাঢ়ের চোখ সহসাই সবুজাভ গুজবকুয়াশা! আমার দুঃস্বপ্নে থাকে তথ্যরাজি—দুক্কুরে ভূতের ঢ্যালা ঝরে পড়ছে চারপাশে, ক্ষরা ফাটা পায়ে সীমান্ত ডুবিয়ে দিয়ে বর্ধমানে ঢুকে পড়ছে সংখ্যাতীত ক্ষেতের মজুর, অন্তত হাজার তিরিশ।

তাহলে কীভাবে বলো ওজনে সমান হবে শ্যাম-কূল? তাহলে কীভাবে বলো খাপে-খাপে ঢুকে পড়ব আমলাবাগানে? অথবা কবির দলে—ভঙ্গবঙ্গজোড়া খেউড়ের সুনিশ্চিত অন্ধকার নীড়ে? বল্ বউ, বল সরস্বতী?

স্বদেশ আমার

তোমাকে এখন আমি ভালোবাসি। কেননা এখন, তোমার কপাল ঢাকে বৈদ্যুতিক সংগঠিত মেঘে। কেননা, কাঁকনহীন তোমার হাতের রূপ বহুদিন ছায়াবৃতা, গমিতমহিমা। হায় মেয়ে, অধুনা সপ্তদিকে সাতটি ঘাতক দেখো, নীচে ফাঁদ উপরে টর্নাডো। অন্যপাশে আমি, শুধু আমি, যমের দক্ষিণদ্বার আগলে আছি মধ্যবিত্ত পিঠে। এখন তোমাকে আমি ভালোবাসতে পারি। কেননা এখন, আমারও বিশেষ কিছু হারাবার নেই।

সেদিন পশ্চিমবনে যখন সূর্যের রং বিয়োগান্ত নাটকের মতো, তোমাকে ডাকিনী ভেবে ভয় পেল তরুণ কবিরা। তোমাকে পুড়িয়ে মারা এযাবৎ গতানুগতিক। তাই, বাতাসে ত্রাসের সেই শব্দ পেয়েই বুঝেছি আজ সব দোষ খেয়ে ফেলবে ধানের মরাই। যা ভেবেছি ঠিক। জয় জয় হে, জ্বলে উঠল আগুন। আর তারপর, নিছক ভূতের গল্পে কখন ফুরোলো দিন—এখনো বোঝনি?

পঙ্গু জন্তুরা সব জেগে উঠছে। দেখো, চেয়ে দেখো। কে কোন বাতাসে শ্বাস নেবে সেটা আজ গুণ্ডারা ঠিক করে দেয়। দেখো, চেয়ে দেখো। শীতঘুম ছুঁড়ে ফেলে জেগে উঠছে সাপ। তেকোণা পাখনা যত ভেসে উঠছে সমুদ্রের জলে। প্রতিটি খুনির চোখ এখন প্রস্তুত। তোমার রেহাই নেই। কোন্ শালা বর্গাচাষী পাট্টা চেয়েছে? তোমার রেহাই নেই। কোন্ শালা লেদম্যান বোনাস চেয়েছে? তোমার রেহাই নেই। প্রতিটি গির্জার ঘড়ি জিরো আওয়ারের কথা বলে। প্রতিটি মন্দিরে শোনো শুভমস্তু বলি-র আরতি। তোমার রেহাই নেই। ছুরি ও দাঁতের ফলা নিখুঁত ধারালো।

এখন তোমাকে আমি ভালোবাসি। কেননা এখন, ওদের হত্যার নামই ভালোবাসা।

ডিসেম্বর

১.

স্ল্যামপ্রোগেত্তির পৌষমাসে হরিজন বস্তিময় উত্তাপ জমে জমে ফেটে পড়ে লাক্ষাদাবানল। উল্লোল শিখাঢেউ ছড়ায়, গড়ায়। নেচে কুঁদে চেটে নেয় ক্ষেতের ফসল। বেলফুল হাতে

নিয়ে খেলা দেখে দুন-মাফিয়ারা। বাহবা বাহবা, ভোলা-ভূতো-হাবা খেলিতেছে বেশ। বঙ্গাল মুলুক থেকে প্রিয়বাবু ঔর কুছ বাঈ ভেজিয়েছে! কিঁউ ভাই অর্জুন সিং, লে আও শরাব।

২.

সংবাদ মূলত কাব্য, সেহেতু পাঠক, যে হরিণ এতাবৎ আগুনে পুড়িল তাহারও খবর আছে কোনো এক কবির খাতায়। আপনারা কবিতা পড়েন? এই শুনে সুধীজন স্মাইল দিলেন। "কার কথা বল ভাই? কবিতা...অর্থাৎ কিনা অমিয়া ঠাকুর যবে গান গায় অকাদেমি ঘরে তখন এক মহিলাকে ঘুরতে দেখেছি আশেপাশে। ঐ তাঁর নাম বুঝি? যাই বল, বড্ড বয়েস বাপু।" অন্যজন আরও স্বাদু স্বরে হৃদয় জুড়িয়ে দিয়ে বলে উঠলেন, "তুমি তো পরমা-র বাবা! বৃদ্ধা না হলে বুঝি আজকাল....থেরাপি করাও খোকা, শেষকালে বিপদে পড়বে।" এই সবই হয়ে থাকে, হে প্রগাঢ় পিতামহী আজও চমৎকার...

৩.

মেঝেতে তোমার ছায়া! আচুলপায়েরনখ আবরণহীন। শীতসন্ধ্যা শ্রোণীহাড় কিছুটা ঢেকেছে। ভারসাম্যহীনা আছো চৌকাঠে এখনও দাঁড়িয়ে। সেই চোখ, সেই ত্বক, স্তনের উপরে সেই পরিচিত মিথুনআঁচড়। তোমার ঠোঁটের রূপ কেঁপে উঠছে নিখুঁত দাদরায়। কেঁপে উঠছে তারুণ্যের কলকাতা, বাঙালি সমাজ। টেবিলে তোমার ছায়া, আবরণহীন, আর তুমি এখনও দাঁড়িয়ে! না, প্রিয়তমা, বেরুবার দরজা ওদিকে।

৪.

তাহলে পৃথক আছি কতদিন আর? আলতা পরিও সখী, বৈষ্ণবীর মতো ভালে দিও খড়িমাটি ফোঁটা। বিনুনী বাঁধিও সখী, বিধুমুখে সংস্থিতা থেকো। নিশাকালে হংসদূত যখন ফিরিবে, চিঠি তার পায়ে বেঁধে দিও। এদেশে কপোত আর নিরাপদ নয়। কে জানে কখন কেউ ছোঁড়ে কিনা পরমাণুবাণ। আমারও শরীরে জেনো, কলি আর বেশিদিন নেই। এই শীতে নির্ঘাত বিদায় জানাবে। আর তারপর তোমার বাহুতে আমি এঁকে দেব প্লাবনের প্রতীকনির্যাস। ভূপল্লবে ডাক দিলে দেখা হবে ব্রিগেড প্যারেডে। এটুকুই সুনীলস্বীকার। শুধু বলো, এই হাত ছুঁয়েছে তোমার মুখ, আমি কি নিশান ছাড়া এই হাতে ছুঁতে পারি অন্য কোনো কিছু?

৫.

আজি হতে শতবর্ষ পরে কে তুমি পাঁজর খুলে শান দাও পাথরে-পাথরে? সহসা আকাশ আজ কনের চেলির মতো ছেড়ে এল অতীত জীবন। বাজে শাঁখ, বাজে উলুরব। এসো মেয়ে, অলক্ত চরণরেখা এঁকে দাও শিয়রে, কপালে। সারা রাত্রি জেগে থেকো, লোহার বাসর মাগো সব থেকে নিরাপত্তাহীন। দূরের পশ্চিম দিকে সাপেদের সভা শুরু হল।

একশ বছর ধরে কে যে কত মানুষ মেরেছে তার হিসাবনিকাশ। জেগে থেকো, সারা রাত্রি জেগে থেকো মাগো। প্রতিটি রন্ধ্রপথে ঢেলে দিও কার্বোলিক, পেতে দিও ফায়ার অ্যালার্ম। এসো, তারপর স্বামীর শরীরে হাত দাও।

স্যামপ্রোগেস্তির পৌষমাসে সর্বনাশ চোখে নিয়ে ঐ দেখ উঠে বসছে তোমার পুরুষ...

ভ্রমণকাহিনি

কাগজে বসাই তবে আনুবাবু...। এই বাস, এই তো গড়িয়া আর এই হল রথতলা স্টপ্। এইবার কোনদিকে যাব? এ গলি না ঐ গলি, আনুবউ? অ্যাই দেখ, যেটুকু বিকেলবেলা এতক্ষণ পকেটে এনেছি, কখন চুঁইয়ে গেছে তার আভারং! তাই বলি, বুড়ো ঘাসদের গালে এমন লালিমা...অবশ্যই পুং, আনু, বাজে কথা মনেও এনো না। কিন্তু, কী হবে আজ, বাড়ি ফিরে কী দিয়ে সাজাবে তবে ঘর? মেনে নিচ্ছি বিদ্যুতের স্বাস্থ্য এখন কিছু ভালো। শুভেচ্ছাও নেওয়া গেল এজন্য কিছুটা। তবু আনু, তোমার ফ্লাওয়ারদানে যেটুকু বিকেল আজ বাঁচিয়ে রাখবে ভেবেছিলে—ভেবেছিলে, অন্ধকারে কয়পল সেইদিকে চেয়ে থাকা যাবে...বেশ তাই, নাহয় তামাদি হোক এসব বিষাদ। আপাতত বাড়ি নিয়ে চলো।

কবিতা লিখতে আমি এখনো পারিনি, তুমি জানো। এটাই মুস্কিল হয়, জানে বেশি বোঝে কম আজকাল সবকটা মেয়ে। কিছুটা উল্টো হলে তবুও নিস্তার পাওয়া যেত। তার থেকে পাশে এসে বোসো। সারাদিন মাথা তো বাঁধাই থাকে, চুলদেরও দেওয়া ভালো অন্তত কিছু স্বাধীনতা। তুমি তো আমাকে ভালোবাসো, আনুবউ, বলতো কতটা?

ভালোবাসার জন্য শুধু, মনে রেখো, তেইশটা বছর ছিঁড়ে উড়িয়ে দিয়েছি। ভালোবাসার জন্য আমি অক্ষরের হাঁটু ধরে রয়ে গেছি ভূলুণ্ঠিতা পরিত্যক্তা মীরা। ভালোবাসার জন্য আমি এতদিন এতকাল অশ্রুপাত, মনে রেখো, ভালোবাসার জন্য আমি শহরের পথে পথে স্রোতবদ্ধ অগ্নিক্ষরা লাভা। আনু, আনুবউ, বলো, এত ভালোবাসা আমি কোথায় লুকোব?

অথচ, লুকোতেও হয়। আট দশকের শেষে কিশোরীরা কমবেশি বাস্তবতাবাদী। ভালোবাসা তবে আনু বাস্তবতা নয়? শুধু কি বাসের হর্ন, অলস কেরানি আর পুষ্ট পুলিশ হবে বাস্তবিক কবিতার কথা? আমার বিস্ময় বুঝি বড় বেশি আশ্রমিক হল! যতি দাও, আমিও যেমন বুঝি কাব্য-কাহিনি, মনে হয়, তুমিও তেমনই বোঝ। তার চেয়ে ঐ দেখো, আকাশে

হঠাৎ করে উঠে এল আক্ষরিক চাঁদ। এখানে নামল সন্ধ্যা, সূর্যদেব, তোমার প্রভাত হল সান্তিয়াগো শহরের পথে, নাকি এল-সালভাদরে?

এরকম অবকাশে এসো তবে শরীরের থেকে যত ক্লান্তিবাকল খুলে ফেলি। মুখ তোলো আনুবউ, জ্যোৎস্না পড়ুক চোখে, উদ্ভাস সত্যিকথা হোক। তোমার আঙুলে কেন তাপ নেই? শীত...এত শীত করে আনু, সমস্ত স্নায়ু ভেঙে শীতের প্রদাহ নেমে আসে। আমাকে জড়াও আর এখন কোথাও কেউ শব্দ কোরোনা। বেপথু অলকদামে জেগে ওঠো উনিশশতক। অনেক দূরের থেকে ভেসে আসে গান। অন্যটি জ্যোতিদাদা হলে, বল বউ, কিশোর কণ্ঠটি তবে কার?

আমি কী ভীষণভাবে তাকে চাই অন্তত আনুবউ জানে।

উন্মোচিত চিঠি : ২

আমার আহ্নিক গতি? এ কি কোনো নতুন খবর? আমি তো জানিই আছে কোনখানে কুঁকড়োর দ্যুতিময় অহমিকা, কোথায় বা প্যাঁচাদের ঘোঁট। আমি তো জানিই, আমি ছুঁয়ে আছি ত্রিশিরার তিন মুখ, রাত্রিবাতাসের কথা শুনে থাকি, জানি। এতদিন তাই তোমাদের পদপাতে—স্পৃষ্ট কণা-দেরও কাছে—রয়ে গেছি শর্তহীন সমর্পণশীল। এখন তোমরা কারা? চিনতে পারি না আমি! তোমরা কি এতদূর চিত্রকবিতা, জ্যেষ্ঠগণ, বুঝতে পারি না!

তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি, বিচিত্র ছলনাজালে, হে ছলনাময়—আমার আর্তনাদ এইভাবে রাখা যেতে পারে? কিন্তু, কী লাভ তাতে, ঘটনা কি ঘুরে যায় কিছু? আমি তো বিকারগ্রস্ত, মধ্যরাতে হাইডের একান্ত দোসর। বারংবার তাই, স্নান সেরে নিতে গেছি তোমাদের বাড়ির পুকুরে। হায় জ্যেষ্ঠ, তবে কি আমারই ভুল, মানুষের ইতিহাস তবে এত অহল্যাসঙ্কাশ!

উপরের কথাগুলো কেটে দিলে ক্ষতি নেই। কেননা তবুও জানি, তবুও মানব থেকে যায়। নাহলে সহসা হত এ লেখার আকস্মিক ছেদ। পুরু অন্ধকারে তবু কোথাও কিছুটা আলো থেকে যায়। আর তাই, এখন মাথায় কেউ হাত রাখে, বলে, ''উদ্বন্ধন ভালো নয়, ভালো নয় রেলে মাথা অথবা ছ'তলা থেকে লাফ।'' সেই ভালো, এসো পার্টি', বহুভাগ্যে ব্যক্তি নও তুমি, নিয়ে চলো উদ্ধারণপুর। যেখানে কাজিয়া হয়, মানুষেরা গাল পাড়ে, বাবা মা-কে খেতে পরতে দেয়, দ্বিতীয় বিবাহের আগে অন্তত কিছুদিন লজ্জাবোধ করে।

এখন রাত্রি জুড়ে বীভৎস উল্কিদাগে প্রত্যেকেই ভরে নিচ্ছি মুখ। ভোরবেলা ঘুম চোখে এতসব মুখচ্ছিরি দেখে আমাদের সন্তানেরা ভয় পেতে ভুলে যাবে বুঝি। দম্‌কা হাসির সাথে ছুঁড়ে মারবে ইঁট, জুতো, কাদা, পচা ডিম।

এবং, আমরা তো জানি, শিশুরা নিষ্ঠুর।

রাধাকথন

কবিতাটবিতা নয়, সেসবের চেষ্টাও নয়, সোজা-সাপ্‌টা কথা আছে কিছু। বন্ধুগণ, আশঙ্কার কিছু নেই বলি যদি, মিথ্যে বলা হবে। সুতরাং, ফোড়নের দূরাগত যে শব্দ শোনা গেল (ঐ রে! অমিতবাক প্যালা দেবে) তার সারবত্তা নিয়ে আমারও বিশেষ কোনো সন্দেহ নেই। অতএব বক্তৃতায় প্রচলিত ঠমকেগমকে এইবার শুরু করা যাক।

'সমাজতন্ত্র'—এই শব্দটি শুনে হারুবাবু এখনো বিমূঢ়। সর্বজনপ্রিয় কবি নিতাই মল্লিক (এখানেও উপস্থিত বুঝি!) বিষণ্ণ হবার লাগি যথেষ্ট কারণ খুঁজে পান একমাত্র ঐ শব্দটিতে। এছাড়া, হ্লাদিনী (মানে বাপু আমিও জানিনা) সেই সামাজিকা প্রমোদতরুণী একই শব্দে পেতে চান কিছুটা গোপালভাঁড়। এবং, ঐ তো বসে, অধুনাতিক্ত সেই একদাবিপ্লবী, যে আমাকে বলেছিল, "সমাজতন্ত্র মানে বেশ্যালয় ছাড়া আর কিছুই বুঝিনা আজকাল।" সুভাষিত বাক্য ছিল সেটি, কিছুটা নার্সিসিস্ট, তবুও বুঝিনি মানে, দুর্বোধ্য লেগেছিল আধুনিক কবিতার মতো।

তো, বন্ধুগণ, বক্তৃতা সমাজতন্ত্র নিয়ে। আমার বারোমাস্যায় দেখি ও শব্দের অনটন, অর্থাৎ ও শব্দের নীতিগত পাকা অবস্থান। এবং স্বপ্নাদেশে গতরাতে একথা জেনেছি—সমাজতন্ত্র ছাড়া এই পোড়ামুখে অন্ন, প্রাণ, চেতনা, অক্ষর...মোদ্দা কিছুই আর রুচিবেক নাই। অবশ্যই, বিদগ্ধেরা যদিও জানেন, ভারতীয় সংবিধানে যে কার্টুন আঁকা আছে শব্দটির শারীরবৃত্তের, আমার নিষ্ক্রমণ সেই তীর্থে নয়। তাহলে বোঝাই গেল—তার আগে চাই সমাজতন্ত্র—ঐ যাঃ, টুকলাম বুঝি, একথাটা অন্য কবির।

প্রাণনাথ, সুধীবৃন্দ, দয়া করে এইবেলা সতর্ক হোন। বাড়ি যান। বাড়িতে ফেরার পথে যথেষ্ট বাজার করে নিন। ফুলকপি-সরুচাল-গাজর-টোম্যাটো-বেবিফুড-অ্যানাসিন-জেলুসিল-ডালকুলেক্স এবং রাত্রিকালে নিরাপত্তা যেটুকু প্রয়োজন—সেই সবই বেশি-বেশি সংগ্রহ করুন। প্রতিটি দরজায় খুব শক্ত করে এঁটে দিন খিল। জানলায় শস্তার কাঠ বেঁকে গিয়ে বন্ধ না হলে নারকোল দড়ি দিয়ে বন্ধ করা যায়। ফের বলি, সবকিছু শক্ত করে এঁটে

দিন বাবু। কেননা, উক্ত ঐ শব্দটিতে উঠে আসছে আপনাদের বিষাদ, বমন আর 'হস্ ধাতুর মধ্য থেকে গম্‌গম্'—আরো কী কী যেন।

"বাতেলা কোরো না বাপ্, ওসব আমরা জানি। শ্রমিকের দ্বিধাচিত্ত, আঞ্চলিক দল, কৃষকের সংস্কার, তোমাদের গদিলোলুপতা—এসব জড়িয়ে মিশে এখনো অনেকদিন বাঁচা যাবে, উদ্ধার করা যাবে তোমাদের পিতৃপুরুষ। তাছাড়া, দেখোনা কেন, এসব কি একদিনে হয়; সে অনেক শতাব্দীর মণিষীর বোকা পণ্ডশ্রম। তারচে' নামো তো বাবা, ভর সন্ধেবেলা কৌটো ঝাঁকানো সেরে ছুট মারছ খালাসিটোলায়? নাহলে সহসা কেন যানজটে পথিকেরে ক্লান্ত করে দিয়ে এযাবৎ বাণীমুখরতা? তোমাদের কাজকম্ম জানা হয়ে গেছে। আমরা পাড়িনি ভাব একশ বারো ধারা?"

আমাকে হাসতে হল, পুনর্বার, কত কত বার আমি এখনো জানি না। কী করে বোঝাব তবু একলক্ষ বছরেরও পর এখনো সূর্যাস্তের ছবি কতটা আসল! এখনো বর্ষাদিনে একটি বিকেলবেলা কতদূর পরিধিতে নিয়ে আসে শৈশবকালীন সেই অনটন (শব্দটি ফের ব্যবহারে মাপ চাই), নিয়ে আসে গেরুয়ামাটির ঢালে স্রোতকথা, একক বৃক্ষের নীচে জড়োসড়ো অসহায় স্মৃতি। এখন, নিছক এই মৃতদেহদের কী করে বোঝাব আমি, সমাজতন্ত্র ছাড়া আর কিছুতেই ফেরানো যাবে না।

কেবল সমাজতন্ত্র। আর সেইদিকে পৃথিবীর উন্মত্ত ঝোঁক যদি এখনো বিলম্বিত হয়, নিউটন মেনে তবে আমাকেই ধাক্কা দিতে হবে। কেননা, সমাজতন্ত্র, তুহুঁ বিনা আমি যে বাঁচিনা।

রাধেয়-অধিরথসুত

আপনি তো দিব্যি কেটে পড়লেন আমায় ভাসিয়ে দিয়ে। জন্ম দেওয়াটা যে এত পাপ কাজ নিজেকে না দেখলে বিশ্বাসই করতাম না। একবার ফিরেও দেখলেন না, কী হল, কোথায় গেলাম—আঁচল উড়িয়ে ফিরে গেলেন অক্ষতযোনী রাজকন্যেটি হয়ে।

তা, ওসব তো আকছারই হচ্ছে এই পঞ্চশীল দেশে। আহা সেই মেয়েদের দুঃখ, যারা ভালোবাসার ফাঁদে ধরা দেয়। ধন্য! গর্ভপাত এই দেশে আইনসিদ্ধ হল। তবু, যতদূর জানা যায়, আপনারও কিছু দায় থেকে গিয়েছিল, আসলে এসব কাজ একা একা নেহাতই হয়না।

যাই হোক, এলেনই যখন, আর পুত্র বলে ডেকেও উঠলেন, তাহলে শোনাই, কী ভাবে

এমন এক পাষণ্ড হলাম...। আদিকথাটুকু অন্যের মুখে শোনা, ভাসতে ভাসতে নাকি ঠেকেছিলাম এক ঘাটে। সেখানেই চোখে পড়ে যাই এক সারথির, বউ তার বাঁজা। সেহেতু তাদের ঘরে, তাদেরই অন্নবস্ত্র ভাগ করে করে...

এক একটি বছর ঘুরে যায়। শিরাপথে কী যেন তাপিত হয়ে ওঠে। মধ্যদিনে হাতের বাঁটুল দেখে অন্য কোনো ছবি মনে পড়ে। আর ঐ সূর্য...মাথার মধ্যেখানে ঢেলে দেয় গলন্ত রোদ্দুর। সুতরাং, একদিন পিতার পুঙ্গব সেই মাতৃখেকো ঋষিটির ঘরে হানা দিতে হল।

আজ্ঞে না, ততটাই শালীনতা আমার আসেনা। ঠাকুরবাড়ির কোনো ছেলে নই আমি। "লজ্জা তব ভেদ করি অন্ধকার স্তর"-টর আমার জিহ্বায় বড় হাস্যকর স্বাদ নিয়ে আসে। জন্মাবধি খিস্তি করি, মিথ্যাভাষে অভ্যস্ত আছি। সেই হেতু, নিছক ধর্মের ভানে যে সন্তান নিজের মায়ের প্রাণ শুষে নিতে পারে, তার জন্য অদ্যাবধি আমার ভাঁড়ারে কোনো পেলব শব্দ পড়ে নেই। না পোষালে ফুটে যান, অথবা শুনুন, আমি নিজেকে ব্রাহ্মণ বলে—হাঁ গো পৃথা—সুনিশ্চিত মিথ্যা বলে গেছিলাম ধনুর্বিদ্যালয়ে। অন্যথায় শিক্ষাদীক্ষা এই দেশে যথেষ্ট দুর্লভ।

তারপর একদিন—মিথ্যা কি টেঁকে খুব বেশি—ধরা পড়ে যেতে হল নিতান্তই আকস্মিক ভাবে। সে গল্প সবার জানা, কেবল আমারই কিছু বিস্ময় প্রাপনীয় ছিল। যখন উরুর নীচে মারাত্মক কীটের কামড়, আমি সহ্য করছি দাঁতে দাঁত চেপে (যেভাবে ছোটবেলা আমগাছে উঠে কাঠপিঁপড়ে কামড়ালে চুপ করে সয়ে যেতে হত) এবং যখন সেই গুরু উঠে শাণিত তর্জনী নেড়ে জানালেন আমি নাকি...হাঃ কুন্তী...আমি নাকি ক্ষত্রিয়সন্তান, তখন আমার মতো বিমূঢ় তরুণ আর কে ছিল জগতে? আমি! জন্মাবধি সূতপুত্র অথবা বেজাত—সেই কর্ণ—ক্ষত্রিয়সন্তান! এক পলে ফুটে উঠল আলো। নিজেকে ঘেন্না হল চামড়াময় আর্যব্যাধি দেখে।

যাই হোক, সেসব অতীত। পাঞ্চালীর বিবাহই শেষ যখন আমার ত্বক শেষবার পুড়ে গিয়েছিল। তারপর থেকে আমি—আপনাদের অভিলাষে—যথার্থ কানীন।

থামুন বৃদ্ধা। আমি চোখ থেকে পড়তে পারি কথা। আপনি বলতে চান কপট দ্যূতের সভা, বলতে চান কৃষ্ণার নগ্নীকরণের দিন আমিও ছিলাম, অন্যদের সাথে মিশে আমিও হেসেছি প্রাণপণ—সেও এক জান্তব ক্রিয়া। অস্বীকার করেছে কি কেউ? "নগ্নীকরণ"—এই শব্দটি যদিও চলেনা, পতিতপাবন সেই রাজনীতিবিদ সেদিন ছিলেন, তাঁর প্রিয় সহেলীর ওরাঁও কান্তি তিনি কৌশলে অটুট রাখেন। আর, আমার হাসির কথা? বেশ লেগেছিল কিন্তু। নীতিবাক্য মনে এলে হাসাটাই অসম্ভব হত। পাঁচটি নপুংসক বসেছিল

নতমাথা চুপ, আর সভার সমস্ত থামে কেঁপে কেঁপে উঠছিল দ্রৌপদীর আর্তকাৎরানি। ওঃ কী মজার দিন! এমনই মজার দিন এসেছিল আরও কিছু আগে। সেদিন দ্রুপদের এই আদুরে কন্যাটি আর এক তরুণের মুখে ঢেলে দিয়েছিল তার সমস্ত অঞ্জন। সেদিনও এমনি সভা, রাজন্যবর্গের সাজে আরও বেশি ঠমকচমক, সেদিনও সখির দল যথারীতি লাস্যময়ী আরও, তখন আপনার ঐ বধূমাতা—পঞ্চভর্তৃকা সেই মার্গীতব্যা মেয়ে আমাকে জানিয়েছিল—পিয়ানোনিন্দিত স্বরে—কেন আমি অপাঙক্তেয় আজ! আমার জন্মের কথা কেন আমি কিছুই জানিনা! হায়, হায় কেন আমি জন্মপরবাসী! আপনি পারতেন কুন্তী? আপনারও যৌবন ছিল। বুকের বৃন্তে ছিল তেমনই দুখানা ফুল, তেমনই কুজন ছিল প্রিয় সম্ভাষণে, আপনি কি পারতেন সমস্ত প্রতিশ্রুতি ছিঁড়ে দিতে, এভাবে, অকালে?

অবশ্য, আপনিও তাই। আমি ভুলেই গেছিলাম। প্রথম গর্ভের সেই অনিবার্য ফল আপনিও ভাসিয়ে দেন স্রোতের সলিলে। ভুলেই গেছিলাম, আজ এসেছেন শুধুমাত্র বৈধ সব পুত্রদের প্রাণ ভিক্ষা নিতে। এতটা সজল তাই আঁখিপাতা! এত তাই স্নেহের প্রতিমা!

কোথায় ছিলেন রানি? বেজন্মা-বেজাত শুনে-শুনে যখন আমার দেহ ছুটছিল এ গলি সে গলি? কোথায় ছিলেন ওগো ভোজের দুহিতা? যখন গুরুর শাপে ভয়ে আমি সিঁটিয়ে ছিলাম? কোথায় ছিলেন, হায় অর্জুনের মা? যখন ক'দিন আগে আপনারই আমন্ত্রিত আর এক সঙ্গমসাথী চুরি করে নিয়ে গেল আমার যেটুকু শেষ—কবচ-কুণ্ডল? কোথায় আপনার সেই তিন ছেলে, ধর্মপথগামী? আর, কোথায় তাদের জ্যেষ্ঠ, ন্যায্য সহোদর? কোথায় লুটিয়ে আছে আমার সকল শিক্ষা, পরিশ্রম, ধ্যান? অন্যদিকে আমারই দোসর ভাই মহাবলী যোদ্ধা অর্জুন—সে আমার সহোদর কুন্তী, তাকে কো-থা-য় রেখেছ?

এতটা আবেগ বুঝি হাস্যকর হল। তবে যান, বৈধ কৌন্তেয় যাঁরা, তারাই নির্ভয়। কালের কোমল স্পর্শে আমি বুঝি এখনই অতীত। কৃষ্ণাকে অপমান নয়, আমার পাপের ভার অন্যদিকে পূর্ণ হয়েছিল। লালিত তাদের ঘরে যাদের জন্মে কোনো ফলশ্রুতি নেই। শুদ্রের ঐতিহ্য তাই পিছনে আমার। সে সব বিস্মৃত হয়ে কেবল অহংবশে আজ আমি কৌরবমিতা। বাল্যসাথীদের ফেলে রাজন্যের দলভুক্ত, তাদেরই উচ্ছিষ্টে করি বিলাস যাপন। এই পাপে ডুবে যাবে আমার গতির চাকা, ভুলে যাব অতিচেনা শস্ত্রেরও নাম। তখন জিষ্ণু যেন ধর্মবিরোধী কোনো মায়ামোহে স্পৃষ্ট না হন। কৃষ্ণ আছেন জানি, তথাপিও। ফিরে যান পাণ্ডুর সতীপত্নী, ফিরে যান এই আশ্বাসে। নিছক কামের ঘোরে আপনার প্রথম প্রসব—জলে ফেলে দিয়ে যাকে স্বস্তি পেয়েছিল যত টুনটুনি নৈতিকতা উত্তরাপথের...শুধু সে যে ভেসে গিয়েছিল, মাংসের দলাটুকু ভেসে গিয়েছিল, সে যে কাঁদে, নড়ে চড়ে, খেতে চায়, আদরও কিছুটা—এসব ভাবার কোনো সময় ছিল না। যান সাধ্বী, ফিরে

যান, শেষকথা শুনে যান শুধু—সারা দুনিয়ার অন্ত্যজদের, সারা দুনিয়ার বেজন্মাদের কসম—আপনি আমার মা না।

আমার বাবার নাম অধিরথ। মা-র নাম রাধা।

পুনরুত্থান

[পলিন মোলাইজকে, যিনি এখনো বেঁচে আছেন]

প্রথম পরিচ্ছেদ : মৎকথিত সুসমাচার

তখন স্বর্গ খুলিয়া গেল। মরিয়ম মগ্দলীনী দেখিলেন পর্বতশিখরে এক জ্যোতির্ময় মেঘ। সেই সঙ্গে অগ্নিজিহ্বার ন্যায় কী যেন গোচর হইল। পৃথক পৃথক হইয়া এসকল তাঁহাদের এক-একজনের উপর অবস্থান করিল। একাদশ শিষ্যের ত্বকে রোমাঞ্চ স্বাভাবিক তাই, মগ্দলীনী অসহায়, রোদনপ্লাবিতা। সভয় মহানন্দের এই দিনে চারিদিক স্তব্ধতায় পরিপূর্ণ ছিল আর মানবপুত্র কহিলেন, "তোমরা কি এই মুখ চিনিতে পারনা?"

মাতা পলিনের কণ্ঠে ঈশ্বরসঞ্চিত কোনো ভাষা নাই; তিনি মাতৃস্নেহে ডাকিলেন, "বাছা..."। এই সম্বোধনে অন্যদেরও বাক্‌যন্ত্র অধুনা সচল। তাঁহারা আনতজানু, আর্তস্বরে ফুকারি উঠিল, "হে খ্রিষ্ট, বেঞ্জামিন, আমাদের ভাববাণী বলো, কে তোমাকে হত্যা করিল?"

খ্রিষ্ট কহিলেন, "শোনো, আমার এই শেষ সমাচার। আমার প্রেরিত এত বাক্যসকল শুধু ধারণ করিও। এসব লক্ষণগুলি বিশ্বাসীদের অনুবর্ত্তী হইবে। তাহারা আমার নামে মন্দ আত্মা দূর করি দিবে। নূতন নূতন ভাষায় কথা বলিবে। সময় আসিয়াছে। স্মরণে রাখিও, এমন নপুংসক আছে যাহারা স্বর্গরাজ্যের নিমিত্ত আপনাদিগকে নপুংসক করিয়াছে। যে গ্রহণ করিতে পারে, সে ইহা গ্রহণ করুক।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : পুরোহিত সভায় যিশুর বিচার

তাহারা আমাকে মহাপুরোহিতের নিকট লইয়া গেল। তিনি বলিলেন, "তুমি কোন অধিকারে এই সমস্ত করিতেছ? এবং, তোমাকে এই অধিকার কেই বা দিয়াছে?" উত্তরে বলিলাম, "আমিও একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব। বাপ্তিস্মদাতা নেলসনের বাপ্তিস্ম কোথা হইতে?" তিনি বলিলেন, "আমরা জানিনা।" বলিলাম, "তোমাদের সত্যই কহিতেছি,

করগ্রাহকেরা আর গণিকারা তোমাদের অগ্রে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করিতেছে। কারণ, নেলসন ধার্মিকতার পথে চলিয়া তোমাদের কাছে আসিলেন কিন্তু তোমরা তাঁহাকে বিশ্বাস করিলে না। কিন্তু কর-গ্রাহকেরা এবং গণিকারা তাঁহাকে বিশ্বাস করিল। আর তাহা দেখিয়াও তোমরা অনুশোচনা করিলে না।

সুতরাং, প্রধান পুরোহিতগণ ও মহাসভার সভ্যেরা আমাকে হত্যা করিবার অভিপ্রায়ে আমার বিপক্ষে সাক্ষী অন্বেষণ করিলেন। কেহ কেহ এই বলিয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দিল, "হ্যাঁ আমরা উহাকে দেখিয়াছি। ওই ফিলিপুস সেলেপের হত্যাকারী।" তখন মহাপুরোহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি কোনো উত্তরই দিবে না? ভালো, বল দেখি তুমিই কি সেই খ্রিষ্ট? পরমধন্য লুমুম্বার পুত্র?" আমার উত্তর ছিল, "হাঁ আমিই, এবং আপনারা মনুষ্যপুত্রকে ঈশ্বরের পরাক্রমের দক্ষিণপার্শ্বে বসিয়া থাকিতে আর আকাশে মেঘযোগে আসিতে দেখিবেন।"

শুনিয়া মহাপুরোহিত ফান ডিক রোষাক্ত হৃদয়ে বলিলেন, "সাক্ষীর আর দরকার কী? তোমার ঈশ্বরনিন্দা শুনিলে। এখন তোমরা কী মনে কর?" সভাস্থ সকলের রায়ে মৃত্যুই সাব্যস্ত হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : দেশাধ্যক্ষের সম্মুখে যীশুর বিচার

প্রভাত হইবামাত্র পুরোহিতগণ সমগ্র মহাসভার সহিত মন্ত্রণা করিলেন আর আমাকে বাঁধিয়া লইয়া পীলাতের হস্তে সমর্পণ করিলেন। পীলাত বলিলেন, "তুমি কি রাজা?" আমার উত্তর, "আপনিই বলিতেছেন আমি রাজা। সত্যের বিষয়ে সাক্ষ্য দিবার জন্যই আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি এবং জগতে আসিয়াছি। যে কেহ সত্যের অনুগত, সে আমার স্বর শুনে।" তখন পীলাত আমাকে লইয়া কোড়াপ্রহার করাইলেন। সৈন্যরা কাঁটার একটি মুকুট গাঁথিয়া আমার মস্তকে দিল এবং আমাকে বেগুনি রঙের পোষাক পরাইল। তথাপি পীলাত— ধূর্ত সেই আফ্রিকানার বোথা—বলিলেন, লোকটি জাতিকে বিপথগামী করিতেছে। কিন্তু, দেখো ইহার মুক্তির জন্য পৃথিবীর অন্য অন্য জাতিগণ উন্মুখ রহিয়াছে। অতএব আমি তাহাকে শাস্তি দিয়া মুক্ত করিব।" কিন্তু, তাহারা উচ্চকণ্ঠে জিদ করিয়া চাহিতে লাগিল যেন আমাকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়। এইরূপে তাহাদের ও প্রধান পুরোহিতদের স্বর অধিকতর প্রবল হইল। তখন হৃষ্টচিত্তে পীলাত তাহাদের আবেদন গ্রাহ্য করিবার রায় দিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : মথিলিখিত সুসমাচার

'দুইজন দস্যু তাঁহার সহিত ক্রুশে বিদ্ধ হইল। একজন দক্ষিণপার্শ্বে, আর একজন বামপার্শ্বে। দিনের ষষ্ঠঘটিকা হইতে নবম ঘটিকা পর্যন্ত সমগ্র দেশ অন্ধকার রহিল; আর, নবমঘটিকার

সময় যিশু উচ্চকণ্ঠে ডাকিয়া বলিলেন, "এলী এলী লামা শবক্তানী।" একজন অমনই দৌড়িয়া গিয়া একটি স্পঞ্জ লইল, তাহা 'সিরকা' দিয়া সিক্ত করিল এবং একগাছা নলে লাগাইয়া তাঁহাকে পান করিতে দিল। কিন্তু অন্যেরা বলিল, "থাম। দেখি এলিয় আসিয়া উহাকে রক্ষা করেন কিনা।"
যিশু আবার উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। মন্দিরের তিরস্করণী উপর হইতে নিচ পর্যন্ত দুইভাগে বিদীর্ণ হইল। ভূমিকম্প হইল এবং শৈলসকল বিদীর্ণ হইল।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : প্রেরিতের কার্যবিবরণ

[এতক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ এক ঘটনানিচয় আমি কহিলাম, হে থিয়ফিল, এবার উল্লেখ করিব যাহা পুনরুত্থানের ক্ষণে যিশু বলিয়াছিলেন, সেই শিক্ষা, শ্রবণ করুন...]

মগ্দলীনী পুনঃক্রন্দসী। যিশু তাঁহাকে বলিলেন, "নারী, রোদন করিতেছ কেন?" মগ্দলীনী থামিলেন না। বেঞ্জামিন ডাকিলেন, "মরিয়ম...।" মরিয়ম ফিরিয়া ইব্রীয় ভাষায় বলিলেন, "রব্বুণী!" গুরু কহিলেন, "শোনো তারপর আমি কী দেখিলাম। তোমরা এই বিবরণ প্রচার করিও। জানাইও যাজক টুটুকে। আমি এক নূতন আকাশমণ্ডল আর এক নূতন পৃথিবী দেখিলাম। কারণ প্রথম আকাশমণ্ডল আর প্রথম পৃথিবী অন্তর্হিত হইল। এবং, সমুদ্রের আর অস্তিত্ব রহিল না। আমি দেখিলাম পবিত্র নগরী, নূতন বান্টুস্তান—সে স্বামীর নিকটে বিভূষিতা বধূর ন্যায় প্রস্তুত হইয়া ছিল। পরে আমি শুনিলাম, "মৃত্যু আর থাকিবেনা। শোক, আর্তনাদ বা বেদনাও আর থাকিবে না। কারণ সমস্ত প্রথম বিষয় অতীত হইল।"

আমার অনুসরণ কর। মৃতরাই আপনাদের মৃতদেহদের সমাধিস্থ করুক। আপন ক্রুশ লইয়া যে আমার অনুসরণ করেনা সে আমার যোগ্য নয়। তোমরা ঈশ্বর এবং ধনের দাসত্ব করিতে পার না। বান্টুকুলের হারান মেষ ছাড়া আর কাহারও নিকট আমি প্রেরিত হই না। যাহারা আমাকে 'প্রভু, প্রভু' বলে, তাহারা প্রত্যেকে যে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিবে এমন নয়; বরং যে আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা পালন করে, সেই প্রবেশ করিবে। তাই ভণ্ড ভাববাদীদের বিষয়ে সাবধান; তাহারা মেষের বেশে তোমাদের নিকটে আসে কিন্তু অন্তরে তাহারা লোলুপ নেকড়ে বাঘ। ধার্মিকতার জন্য যাহারা নির্যাতিত, তাহারা ধন্য, কারণ স্বর্গরাজ্য তাহাদেরই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : উপসংহার

মগ্দলীনী বলিলেন, "প্রভু আমাকে কি কিছুই বলিবেন না?" বেঞ্জামিন কহিলেন, "ভয় করিওনা, বহু চড়াই পাখি হইতে তোমরা শ্রেষ্ঠ।"

পলিন ডাকিলেন, "পুত্র..."। যিশুর চোখ ভরিয়া আসিল। করুণার স্মিত হাস্যে আজ

তিনি আরোই আভাময়। বলিলেন,

"সমুদ্রের পথে, যর্দ্দনের অপর পারে
আফ্রিকা দেশ আর তৃতীয় পৃথিবী,
বিজাতিগণের গালীল—
যে জাতি অন্ধকারে বসিয়াছিল, তাহারা
মহৎ আলোক দেখিতে পাইল;
যাহারা মৃত্যুর দেশে, মৃত্যুর ছায়াতে বসিয়াছিল
তাহাদের উপর আলোকের উদয় হইল।"

উন্মোচিত চিঠি : ৪

বেহালা এখন নাকি ছেয়ে গেছে কংগ্রেসি মাস্তানে...

মারুন, কাটুন আর কুচিকুচি করুন আমাকে, আমি এভাবেই শুরু করব লেখা। কবিতার ভার নিয়ে আমার সত্যি কোনো মাথাব্যথা নেই শৈলেশ্বরদা, ওগুলা ছাড়ান দেন, মিডিলকেলাস আজো বাকি আছে চেনা? তারচে' দেখুন ঐ গঙ্গায় চলন্তা পানি ন্যাংটো করে দিয়ে যাচ্ছে মানসিক প্রমেহ, অম্বল! তাছাড়া, সেদিন শুনি কল্লোলিত কৃত্তিবাস, ক্ষুধার্তের পর এখনো অনেকে নাকি বিয়রেই নেসা করে থাকে। সুতরাং, ঐসব আধুনিকথার কথা...হেইডা বোধহয় আর চলিবেক নাই।

পারেন তো ক্ষ্যামা দিন। নাইবা বলুন কবি। যথেষ্টই ভালো আছি ধনঞ্জয় বৈরিগির দিনগত কাজে। 'দায়ে পড়ে যৌথকারবার' তবু সমর্থন করি। এই পাপে আগামর সাহিত্যিকদল প্রাণদণ্ড দিলে পাব আন্তরিক শ্রেষ্ঠ রসিকতা। যতক্ষণ তবু এই সি-পি-এম পার্টি রয়ে যাবে, কলম ঘষ্টানো আর যে কোনো কবিতা থেকে আমাকে নিবৃত্ত করা নেহাতই অলীক। আমরা কাডার, এটা জানেন নিশ্চয়।

এতেই আমার সুখ, বাকি সব—করকমলেষু...

রাত পাহারা

সালের শেষার্ধে ৎ প্রথমার্ধে যে সব ছাত্ররা সমস্ত কাজ ফেলে বাতের পব রাত যাদবপুব বিশ্ববিদ্যালয় পাহারা দিয়েছিলেন, তাঁদেব জন্য এই বচনা উৎসর্গীকৃত ।

(রাত : ২.০০)

মধ্যরাত শুভ হোক। আশা করি সবদিক নিরাপদ আছে। হট লাইনের তারগুলো? পাম্পের তালা? ঠিক হ্যায়, এবার তোমার ছুটি কমরেড; কাটবার আগে একখান বিড়ি ছাড়ো দিকি। কালকেই শোধ দেব, মাইরি বলছি। অমন করিস্‌নি বাপ, খাদ্যাভাবে লোক মরে, মার্কসবাদে যুক্তি আছে তার। কিন্তু বিড়ির জন্য, একটা বিড়ির জন্য শুধু মরে গেলে তার কি ব্যাখ্যা দিবি বল? বলছি তো, কালকেই পেয়ে যাবি। যাঃ, এবার পালা...

(রাত · ২.৩০ মিনিট)

স্তব্ধতায় ঝাঁ-ঝাঁ করছে কান। উঃ এই অন্ধকারে দেখা যায় না, শোনা যায় সব, সমস্ত শোনা যায়, কীভাবে ঘাসের ঠোঁটে ঝরে পড়ছে শিশিরসলিল, শোনা যায়, সবুজ পাতারা সব কার্বনে ভরে দিচ্ছে গ্রহ, পায়ের পাতার নীচে সন্তর্পণে ঘুরে যাচ্ছে পৃথিবীর মাটি। অন্ধ হয়ে গেলে তবে এতটাই খুলে যায় চোখ? অন্ধ বাউল তবে এভাবেই পড়ে নিত ভুবনের বর্ণপরিচয়! জীবনানন্দ তবে এভাবেই আঁকতেন বাংলার ঘুমন্ত বিনুনি!

(রাত . ৩ ২০ মিনিট)

দমবন্ধ হয়ে আসছে...। কীভাবে পালাব এই নির্জনতা থেকে! কানের পর্দার গায়ে স্তব্ধতা ধাক্কা মারছে। মাথায় চিন্তাগুলো কিল্‌বিল করে উঠছে পোকার মতন। চেপে বসছে অন্ধকার, চেপে বসছে দেয়ালের মতো। সহসা বাতাস দিচ্ছে...ভয়ের মতো, মৃত্যুর মতো, বয়িরের মতো ঠাণ্ডা শাদা বাতাস...। টর্চটা কোথায়? কী হল, জ্বলে না কেন? দুচ্ছাই, যেখানে বাঘের ভয় সেইখানেই যত্তসব...আঃ...পায়ের আঙুলটাতে...মা...মাগো...

(রাত : ৩.৩৫ মিনিট)

বোঝা যাচ্ছে সাপ নয়, এখনো মরিনি। পোকাই কামড়াল নাকি? ওষুধ লাগিয়ে আসি কিছু। কিন্তু, পাম্পের ঘর? বৈদ্যুতিক ধাতুসুতোগুলো? ধ্যাৎ, কেন যে মরতে আসি এইসব ঝামেলা-ঝঞ্ঝাটে! অবশ্য, যাওয়াই যায়, কেইবা আটকাতে পারে, বৈতনিক চাকরি তো নয়। কিন্তু, তারপর? আগামী সকালবেলা জলহীন আলোহীন বাড়ি। ছেলেমেয়েদের চোখে আরো বেশি মারাত্মক পোকার কামড়...চলে যাব? মানুষের বাচ্চা শালা এরপর চলে যেতে পারে?

পরীক্ষা ক'দিন পরে। জানি বাবু, তুমিও পারনি এই পরীক্ষাটা দিতে। তোমারও স্বপ্ন ছিল...আমি কি জানিনা? কিন্তু এমন দিনে কাউকে তো দাঁড়াতেই হয়। তোমার স্বপ্ন যদি ঝরে গিয়ে রক্ত এনে দেয় আর অন্য সব বাবাদের মুখে—তুমি বল, মেনে কি নেবেনা? তোমার চাকরির দিন এখন আঙুল গুণে...জানি আমি, সব জানি, সেসব লিখতে গেলে অতিকথনের দায়ে পড়ে যাবে বাংলা কবিতা। তবুও আমার আর কিছু নেই এইখানে গুমরে মরা ছাড়া। **শুধু ঐ পাম্পের** ঘর...শুধু ঐ বিদ্যুতের তার...এখন পাহারা ছেড়ে চলে গেলে **কাল থেকে কাকে** তুমি ছেলে বলে পরিচয় দেবে?

(রাত : পরে দেখবেন)

এখন কিছুই নেই এই ভাবে গুমরে ওঠা, গোঙানিতে অন্ধকার ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়া ছাড়া। পাম্পের ঘর ছাড়া এখন কোথাও কোনো ততদূর নারী নেই, অর্থ নেই, এমন কি বিপ্লবও নেই। মরিয়া মানুষই শুধু এইভাবে স্তব্ধতার টুঁটি চেপে আয়ুকে বাড়িয়ে নিতে পারে। মরিয়া মানুষই শুধু, যদি তার এতটুকু দায় থেকে থাকে—হাড়কাটা অক্ষরের কাছে নয়, কেবল মানুষের কাছে দায় থেকে থাকে—জমাট শূন্যতা থেকে সময়কে ছিঁড়ে আনতে পারে। তখন আঙুলে কোনো জ্বালা নেই, অনুভব নেই, তখন ব্যাটারিহীন টর্চ কোনো বিপন্নতা নয়, তখন কব্জির সব শিরাগুলো...তখন কব্জির সব...কব্জিতে...আরে! পাঁচটা তো বেজে গেছে কবে!

সুপ্রভাত, পাঠকমশাই।

উন্মোচিত চিঠি : ৫

যাবার সময় এলে তোমাদের কষ্ট হয়। আমার কি কিছুই হয়না?
তোমরা চিৎকার কর, নিজেদের হাতে ল্যাপা নতুন পলেস্তারা ভেঙে দিতে চাও, আর
আমিও কি এই ঘরে একা একা ভাঙিনা কিছুই?
তবু তো যেতেই হয়, সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায় খণ্ড খণ্ড পালঙ্কের লাশ।
আমার তো কিছু নেই, হুজুর লক্ষ করুন, সিঁড়ির মার্বেলগুলো সাফ রাখা ছাড়া
—উৎপল, আপনি পারেন তাও, আর, আমি কিছুই পারিনা।
কিছুই পারি না আর চুপ করে বসে থাকা ছাড়া, চুপচাপ হাতঘড়ি লক্ষ্য করা ছাড়া,
তোমাদের আর্তনাদ মুখ বুজে সহ্য করা ছাড়া, সহ্য করা—একদিন সব কিছু সহ্য হয়ে যাবে
—এই আশা করা ছাড়া, আশার অতীত এই আশাটুকু নিয়ে ভাঙা দাঁত, কাটা জিভ,
পঙ্গু পায়ে ভর দিয়ে বেঁচে থাকা ছাড়া. এই বেঁচে থাকাটুকু তবু থেকে যায়,
এছাড়া কীইবা আর বল দেখি, এছাড়া কীইবা আর স্টিয়ারিং গিয়ারের পরিবর্তে
গ্রহণীয় মনে হতে পারে?

একটু আগেও ছিল, এখন কিছুই নেই, দূরের রাস্তার বাঁকে ধুলোর একটু রেখা, নিতান্ত প্রাকৃতিক
...প্রাকৃতবালিকা, আমি বড় বেশি কথা বলছি, ক্ষমা করো, পায়ে ধরি
কলম কেড়োনা...

অভিযোগ : দেশদ্রোহিতা

আমার উকিল নেই, ইওর অনার,
অবশ্যই এই দেশে উকিলের সংখ্যা প্রচুর, তবু
আমার উকিল নেই, কারণ চাকরি নেই, আশা করি বুঝতে পারছেন...

এই যে মহিলা—যার আপাদমস্তক এক ধর্মীয় আচ্ছাদনে ঢাকা
আমার আম্মা ইনি। এবং, সম্প্রতি
আব্বুজান তিনবারই 'তালাক' শব্দটিকে...
যেহেতু আবার তিনি...ইওর অনার,
সত্যি বলতে সেই মেয়েটির সাথে আমাকেই নিখুঁত মানায়।

প্রাসঙ্গিক কথা আমি ভালোবাসি আপনারই মতো,
তাই এখানে এসেছি কোনো খোরপোষ মামলা নিয়ে নয়,
যেহেতু সবার জানা এদেশের সরকার অধুনা
সুবিধাজনক এক আইন মোতাবেক
আমাদের মেয়েদের জীবনকে কার্যত নিষিদ্ধ করেছেন।

সেহেতু তেমন কোনো দাবি নিয়ে এ বাড়িতে পয়জার রাখা
নিতান্ত বচ্‌পনা হবে; মাফ করবেন, ইওর অনার,
প্রাথমিকভাবে আমি এটাই জানাতে চাই যে—

সরকারসৃজিত ঐ আইনের ফলে নিজেকে বাঁদীর বাচ্চা
ভাবা ছাড়া আর অন্য কোনো গতি নেই আমার এখন;
স্পষ্টত এটি একটি মানহানি কেস।

দ্বিতীয়ত, আমার চাকরি নেই, দুর্ভাগ্যবশত
বিষয়টি নিতান্ত পাতি, তবুও ঘটনা
খোলাখুলি বলি, দুবেলা দুমুঠো ভাত
আম্মিকে দিতে আমি এখন অক্ষম।

হয়তো জানেন,
আমার হালতের জন্য সরকারী যোজনাই দায়ী।

সুতরাং, ইওর অনার,
এজলাশে মামলাটি এইভাবে হাজির করছি;

অভিযোক্তা : একজন ভারতীয়

অভিযুক্ত : ভারত সরকার

অভিযোগ : দেশদ্রোহিতা

বসন্তের প্রথম লিরিক

দীর্ঘ বিরহ, আমি ছুঁড়ে দিচ্ছি মুষ্ঠিভর ভালোবাসা, আজ
বৃষ্টি নামুক সব ভারতীয় মেয়েদের চোখে,
বৃষ্টি নামুক আজ, গ্রীষ্মপুতনার স্তনে এতটুকু জল নেই
বৃন্তে বিষ ভারি হয়ে আছে,
যে মেয়েটি কাজল পরেছে আর যে মেয়েটি মেহেদি রাঙানো হাত
মেলে ধরেছিল, তাদের সবার কন্ঠে শিয়ালদা জুড়ে কাল বহুক্ষণ
বন্ধ ছিল বাস, যে মেয়েটি সদ্যযুবতী আর যে মেয়েটি গতকালই
তালাক পেয়েছে তাদের সবার চোখে বৃষ্টি নামুক আজ, দীর্ঘ বিরহ,
আমি ছুঁড়ে দিচ্ছি মুষ্ঠিভর ভালোবাসা, ফ্লাইওভারের গায়ে
চাপ-চাপ রক্ত মুছে দাও

এখন এপ্রিল, তুমি—যে বিদেশি এখানে এসেছ, দেখো রুক্ষতম মাস,
স্কটলেন জুড়ে শুধু ঝক্‌মক্ করে উঠছে গুণ্ডাদের ছুরি, তুমি—যে বিদেশি
এখানে এসেছ, দেখো ব্রিগেডপ্যারেড মাঠে পতাকার গালচে পেতে রাখা,
তুমি কখনো ভুলনা সেই মেয়েটির কথা—মাথায় বোমার দাগ
যে মেয়েটি মুছতে পারেনি, আর যে ছেলেটি বোনের কন্ঠে কাল সারারাত
শ্লোগান বুনেছে তার ভায়োলিনে, হায় দীর্ঘ বিরহ, আমি

ছুঁড়ে দিচ্ছি মুষ্ঠিভর ভালোবাসা, তারা জল হয়ে, বিরুদ্ধতা হয়ে

ঝরে যাক ভারতীয় মেয়েদের চোখে আর যে ছেলেরা তাদের পাঁজর খুলে
অস্ত্র গড়েছে—আমি তাদের সবার দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছি মুষ্টিভর ভালোবাসা,
দীর্ঘ বিরহ, আমি ছুঁড়ে দিচ্ছি...

উনিশশো চল্লিশ

উনিশশো চল্লিশে চলো, দেখে আসি মেয়েরা কীভাবে চুল বাঁধে,
কীভাবে বিকেলবেলা ফুটবল মাঠ থেকে ছেলেরা মিলিয়ে যায়
ফাশিবাদ বিরোধী নাটকে,
অথবা দুপুরে সেই ছেলেটিকে চিনে নিই, শিক্ষকের পিছু পিছু নতমুখ মেয়েটিকে
যে কিছুতে ভুলতে পারেনি; ভুলতে পারেনি হায় চরকাপেড়ে শাড়ি পরা
মেয়েটির কথা। সে মেয়েটি আজ বুঝি ঠাকুমা হয়েছে?
কোথায় রয়েছে আনু, দুবরাজপুরে?
কলেজদিনের কথা মনে করে এখনো আর্দ্র হয়না কি?
লজ্জাবোধ করে থাকে শাড়ির 'স্বদেশী' পাড় ভেবে?

উনিশশো চল্লিশে চল, নিয়ে চল, আজকে তোমার বেণি দেখে
সহসা শহর মেঘে ঢেকে গেল, এত তীব্র অতীতচারিতা
বহুদিন কলমে আসেনি। সেসব মেয়ের মতো
আমাকে শেখাও আজ কীভাবে চোখের ঐ প্রশাসন দিয়ে
আমাকে বানালে তুমি সমর সেনের মতো ত্যারচা প্রেমিক,
আমাকে শেখাও আরো কীভাবে তোমার গলা অধিকার করে নেয়
বেথুনে পড়তে আসা ফরিদপুরের পাকা মেয়ে!

আমিও শেখাব কিছু, খরাশির মধ্যপাদে এখনো শেখার যা-যা বাকি,
শেখাব এপিক ঢং রোজ যাতে ভিন্ন চোখে আমাকেই দেখো,
শেখাব আগুন চুরি, গ্রিক মিথ, ভোলক্যানোলজি,
শুধু আগে একবার পুরোনো বাতাসে মুখ ধুয়ে নিই,
বুকে নিই বাঙালি মনন, আনু,
বর্ষার দিনে আজ ফিরে যাব উনিশশো চল্লিশ...

ঋণশোধ

প্রশস্ত শারদরাত্রি, গ্যাসল্যাম্পের নীচে বসে কে এক কিশোর
সারারাত লেখাপড়া করে; কে তাকে চেঁচিয়ে ডাকল, 'ঈশ্বর...ঈশ্বর...''?
ব্যাপ্ত শারদরাত্রি, টেবিলে নিবিড় হয়ে একটি হাকিম লেখে দেশগাথা
তার কোন্ উপন্যাসে এই গান সংযোজিত হবে?
স্বচ্ছনীল রাত্রিবীথিকা ওগো, মিরিকপাহাড় জুড়ে আমার কমরেডরা সব
নিঃশব্দে খুন হয়ে যায়; গ্যাসল্যাম্পের নীচে কে এক কিশোর কাঁদে?
বলো রাত্রি, তার কথা বলো...

সতীবিধবার কষ্টে কোনো এক তরুণের প্রাতিষ্ঠানবিরোধিতা আমাকে জানাও,
আমাকে শোনাও সেই ফিরঙ্গি মাস্টারের যুক্তিকথা, সনেটবোধন;
এবার শরৎকাল কাশফুলে বেঁধে দিচ্ছে লোহিতকণিকা আর
এবার শরৎকাল সারারাত্রি জেগে আছে পাহাড়ে-জঙ্গলে;
হে রাত্রি, ভৌগোলিক, ফ্রন্টের মাটি ঘেঁষে উড়ে যাচ্ছে বারুদের মেঘ, তুমি
অসংখ্য নক্ষত্র জুড়ে এখন আকাশে আঁকো মানচিত্র : অখণ্ড, উজ্জ্বল

এবার শরৎকালে লিখনভঙ্গিমা আমি ছিঁড়ে ফেলছি মিরিকপাহাড়ে
এবার শরৎকালে কমরেডরা খুন হচ্ছে, অতর্কিতে, মিরিকপাহাড়ে

মার্কসবাদের একটি অঙ্গ

দারিদ্র্যরেখার তীরে দেখা হল ইঁদুর-বিড়ালে।
তখন সূর্যাস্ত প্রায় শেষ আর তখন আকাশে এক অচেনা ও অতিচেনা আলো,
দেখা হল ইঁদুর-বিড়ালে।

লোমের ভ্যানিটিজামা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে সেই মার্জারনন্দন
ইঁদুরকে ডেকে বললে, "শোনো, আমাদের আলোচনা এখানেই শেষ করা
যাক।
তুমি খাদ্য, আমি নই, সুতরাং কোনোদিনও বিজয়লছ্মী
তোমাকে দেবেনা মালা, জানোনা কি আমাদের শাস্ত্রে লেখা আছে
ধর্মের জয় হয় সর্বদা, ইঁদুরআহার হল আমাদের সনাতন..." ইত্যাদি

বদলে যায় বদলে যায়, বদলে যেতে যেতে
একটি মুষিক থমকে দাঁড়ায় জীবনে হাত পেতে

তার চোখে জ্বলে ওঠে অভূতপূর্ব এক হিংসার আলো।
শান্তভাবে বলে ওঠে, "আমাদেরও শাস্ত্রে আছে লেখা
বদলে যাওয়া ধ্রুব, শুধু বদলে যাওয়া, জীবনকে আরো বেশি
গ্রাহ্য করে নেওয়া।
পৃথিবীর রং তাই বদলে যাচ্ছে বাঁচবার অসহ্য আবেগে, দেখো
প্রতিটি রন্ধ্রপথে উঠে আসছে ঝাঁক ঝাঁক মরিয়া ইঁদুর।
এদের দাঁতের ধার তেমন নরম নয়, অবিধিসম্মত—
বদলে যায়, বদলে যায়, তোমার লোমের জামা কুঁকড়ে যাচ্ছে ভয়ে...।"

কমরেড মুসা মোল্লা সমীপেষু

উইনি ও নেলসনকে আমার শ্রদ্ধা জানাবেন, আর
জিঞ্জিকে বন্ধুতা।

সেই তুর্কি কবির লেখা নিশ্চয় আপনি পড়েছেন, যিনি লিখেছেন—
এশিয়ার এক দেশ ভারতবর্ষ, ভারতের এক শহর কলকাতা...
হ্যাঁ, সেই কলকাতারই মানুষ আমি।
সেই কলকাতা, যেখানে তিনলক্ষ মানুষের এক জনসভায় ভাষণ দিয়ে
আপনি এখন ফিরে যাচ্ছেন
কালো রক্ত, কালো ঘাম ও নীল হীরের দেশে।

প্লেনের জানলা দিয়ে তাকালে এই দেশ আর ঐ দেশে
খুব বেশি তফাৎ বোঝা যায় না।
শুকনো খেতের সামনে দাঁড়িয়ে থাকলেও এই দেশ আর ঐ দেশে
তফাৎ থাকে না খুব বেশি।
আপনি দুভাবেই দেখেছেন, তাই
তিন লক্ষের এই সমাবেশ থেকে ফিরে আপনার আবেগ আমি
বুঝে নিতে পারি। না, রেগনকে নিয়ে ভাবার বিশেষ কিছু নেই,
কারণ তিনি এখন একই সঙ্গে কন্ট্রা ও আফ্রিকানার,
আমেরিকান নন।

কথায় কথাই বাড়ে দেখুন, আপনারও সময় কম,
আমারও আসলে বলার ছিল অল্পই।
আপনার দেশের মানুষকে যা জানাবার জানিয়ে দিয়েছে এই সভা,
আমাদের নেতারা যোগাযোগ করেছেন আপনাদের সঙ্গে, এবং
রবার্ট মুগাবেও এতক্ষণে জেনে গেছেন
বোথা-র রক্তচাপ আরো একটু বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য
যা যা করণীয় আপাতত সে সবই আমরা করেছি।

শুধু আমার পক্ষ থেকে—
তৃতীয় শ্রেণীর এই কলকাত্তাইয়া কবির পক্ষ থেকে
আপনি উইনি ও নেলসনকে শ্রদ্ধা জানাবেন, আর
জিঞ্জিকে বন্ধুতা।

কু

সে এসে দাঁড়াল তামসী মেঘের আবডালে, ঐ
স্টেশনের থেকে এককুচি আলো কপালে বিঁধল নিষ্ঠুর,
আমি বিব্রত কণ্ঠে বলেছি, "কে তোকে জড়াবে?"—রক্তের রঙা
ব্লাউস হঠাৎ উড়ে গেল আর সে শুধু বলল, "তু..."

গঞ্জের নাম দিগন্তহাট, মেয়েটির নাম কু।

ফের একবার ট্রেন এল, সেটা বোধহয় পরের বছরই,
তখন সন্ধ্যা নিভিয়ে দিচ্ছে পথপ্রান্তর—এমন সময়
দাঙ্গাধ্বস্ত গ্রাম থেকে তার আলুথালু দেহ ছুটে এল...আঃ,
সে এসে দাঁড়াল তামসী মেঘের বুক ছিঁড়ে, তার
দুই চোখ থেকে শ্মশানকালীর বিষ ও ভস্ম...আমি ভয়ার্ত
কণ্ঠে বলেছি, "কে তোকে মেরেছে?"—এক থুৎকারে
আমার সাহস ছারখার করে সে শুধু বলল, "তু..."

গঞ্জের নাম শ্রেণীসংগ্রাম, মেয়েটির নাম কু।

আরোয়াল বা কানসারা বা...

নিজের জমি চেয়েছিলাম, ধুলোর নীচে তাই
থুবড়ে আছি, রক্ত ঘন বিষে

চাষের জমি চেয়েছিলাম, ব্রহ্মর্ষি পুলিশ
কণ্ঠনল ভরে দিয়েছে শীসেয়

ছিন্ন দেশ চাইনা আর স্বভাবতই লুটিয়ে আছি
পাহাড়বনে ঝরা পাতার ঘ্রাণে

বাঁচব বলে জন্মেছি তাই আরোয়াল বা দার্জিলিঙে
মৃতদেহের একরকমই মানে

বুলেট এত নিবিড় টানে বাঁধছে দেশে দেশে
জোহানেসবার্গ-পানামা-গঙ্গা

মন কি আজো লেনিন চায়? মনকে বলো—হ্যাঁ,
মনকে বলো—হ্যাঁ, তবু হ্যাঁ

স্রোত

মার্চসন্ধ্যার বৃষ্টিতে আজ ইষ্ট হলনা মিষ্টিকুটুম
ভীষণ কষ্টে রাস্তার মাঝে দু-হাঁটু আমার নবনীতোপম
গন্ধবাতাস সন্ধ্যার দিকে এ কেমনতর উত্তেজনায়
ঝোড়ো নিঃশ্বাসে, বিশ্বাস কর, রাগী-রাগী মুখ ফিরিয়ে তাকাল
আমি ভয় পেয়ে তোমার দুয়ারে দাঁড়ালাম যেই, বারি ঝর-ঝর
জ্বরে-উত্তাপে মহল হঠাৎ ভরে গেল দেখে সরে যাব বলে
যেই ইতিউতি তাকিয়ে দেখছি দরজায় তুমি নিজেই আড়াল
ভেঙে দিলে আর অনাবশ্যক বাক্যালাপের এক্কা ছুটল;
সেদিন সন্ধ্যা, মার্চমাস জুড়ে বৃষ্টি নামল, সৃষ্টি নিছক
কথা থাকল না, মৈমনসিং গানের মতন তোমার দুচোখ

দেখে একছুটে বড় রাস্তায় নেমে আসতেই ভীষণ কষ্টে
এই বৃষ্টিতে দৃষ্টি হারাল

মার্চসন্ধ্যার বর্ষণে আর হর্ষ হলনা ইষ্টকুটুম

স্বীকারোক্তি

ছলনা কোরোনা আর, কালবীথি, ফাল্গুনরাত, আমি বলতে চাই,
বলতে চাই সেইসব কনুইয়ের কথা, যারা রুক্ষ, যারা পুরু চামড়ায় ঢাকা,
বলতে চাই জীর্ণ শাড়িতে কত ফুটো আছে তার সংখ্যা, গড়ে কতবার
সেসবের মধ্য দিয়ে বেমক্কা বাতাস ঢোকে, কেঁপে ওঠে শিরা-উপশিরা,
এখনই বলতে চাই সেই দীর্ঘ চাহনির কথা, যত দীর্ঘ হতে পারে এক দৃষ্টি,
তার কথা, নিজেকে বলতে চাই : 'না নিষাদ'; বলতে চাই আজন্ম নির্জনতার
গুলগল্প, রজতজয়ন্তীব্যাপী শোক ও সুখের কথা বলে নিতে চাই

কষ্ট পেতে ভালো লাগে—এই কথা যেহেতু ভাবিনি, যেহেতু কখনো কষ্ট
এতখানি সুশীলা ছিলনা, আজ দেখ অবশ শরীর-প্রাণ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে,
কখনো কিছুই আর নিজে থেকে ঘটবেনা, এইভাবে বড় হওয়া গেল,
যা কিছু মানতে হবে সবটুকু জেনে নেওয়া গেল, তাই মধ্যবসন্তের রাত,
এইবেলা ঝুলি ঝেড়ে বার করি ভাঙা মার্বেল আর কুটুমকাটাম,
ছুরি, গুলতি, সোনালি দশ নয়া

যেহেতু এখন জানি অকস্মাৎ কোনোকিছু ঘটবেনা আব, জানি
যেভাবে হবার—সব হবে, একা একা বাড়ি ফিরে অন্যতর কিছু দেখবনা,
যা কিনা বিস্ফোরক, দেখবনা, এভাবেই শেষ হল,
এভাবেই শেষ হওয়া ভালো, শুধু নিজেই নিজেকে দেখে হেসে ফেলবার আগে
কালবীথি, অনন্তপ্রবাহ, আমি কিছু কথা বলে নিতে চাই

মন যদি তোর

মন যদি তোর খারাপ থাকে সেই দেশেতে চল
যেথা নদী ছোটে ঊর্ধ্বপানে, পাথর ভাঙে জল

ও তুই সেই দেশেতে চল

সকাল থেকে বিকাল যদি তোর না কাটে আর
তবে ঘুইরা মরিস অন্তরীক্ষে, পবন চমৎকার
ও তোর কাল কাটে না আর

যদি বাঁচার দেশে নিদেনকালে তোর কেউ না থাকে
তবু শুইয়া থাকিস শান্তমুখে, হাস্য ভালো রাখে
ও তোর কেউ আর না থাকে

স্বপ্ন দেখিস পিতৃলোকে জল ছুটে যায়, তল
ও তার কেইবা পাবে বল্,
জলেস্থলের বিরোধ এত মৌলীতে কে রাখে
ও তোর কেউ যদি না থাকে

গায় জয়দেব, রাখালরাজা বাদ্য বাজায় ঘোর
যা কিছু হারায় ভুসুক বলেন, চিত্ত ব্যাটাই চোর

জ্যৈষ্ঠগীত

সবুজ সোঁতের ছায়া পড়ে আমার বুকে কন্যা হে
শালুক ডাঁটার ছায়া তুমি, তন্বী, বৃ[illegible]ন্যা হে
চিকণ আঙুল, কী কও তখন, বিড়ি ধরাও আলগোছে
বইসা থাকি বেগুনপোড়া, আমায় যদি কেউ পোছে
বইসা থাকি, বইসা থাকি, সুয্যি গড়ায় পশ্চিমে
আকাশ কেমন উদ্‌ভুতুড়ে, এবং আমি পুষ্যি মেঘ
কালো কন্যা, ভালো কন্যা, উধাও তুমি জষ্টি মাস
আইসা গেল, পাতার ফাঁকে আমের গায়ে মিষ্ট বাস
এই গ্রীষ্মে গান গাইবা, নাচ করবা, ছাড়ান দাও
তোমার গুণের ছিরি ভাবো কেউ জানে না, বিড়িই খাও
অধিকমাত্রা ধূমপানে হয় রোগের আকর, এসব ঠিক
কিন্তু যেটা আসল কথা আমি পুরুষ ও তান্ত্রিক

মেয়েদের প্রতি

চিনি চিনি বলি বটে তোমায় চেনা যায়না শ্যামা
চণ্ডী তুমি, দুর্গা, কালী, ছিন্নমস্তা, তিলোত্তমা
এই দেখি পিঞ্জরে বাসা, এই দেখি হা-হা শূন্যে
অনন্ত পাপ ওষ্ঠে মেখেছ, তবু সাঁতরাও পুণ্যে

চিনি চিনি বলি বটে তোমায় চিনতে পারিনা মা
লায়লা তুমি, দেবী ম্যাকবেথ, বেহুলা ও বদউজ্জামাল
আমি পাগল কেঁদে ভাসাই, আগুন ঝরাই আক্রোশে
তুমি থাক নির্বিকল্প, নিঃস্বরূপা, নির্বিশেষ

আজন্ম অধীনা ওগো, নৈরাত্ম্যায় নাচো
মরতে মরতে বাঁচাও আবার মারতে মারতে বাঁচো।

প্রণয়মঙ্গলা

তোমায় দেখি, তোমার কথা ভাবি
তোমায় মারি, তোমায় নাকছাবি
পরাই মনে মনে,
হায় মেয়ে তোর রূপের গাঙে রূপ ভেসে যায় অনেক
দূরে দূরে দূরে দূরে
তোমায় খাই, তোমায় খাই কুরে

তোমায় দেখি, মূর্ধা-তালু জ্বলে
তোমায় ভাবি. বাঙাল বুক টলে
তোমায় টেনে নামাই কাদায়, গাঁয়ের ঘরে তুলি
পরাই রাঙা শাড়ি, তোমার চিকণ অঙ্গুলি
আধেক তুলে আমায় শাসন করো
চাযাড়ে চুম্বনে মরো, মরো মরো মরো

শহর থেকে এনেছি কবিওলা
বেজায় বোল বোলাও

নাম—জয়দেব, বেসুরো গান করেন :
"কী ভালো যে বাসি তোমায় জানেন শুধু লরেন্স..."

এপিটাফ

কতশত মাইল কে জানে, হে অনন্ত, তোমাকে ধরবার জন্য ছুটে যাব,
ছুঁয়েও ফেলব ঠিক, জানি তবু কখনই ছুঁতে পারব না,
যেমনি পাকড়ে নেব, তাকিয়ে দেখব সেই সীমানাই ছুঁয়ে আছি ফের;
এভাবেই জমে যাবে আবার ক্রীড়াঙ্গন, ঠাকুরশাহীতে যারা
এ খেলা খেলেছে সব বসে থাকবে গ্যালারি ভরিয়ে,
বসে থাকবে বরিশাল থেকে আসা দাশবাবু, হাতে ঘড়ি,
পকেটে কলম, আছেন বিলিতি কোচ ইলিচ সাহেব, তিনি
ট্র্যাকের বাইরে এক চেয়ারে চুপটি করে বসে থাকবেন,
জলের বালতি তাঁর পাশে, লেবুর পিরিচ, আর আমরা দুজন...

ছুট, ছুট, হে অনন্ত, তোমাকে ধরবার জন্য ছুটে খুব ক্লান্ত হয়ে গেলে
দর্শকেরা শব্দহীন উঠে দাঁড়াবেন আর নরম পায়ের শব্দে
কোচ এসে রঙিন তোয়ালে দিয়ে মুছিয়ে দেবেন দুই শুয়ে থাকা
খেলুড়ের দেহ

লুপ্ত পূজাবিধি

উদর আঁট করে বসেছি ঠাকরুণ, খাদ্য দাও কিছু আদ্যা মা
উপোসে বমি পায়, পিত্তরক্ষায় পারলে দুই মুঠো ভাত দে মা

শ্রাবণে বনময় অঝোর ঝড় কাঁপে, দাওয়ার মাটি গলে জল
এমন দুর্দিনে অতিথ্ ফিরে যায়, আকাশে ঘোর কজ্জল

অস্থি বাঁকা করে পরাই গুণ, তবু বারংবার ছেঁড়ে গুণ
এত কি গুণ ধরি নিজের শিরদাঁড়া লম্বা করি দুই গুণ

কুলুঙ্গিতে জমা নিকষ অমা, ওমা, নিষ্কাশনে ঝরে অশ্রু
ভরেনা অঞ্জলি, আপন মনে জ্বলি, কী খাব কাল আর পরশু

কুল্যে একটাই জন্ম, তন্ময় হয়েছি তাই, আমি বাধ্য মা
তুলিকা টান করে বসেছি অভাজনে ভাত না দিলে দাও সাধ্য মা

পূর্বরাগ

[একটি জনগণতান্ত্রিক বচনা]

রোহিতাশ্ব, ভাই ঘোড়া, আমাকে জরুরি কিছু পরামর্শ দাও। মেয়েটির চোখ দুটো দেখা গেল ধ্রুপদী বাঙালি। গয়নাবাতিক নেই। চমৎকার শাড়ি পরে। সুতরাং বাহ্যত সমস্যা থাকছে না। আমার তো মনে হয়...রোহিতাশ্ব, ঔদরিক, তামস গুল্ম খাওয়া একটু বন্ধ রাখো। আমার তো মনে হয় কৃষক আন্দোলনে মেয়েটিরও সমর্থন আছে। তোমাকে বলেছে কিছু এ বিষয়ে? রোহিতাশ্ব, অকারণ তোমার এই পুচ্ছ নাচানো দেখে ব্রহ্মতালু জ্বলে যায়। সিরিয়াস হও ভাই। তুমি কি চালাবে কথা? বোলো, আমি কুঁড়ে তবু এখনো বাতিল নই। তেমন সময় এলে আশা করা যায় আমাকেও পুলিশ ধরবে। ভালো মেয়েদের তবু বিশ্বাস করতে নেই খুব। কম্বল ধোলাই খেয়ে আমি যদি কোনোদিন মুখ খুলে ফেলি, তখন আমায় ঘৃণা করবে তো? পারবে তো সে মেয়েটি, বিচ্ছেদ চাইবে তো? জেনে নিও রোহিতাশ্ব। সেই বুঝে বাড়িতে জানাব।

আশা

তুমি জান, রোহিতাশ্ব, বহুদিন কান্না আসেনা। তাহলে কি বড় হচ্ছি? সেই যে বছর তুমি এলে, শেষবার কান্না পেয়েছিল। কেউ এল অন্তত। দেশময় হুলুস্থুলু সে বছরে, মন্ত্রীরা চোর প্রমাণিত। সে সময়ে তুমি এলে, তোমার কেশর ঘন, তাম্রবর্ণ, তীব্রগন্ধী দেহ। তুমি জান, রোহিতাশ্ব, তারপর থেকে শুধু ছিন্ন দিন, ছন্ন রাত্রি। একমাত্র বন্ধু তুমি লাল ঘোড়া—প্রিয়সন্নিধান। কষ্ট খুব কামড়ায়, মাঝে মাঝে। তিক্ত রসে ভরে যায় জিভ। রোহিতাশ্ব, প্রিয় সখা, এই গান, নির্জনতা, আসন্ন শরতে এই দেশজোড়া খরা-বন্যা, এসবের মধ্য দিয়ে কোথায় চলেছি? ক্যুয়ো ভাদিস, ঘোড়া বন্ধু? এত রক্ত, উপবাস, অস্ত্রের যবনিকা ভেদ করে যেখানে পৌঁছব, সেথায় কে কান্না ফিরে দেবে? বস্তুত, আজ ঐ মেয়েটিকে দেখে চোখময় বাষ্প ঘনাল। তবু বাষ্প, বহুদিন পর। রোহিতাশ্ব, সেই দেশে মেয়েটি কি কান্না ফিরে দেবে?

অসতী

১.
পায়ের তলায় হঠাৎ ফুটল কী
আস্তে একটু চলনা ঠাকুরঝি
ওমা, এ যে শাঁখার কুচি, নয়?
বাতাসে তাপ লাগছে কেন ভাই?

মুখপুড়ি কি একেবারে ছাই?

২.
গিজতা গিজাং ধিতাক্ ধিন্
আজকে সবার পুণ্য দিন
ঢ্যাম্ কুড়কুড় ধুম্‌তা ধা
কার ব্যাটা দেখ শ্মশান যায়
তাধিনা ধিনা গিজ্‌তা গে
পিছনে আসে ওইটা কে?

ঐ ঘোর মত্ত করে নৃত্য রঙ্গ মাঝারে
লক্ষ লক্ষ যক্ষ রক্ষ ঘেরি শ্যামারে
লট্টপট্ট কেশ অট্ট অট্ট হাসিছে
হা-হা হা-হা হা-হা

হা-হা-হা হা-হা-হা হেসে ছুটে এল লোল পুরোহিত,
কপালে কুক্কুররাশি, চোখে শনি, জিভে অশ্লেষা,
বাহান্ন টুকরো দেবী, আয় দেবী, ছাগমুণ্ড পিতা তোর
আয় দেবী সর্বভূতে বিরাজিতা, এই মেয়ে ভূতে বিরাজিতা
এক্ষুণি হবে, আয় দেবী আয়, রক্তপায়ী শৃগালস্বরূপা,
অস্থিপাশা পেতে রাখি, দান ছুঁড়ি, ওঠ ছুঁড়ি বিয়ে হবে,
আগুন দ্বিতীয় পতি, দান ছুঁড়ি, এই ছুঁড়ি মুঞ্জরে না
ভয় লাগে ওর চড়তে কাঠে, বুক ফাটে, তাও মুখ ফোটেনা এখনো,
আয় ছুঁড়ি, আগুন দ্বিতীয় পতি, গুণাগুণ লোপ পাবে,
অস্থিপাশা পড়ে রবে, আয়ুর প্রহর খাবে অগ্নিকীট...
হা-হা লগ্নিকীট...

৩.

চান্দের সাম্পান আসে জোছ্নার পানিতে ভাসে
মুক্তার পাল ফুইলা ওঠে তায়
পানেতে চন্দন কিবা তাহাতে লক্ষ্মীর ডিবা
কন্যা তোর আননে চমকায়
বাহুতে লাজুক লতা দৃষ্টি কাঁপে অবনতা
পদপাতে মল কাইন্দা মরে
কান্দে মায়ে অবিরত কান্দে পুরবাসী যত
মোর বুকে পাষাণ বিদরে
এতকাল ছিলি উমা আজ কোথা যাস ওমা
গৃহে না পশিবে আর আলো
শ্বশুর বারাত দেখে শ্বশ্রুমাতা পায়ে রাখে
কে সেথা বাসিবে এত ভালো
দেবর গঞ্জনা দিবে ননদিনী না সাধিবে
বেঘোরে মরিবে কবে পতি
মাগো মোর মাথা খাস যেথা খুশি চলে যাস
সতী হয়ে না হোস অসতী

৪.

ধা ধা ধিন্ তা কৎ তা গে
গিন্নি ঘা দেন কর্তাকে
পুতের বউ ভাতারখাকী
আর কতটা পুড়তে বাকি?

তাথৈ তা থৈ তা
কর্তা বলেন, আঃ
থামোতো একটু, এখনি
খুলিটা ফাটাবে, দেখে নিই

গিন্নি একটু বিষণ্ণ
ভাব দেখালেন, আরণ্যক
জ্যোৎস্না ঢাকল শ্মশানঘাট
অগ্নিগর্ভ রাজ্যপাট

ছিছিক্কার, অশ্রুজল
উপরে উষ্ণ, নীচে শীতল

বাদ-প্রতিবাদ, শান্তিজল
উপরে উষ্ণ, নীচে শীতল

গিলি গিলি গিলি গিলি গে
এ বড় নৃশংসতা হে
হ্রীং-ক্লীং-স্বাহা
পুড়ল পুণ্যবতী, আহা

৫.
ওদিকে তখন মেঘ আদিগন্ত আবরণ হয়ে
ঢাকল আকাশের লজ্জা, যাতে রোদ যাতে উষ্ণতা
কিছুটা বঞ্চনা করে পৃথিবীকে, এবং ময়ূর
অভ্যাসে পেখম মেলল, সেই তীব্র ন্যায়বোধহীন
রঙিন আল্পনা যারা চোখে দেখেছিল
তাদের শরীর চুঁয়ে অজান্তেই নেমে এল বিষ,
শিউরে উঠল মাটি, ঘেন্নায় ঝরে পড়ল পাতা,
পোড়া মাংসের গন্ধে তখন বাতাস কানা, আর ইতস্তত
কিছু মানুষের পেশি সহসা ইস্পাত, যারা নারী—
কিম্পুরুষবর্ষ থেকে সমস্ত মমতা তুলে নিয়ে তারা
চলে গেল কোথায় কে জানে, শুধু রয়ে গেল
দেশময় ওঝা ও ডাকিনী, রয়ে গেল গান,
সেই গান বেঁধেছিল উপবাসে পঙ্গু বালিকারা...

যা মেঘ যা উড়ে যা কিশোরী রূপ পুড়ে যায়
যা মেঘ যা উড়ে যা কিশোরী রূপ পুড়ে যায়

৯ ডিসেম্বর,

কোথায় গেছিলে তুমি রোহিতাশ্ব, আমাকে শোনাও, কেমন ভ্রমণ হল অঘ্রাণের আশ্চর্য দিনে? কেল্লার পিছনে যারা সারারাত ধুনি জ্বেলেছিল, বলো তারা কেউ শীতে কষ্ট পেয়েছিল? খেতে পেয়েছিল তারা? কেমন সকাল হলো পরদিন? আমি জানি রোহিতাশ্ব, সেই দিন সূর্য ছিল উপমাবিহীন। কখন সজ্জিত হল অভিযাত্রীদল? রাজপথে কিভাবে শিউরে উঠল দশলক্ষ লোহিতকেশর? কিভাবে আছড়ে পড়ল দশলক্ষ নিঃশ্বাসের ঝড়?

তুমি গেলে রোহিতাশ্ব, তারপর থেকে আর ঘুম নেই। রাত্রিদিন উদ্বেগে থেকেছি। কোথায় গেছিলে তুমি অশ্বিনীকুমার, কোন দিগ্বিজয়ে? বলো বলো রোহিতাশ্ব, তোমাকে ক্ষিপ্ত দেখে ভয় পেয়েছিল কিনা বিপক্ষের ভাড়াটে সেনারা?

দুশ্চিন্তা

আমি কি তরুণ কবি? রোহিতাশ্ব, মতামত দাও। উদাসীন হাসো কেন? একথা শুনেছি বটে, তুমি কোনো কবিফবি পাত্তা দাও না। শিল্পে তোমার, হায়, দিলচস্পি নেই। কী আর করার আছে, সকলে পাঠক নয়, কেউ কেউ আরো বেশি—কবিতাবিরোধী। তবু এই অভিধার মীমাংসা আশু প্রয়োজন। তরুণ কবিরা শুনি অনেকেই অতিবিপ্লবী। কেউ কেউ দাড়ি রাখে, কেউ যায় খালাসিটোলায়। বাকি সব করে রব এখানে সেখানে। তবু তারা নিয়মিত জ্যান্ত কবিতা লিখে থাকে। রোহিতাশ্ব, লাল ঘোড়া, আমাদের অতিবামে অ্যালার্জি রয়েছে। অন্যসব রোগভোগও সম্প্রতি কাটিয়ে উঠেছি। এবং কবিতা, দেখ, লিখতে পারিনা। আমার ব্যাপার তবে বাদ দাও। এসো, ঐ কবিদের ছুঁয়ে দেখি অনুভূতিদেশ। এখানেও সমস্যা ঘনাল। কে কবি কবে কে মোরে? যে জন ডিভোর্স দেয় শবদে শবদে সেও কেন কবি নয়? যদি সেই দম্পতি হয়ে থাকে পরাতন—সরস্বতীহীন?

কেরামতমঙ্গল

স্বাধীনতা হরণযোগ্য না। রাজীবের উচ্ছন্নে যাওয়ার স্বাধীনতাও না, আমার ভালোবাসার স্বাধীনতাও না। যে যার ভাগের ধান নিয়ে যাক। সরকার রৌরবে যায় কামানশকটে। আমেন...

জলস্রাব সুখস্রাব পিছু হটে গেলে পড়ে থাকে সময় ও শূন্যতাখাতে বিবর্ণ হিসেব। প্রতিটি সত্যের দাম আপাতত পাঁচ হাজার টাকা। এবং, কলম থেকে এক ইঞ্চি দূর দিয়ে হাতকড়া নেচে উঠছে হুলা-হুলা। ভেঙে পড়ছে চতুর্থ থামের ইঁট, ঝরে যাচ্ছে অধঃপাতে বাঙালি কবিরা। কে কথা বলবে আজ? টেবিলে-খাটের নীচে নিরাপদ কবিতার গেঁয়ো নান্দী, গেঁয়ো বৈতালিক। তওবা. তওবা, তবে সরস্বতী এতদিন বাঁধা ছিল হিজড়াদের কাছে?

এখনই সময়, এসো. ফুলের মধ্যে ফুটে ওঠো। এসো শস্যে, এসো ঘাসে, এসো পুকুরে মাছের ঘাইয়ে, এসো ভেড়ি দখলের উন্মত্ত কাজিয়ায়। এসো স্টেশন চত্বরে, এসো মণিহারি

টিপছাপে, এসো গুলতি-ক্যাম্বিস বলে, এসো টেপফ্রকের অনভিজ্ঞতায়। বলো, কথা বলো। যে কথা শোভন নয়, যে কথা মার্জিত নয়, যে কথা 'সম্মানহানি' করে, সেইসব সত্যি কথা বলো।

স্বাধীনতা হরণযোগ্য না। সরকার ঘোষিত হার্মাদ। অস্ত্রে সাজি, সঙ্গে যায় বোহিতাশ্বপাল।

যাত্রাবিন্দু

আলপথে গোলাপি কুর্তা পরা কিশোরীর স্ন্যাপশট, আমাকে লেখার জোর ফিরে দাও। যায় সূর্য, অস্ত যায় পশ্চিম গগনে। বরফশূন্যতা ভেঙে কোথায় ছুটছে ট্রেন, দু-পাশে সবুজ দড়ি, পাতাবেড়া। এতক্ষণ রাগে মাথা ঝন্‌ঝন্ করছিল, দেখো, এখন মেঝেতে কারা শুকোচ্ছে সেদ্ধ-করা ধান। নিমেষে মিলিয়ে গেল ল্যাম্পপোস্টে ভর-দেওয়া মেঝেনশঙ্খিনী, সন্ধ্যার নিসর্গে তার বাহুমূল থেকে উঠে এল তীব্র, কটু ঝাঁঝ। হে গন্ধ, প্রসন্ন হও, আমার অক্ষরজ্ঞান এখনো হয়নি। রাত্রিদিন এককথা ভ্যানর-ভ্যানর আমি শুনতে পারি না। কে না জানে, মেয়েটি আমাকে দেখে প্রতিদিন নাক কোঁচকায়! কী আর করার আছে, সব ছেলে প্রণয়ের উপযুক্ত নয়। তা বলে কি বিষ খাব, ত্রিভঙ্গ মেঝেন, বল এতদূর নাটক কি ছাব্বিশে সাজে? তার চেয়ে দেখো ঐ অপার আকাশ থেকে ঝুলে পড়ছে একগুচ্ছ মেঘ। কুটিল, বিষণ্ণ গ্রাম ডুবে যাচ্ছে অন্ধকারে, আমাকে গল্প বলো তার। ভুবনের পাঠ বলো, কীভাবে মাসির কান কেটে নিয়েছিল? বলো, কবে গেছিলেন উন্মাদ কবির কাছে মার্কস? এবং মিনতি করি, বন্ধ কর একঘেয়ে পরাজয়গাথা। তেযট্টি পয়জার মারি পিরীতব্যর্থতাকে। আমাকে লেখার হাত ফিরে দাও, বেমানান কুর্তা পরা গাঁওয়ার রাধিকা।

বিষফোঁটা-১

কিন্নর, হাওয়া দিচ্ছে। বর্ষের এপার থেকে ওপার অবধি সেই পাগলা বাতাস, একজনের টুপি উড়ে সেঁটে বসছে অন্যের চুলে, এবং আকাশ কালো, প্রত্যেকেই সন্দিগ্ধ, এর সাধ্বী ওর ঘরে দিয়ে আসছে গোপন দলিল, কিন্নর, বসে আছ নিজের রক্তের পাশে ভাষাহীন-কৌতূহলহীন, ভালোবাসলে এই হয়, ও-রক্তে তোমারই ছায়া, উঠে এসো, ঐ দেখ বেজে উঠল বীণা ও সন্তুর, বমি ও তামাকের গন্ধে নিশাক্লাব এখন মাতাল, যেন টলে পড়বে সোফাসেট-ট্রিপ্‌ল কঙ্গো, কিন্নর, এইবেলা প্রত্যেকেই টর্চ ফেলে দেখে নিচ্ছে অন্যের মুখ, পশ্চিম দিগন্ত থেকে উড়ে আসছে মেঘশকুনের পাল, তাদের ডানায় লেখা—'শীতল

পানীয়', তাদের চঞ্চুতে ধরা আধুনিক বার্তাসরঞ্জাম, কিন্নর, ট্র্যাজিক হিরো, বিধর্মে যেও না, তোমার কোষ্ঠীতে কারো ভালবাসা লেখা নেই, পাগল বাতাস দেখ হেসে উঠছে হি-হি করে, এলোমেলো করে দিচ্ছে গৃহস্থের চালডাল, লুটেপুটে খায় যারা চিহ্নিত হয়ে যাচ্ছে নিজের অজ্ঞাতে, এইভাবে ব্যূহরচনার কাল শুরু হল, এখন বাতাস খেলছে এর পরে শুধু হবে আসল কবাডি, কিন্নর, বিনোদকর্মী, ধর্মক্ষেত্র-কুরুক্ষেত্রে তুমি হও ট্র্যাম্পেটবাদক, শিগ্‌গির জামা পর, জুতোমুজো পায় দাও, বাচ্চা ছেলের মতো কেঁদো না নির্বোধ, আঃ—বলছি না তোমাদের ভালোবাসতে নেই!

বিষফোঁটা-২

কী দেখছ ঐ দিকে? দুগ্ধতোয়া পল্লীপথে হেঁটে আসছে সেই মুখ। দীর্ঘ বৃষ্টির পর সে-সময়ে সন্ধ্যা নামো-নামো। সেই মুখের প্রতিটি রেখা ঋজু ও কৌণিক। আর, ত্বক শঙ্খশাদা...কিন্নর, কুঁকড়ে যাও, কী দেখছ ঐ দিকে? ওখান রক্তের গন্ধ, ওখানে আশার ছাই জমে আছে পথের দুধারে। কিন্নর, তুমি কিছু আশা করেছিলে? এবার মিটেছে? দৃশ্যের সামনে তবে যন্ত্রণা মুঠো করে কী করবে আয়ুভর? বিবর্ণ জনতার মুখ মনে করো। ভাবো সেই উপত্যকা। এখন রাত্রিদিন উচ্ছন্নে চলে যায়। কিন্নর, পেশাদার প্রেমিকপুরুষ, তোমার চোখের নীচে কালি পড়ছে। নোনা জল লেগে আছে তোমার চিবুকে, চোখ শূন্য, ভিতরে কোথাও তার এতটুকু ঢেউ নেই, সাড়া নেই, শুধু তুমি নিথর দাঁড়িয়ে আছ। দেয়ালে ঠেকানো পিঠ, আর দৃশ্যে সেই মুখ হেঁটে যাচ্ছে বিপ্রতীপ পথে...কোনোদিন নীলাম্বরী...কোনোদিন কুর্তা-শিল্‌ওয়ার...তুমি বলতে নিরাসক্তি...তুমি বলতে আত্মস্বচ্ছতা...নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছ...বোকারাম, বেঁচে আছ?

এস.ও.এস

আজ তিনদিন তিন রাত্তির হয়ে গেল আমি তোমার কথা ভাবছি। ভাবছি আর স্তরে স্তরে হাঁটু ও কোমর থেকে বুক অবধি উঠে আসছে জল, যমুনার স্ফীত ও ক্ষিপ্ত জল, ভেসে যাচ্ছে মজনু কা টিলা, আমি তার শেষ প্রহরা, শেষ সান্ত্রী, আমি তোমার কথা ভাবছি, তুমি বিষম খাচ্ছ, তোমার কথা ভাবছি, তুমি জিভ কামড়ে ফেলছ, তোমার কথা ভাবছি, আমিই শেষ মানুষ যার বুক থেকে গলা থেকে চিবুকেও উঁকি দিচ্ছে জল, আমি তোমার কথা ভাবছি, আমার কান ছুঁচ্ছে লতি ছুঁচ্ছে জল, শেষরাতে খাঁ-খাঁ করছে মজনু কা টিলা, আমায় প্রেমিক বোলোনা, ফিয়াঁসে বোলোনা, শতাব্দীর শেষ সান্ত্রী আমি, তোমার জন্যও ছাড়তে পারিনি দেশ, মানতে পারিনি সাত-সাত্তে উনপঞ্চাশ ঠাকুরদেব্‌তা, বন্ধ করিনি একদিনও পোস্টার লেখা, শুধু ভাবছি, তোমার বাঁ চোখ নাচছে, শুধু ভাবছি,

তোমার গুরগুর করে উঠছে বুক, আমাদের এই হয়, একদিন ভেঙে যায় বিপদসীমার জারিজুরি, আর স্রোত, হু হু স্রোত-ঢুকে পড়ে কপাট-খিলান ভেঙে, তারপর কান থেকে কপাল ছাড়িয়ে যায় জল, ডুবে যায় মজনু কা টিলা, ডুবে যায় শেষ পেহ্‌রেদার, তবু সে ভাবছে তোমার কথা, তুমি...তুমি...তোমার চুল থেকে নখ পর্যন্ত সব কথা, যা তোমাকে কোনোদিনও বলা হল না।

ট্যুরিস্ট গাইড

ভূর্জপাতে লেখা এই সত্যগুলি মনে রেখো। আমি এক ভারতীয়, আমাদের বাঁচার ধরন কিছুটা ভিন্ন, হে আমার বিদেশি বন্ধুরা, যা কিনা অতিদ্রুত তোমাদের অচেনা ঠেকবে। অর্থাৎ, পরাজিত হতে হতে যে সময়ে আমাদের নাক আমূল মাটিতে ঘষে গেছে, তখনই আসলে আমরা লড়তে শুরু করি। এসব জান না তোমরা, দুর্ভাগ্যবশত, আমাদের দেশি শাসকেরা—এতকিছু তারাও জানেনা।

ফলে এই সংহিতা সঙ্গে রেখো বন্ধুদল, যেরকম সঙ্গে রাখ ক্যামেরা ও গর্ভনিরোধক, নাহলে যে কোনোদিন এই উষ্ণ কালো মাটি তোমাদের বিপাকে ফেলবে। চৌকাঠের কোণা থেকে, বাথরুমের নালা থেকে, মধ্যদিনে যবে গান বন্ধ করে পাখি তখন খেতের কোনো অবিশ্বাস্য গর্ত থেকে আচমকা ছোবল এসে তোমাদের অন্ধ করে দেবে। গোধূলিতে বন্ধু হয়ে উঠোনে দাঁড়িও, দেহের মাংস কেটে নৈশভোজ দেব। নিশুতি রাত্তিরে যদি সিঁদ কাট, মস্ত আঁশবঁটি দিয়ে বড়বউ ধড় থেকে মুণ্ডু ছিঁড়ে নেবে।

ভারতীয় আতিথ্যের শর্ত মেনো পর্যটক, তোমরা—যারা ঘুরে দেখছ লাদাখের সীমান্ত অঞ্চল, তোমরা—যারা ঈশু ভজছো কোহিমার দূরবর্তী গ্রামে, তোমরা—যারা পালক বুলিয়ে দ্রুত শিহরণ সৃষ্টি করছ সিংভূমে, অযোধ্য পাহাড়ে, ভূর্জপত্রে লেখা এই সত্যগুলি মনে রেখো। আমি সেই চণ্ডাল, অতিরিক্ত কৌতূহল দেখাতে চাইনা আর দেখতেও, প্রিয় বন্ধু, পছন্দ করিনা।

রোগশয্যায়

নীহার, নীহার, হেমন্ত এলে কুয়াশা নামবে
অথচ আমার মাথার মধ্যে এত আগে কেন ছায়াচ্ছন্নতা,
নীহার, নীহার, এখন আমার ওষুধ খাওয়ার সময় হয়েছে,
আজো শুয়ে আছি, তুমি জান কেন উঠতে পারিনা?

নীহার, আমি যে এত রাশি রাশি অক্ষরকণা নষ্ট করছি,
এর কি সত্যি দাম আছে কোনো? তার চেয়ে চলো শিমূলতলায়
বাড়ি ভাড়া করে থাকি কিছুদিন, সেখানে কি দুধ
এখনো তেমন শস্তা, নীহার, রান্না করবে?

নীহার, তোমার ঘটিহাতা জামা অকারণভাবে ময়ূরকণ্ঠী,
নীহার, তোমার ভিজে চুল ধীরে শুকিয়ে আসছে,
তবু শুনি বীরচন্দ্রমনুতে এখনো চিতার আগুন জ্বলছে...

নীহার, আমি যে উঠতে পারিনা. উঠতে শেখাও, উঠতে শেখাও

প্রত্যহ

এসবই তোমাকে চিঠি, ভীতু প্রেমিকের দিনলিপি। এ সবই আমার গল্প...যে ছেলেটি অতিসদ্য ভালোবাসা শিখে উঠছে, তার চর্যা এরকমই, শিক্ষানবিশি। আকাশভুবন ভরে শীত এল এবছর, শাদা লোমে ভরে গেল মাঠ। আরো কত কষ্ট পাব? আমি তা জানি না শুধু অপেক্ষা অন্তহীন জানি। বেরিয়ে পড়ব তাই, ক্লাবঘর, সাইকেল, তোমার দোতলা বাড়ি কিয়ৎক্ষণ দূরে রেখে, শেষ ডিসেম্বরে। দেখতে চাই কতদূর যেতে পারে স্মৃতি। শিউড়ি-লাভপুর রুটে দেখতে চাই বাসের মাথায় তুমি সঙ্গ দাও কিনা। আখের রসের ফেনা—তোমার গায়ের রং মনে পড়ে। মনে পড়ে অহংকার, সন্ধ্যায় শাহী বজরার মতো তোমার বাড়িতে ফেরা। অশ্রুর উপমান যদি রাখি শীতকালীনতা তবে তা অনাধুনিক হবে। রংজ্বলা প্যান্ট পরে তবুও নিজেকে এক বিষণ্ণ নাবিক মনে হয়। ডিঙিনৌকো ফেরিবোট, রূপালি সাম্পান ছেড়ে একা একা আঘাটায় দাঁড়িয়ে রয়েছি। নিজেই চিনিনা আমি এই ধৈর্য, আজকে জানাই, এসব তোমার জন্য, তোমারই খেলার জন্য রাখা...

মেঘদূত

সূচি
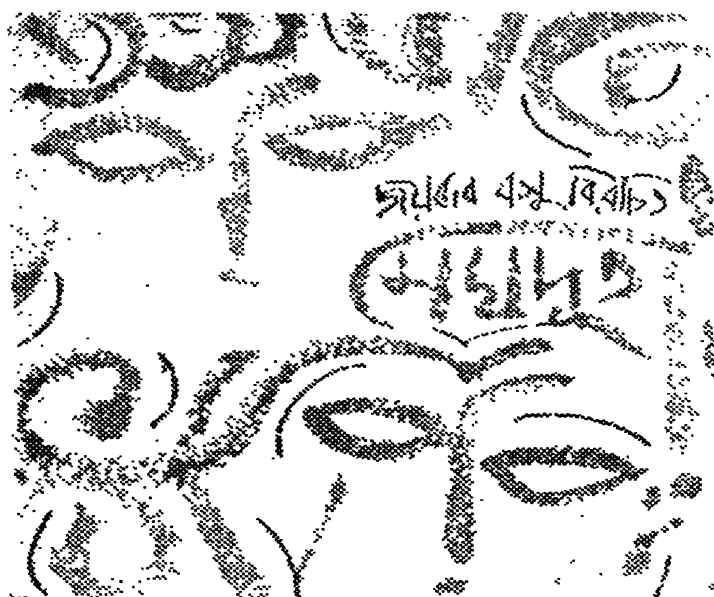
হে সুজন,
প্রতি মানুষের মধ্যে অতলস্পর্শী বিরহ
হয়ত এমন আপ্তবাক্য রূপকথা নয়
তবু নিজস্ব সুমেরু চূড়ায় দাঁড়িয়ে মানুষ
অন্যের দিকে ছুঁড়ে-ছুঁড়ে দেয় কুয়াশার তার

আজও ভেসে যায় টেলিগ্রাফের ময়ূরপঙ্খী,
"ওহে, কেউ আছো আমার শব্দ শুনতে পাচ্ছো?"
কড়া-য় কড়া-য় হায় কি সফল আশাবরী গান
বেজে ওঠে, তবু জন্মান্তরে ছুঁড়ে যায় কথা

এরকমই এক যুবক সে, তার-কোনো নাম নেই
প্রাতিষ্ঠানিক ছন্দ ভেঙেছে নিজের সমাজে
এই অপরাধ স্থান খুঁজে তার দিয়েছে দারুণ
ঊষর চূড়ায়, প্রতিদিন যাতে নির্বাসিতের

স্বাধিকারস্পৃহা অনশন থেকে আরও অনশনে
ক্ষীণ হয়ে শেষে মেলায় আকাশে শুকনো বাতাসে
যাতে ভবিষ্যে নমনীয় হয় শিরদাঁড়া তার;
আপাতত, বেশ কয়মাস যুবা কাটাল এখানে।

রসিক সুজন, আবহমানের আরেকটি ছাঁদ
ভুলে যায় যত দণ্ডপাণির নিত্য পূজারী
প্রতিটি মানুষ ছুঁড়ে দেয় সেই জীবনের সুতো
উদ্বাস্তুও খুঁজে ফেরে তার পুনর্বাসন

আষাঢ় মাসের পয়লা তারিখ সকালবেলায়
দেখল যুবক গাভীন মেঘের ধীর চলাচল
যেন মেঘ নয়, মেঘের শরীরে সহেলিস্বজন
শ্লথকম্পিত পায়ে হেঁটে যায় জীবনযাপনে

চেতনাচেতনে ভুল হয়ে যায় আজ যুবকের
ডেকে ওঠে খুব গভীর স্বননে, "ও মেঘ আমার...

পূর্বমেঘ

।। ১।।

আকাশে রেখেছো কার অশ্রুসজলতা, দু-বাহু তুলে এই বিজ্ঞাপন
এঁকেছি পাথরে আজ কীভাবে দূরে থাকি, বাক্য শুষে নেয় কণ্ঠনল
জলের প্রথম দিনে হারাক ধুলোবালি, মাটিতে বাঁচে যদি গুল্মবন
শরীর-সত্তা ছিঁড়ে—হায় গো হায় মেঘ—পাঁজরে আরো জোরে মাদলগান

।। ২।।

ভেঙেছি অনতজানু মুখের টেরাকোটা সেজেছে দেখো আজ কী অপরূপ
স্বেদ ও রক্তে বোনা দারুণ আঙরাখা বিছিয়ে দেয় বুকে মাটি, আগুন
জ্বলেছে, অন্ধকার ছেড়েছে নীল শাড়ি, শ্বাসে ও নিঃশ্বাসে আর্তনাদ
আকাশে ঢেকো না আর স্নানের কথাকলি, ভেজাও অবয়ব, খরার দিন

।। ৩।।

এগোও এগোও মেঘ, শুধু এ চূড়া নয়, সারাটা দেশ জুড়ে বালুকাতাপ
শহরে-গঞ্জে সেই শিশিরসিক্ততা করেই অপহৃত, কুহকরাত
জমাট-অন্ধ-মূক মূর্ত হয়ে ওঠে যত্নে কুঁদে তোলা শবের চোখ
তন্বী ডোমনী তার গভীর কামরূপে লাস্যে খুলে দেয় বিপণিদ্বার

।। ৪।।

ভাসাও নিজেকে মিতা, ক্রমশ উত্তরে, ডানায় লিখে দিই পথের নাম
আমার আর্তি শোনো, গমনে ত্বরা কোরো, এখনও আছে বহু চাতকচোখ
তাদের ঊষর কানে আমার কথা বোলো, নির্বাসনে যেন শীর্ণ হাত
মুষ্টিবদ্ধতায় পেশি ও ধমনিকে সজাগ রাখে এলে ফেরার ক্ষণ

।। ৫।।

জনম অবধি হাম ও দুখ নেহারলুঁ, এখনো দেখা বাকি হে বহমান
কীভাবে ক্ষরিত হয় সময়চূর্ণিকা, কেমন করে ভাঙে জরতী ছাঁদ
মাত্রা-পর্ব যত কপট বুক খুলে আদরে টেনে নেয়, গাঢ় পাতাল
এবং রাত্রি তার কান্ত আভরণ আঁকড়ে ধরে হয় হতাশ, লীন

।। ৬।।

আমার এখনো বাকি নিজেকে জড়ো করা, ক্রমশ হয়ে ওঠা ঊর্ধ্বমুখ
তপের স্থপতিদেহ, যেন বা দধীচিই, মননশ্রমজাত অস্থিসার
আঁচল ছেড়েছি কবে স্মৃতিতে মা-র মুখ ধূসর হয়ে ওঠে যদি তাকাই
এবার সংক্রমণ, এ চরাচর জুড়ে ছড়ানো থাক শুধু জন্মবীজ

।। ৭।।
অন্তিম দক্ষিণে শিখর নীলগিরি, আমার বাস তাতে একবছর
বেঁধেছি নিকোনো ঘর নিজের ঘাম দিয়ে, কয়টি আসবাব, ফুরোলে দিন
দাওয়ার পাশটিতে বিজনে বসে থাকি, বুকের ওমে থাকে ঋতকথন
ঋতুর আবর্তনে প্রবাস কেটে যায়, পিছনে পুড়ে যায় ঝরা অতীত
।। ৮।।
ছাই আর বালি মেখে তখন মৃত্তিকার অঝোর ক্লান্তিতে জাড্য ঘুম
আমার সুপ্তিহীন দুচোখ জ্বলে থাকে, দহন অবয়বে অনির্বাণ
কখনো হাওয়া দেয়, বুঝিবা চুল ওড়ে, আকাশে শুকতারা স্নিগ্ধ, স্থির
সময় ঘনায়মান—শুধু এ কথাটুকু পৌঁছে দাও মেঘ, ঘুম ভাঙাও
।। ৯।।
জলের বাষ্পদেহ তোমাকে জানি মেঘ বৃষ্টি দাও তুমি আর ছায়াও
মেলেছো আয়াসহীন যে কটি বলিরেখা কপালে আঁকা ছিল স্থবিরতার
কোথায় উধাও হল, এ যেন ভানুমতীর অমোঘ তুড়ি দিয়ে গ্রীষ্মশেষ
ভুবন ভাসিয়ে এলে, হে মেঘ গাভীনতা, এবারে থেমে যাক অতিকথন
।। ১০।।
অনেক দূরের দেশ, যাত্রা শুরু করো, তমালতালীবন যে রমণীর
কটির মেখলা আর পায়েল ছুঁয়ে থাকে নীলাভ দ্যুতিমান লবণজল
বিষাদ বিদুষী মুখ, আনত আঁখিপাত, বরফ যার গালে লোধ্ররং
তুমি কি কখনো মেঘ শুনেছ তার কথা, জন্মাবধি যার বিরহরাত
।। ১১।।
কেলাসিত বুকে ফের গলন শুরু হয় তোমাকে দেখে যত গাঁওবুড়োর
আবলুস-চন্দন মাটির কালো ত্বকে শিকড় মেলে দেয়, সিঙ্কোনার
এমন ওষধি ঘ্রাণে তোমারও দেহ হোক মুক্তরোগ আর শিরা সতেজ
শ্রবণ বাতাসে রাখো, আজান ভেসে আসে, হে রাহী আকাশের ঈদের চাঁদ
।। ১২।।
নেভিনীল সাগরের উপর দিয়ে গেলে তোমার শ্রম হত অনেক কম
তবুও মিনতি করি, অল্প ঘুরে যেও, ছয়টি রাজ্যের যাপনপট
লুটিয়ে রয়েছে নীচে কিছুটা ঝুঁকে তুমি ঝরিও সঞ্চিত দেহের জল
বাঁচুক ধানের ক্ষেত, সে যেন বোঝে তার জন্মে আছে কোন শিল্পকাজ
।। ১৩।।
অদূরে বহতা সেই উদয়মুখ নদী, কাবেরী নাম যার, শীতসলিল
পুরাণকথিত যার সিদ্ধি, শোনো তুমি, থেমো গো তার তীরে কিছুক্ষণ

অধুনাশীর্ণা খর রৌদ্রপ্রবাহতে, ঋদ্ধ কোরো তাকে, অসম্ভব
নাহলে একই সাথে তাকিয়ে দেখো, নদী অসমতলে এক জলপ্রপাত

।। ১৪ ।।

যে স্বরে চন্দ্রচূড় ভাঙার দিন এলে স্মরণ করেছেন ছন্দ-তাল
যদি তা শুনতে চাও বাতাসে কান পাতো, সগর্জনে শিবসমুদ্রম্
মাটিতে আছড়ে পড়ে, ফেনার উল্লাস ছড়িয়ে যায় দিগ্বিদিকময়
এখানে প্রণত হও মহান বিস্ময়ে, এমন গড়া দেখে নিসর্গের

।। ১৫ ।।

তথাপি তোমাকে এই প্রকৃতি দূরে রেখে মানুষী কীর্তির যন্ত্রগান
নিহিত রয়েছে যেই সোপানকৌশলে সেদিকে চোখ দিতে হবে এবার
পত্নী সৌদামিনী অচলাবস্থায় পড়েছে বাঁধা যেন, নদীর পাড়
তরাসে কম্পমান, যখন জেগে ওঠে কৃষ্ণকায় কোনো টারবাইন

।। ১৬ ।।

রাত্রি যাপন কোরো এখানে আন্ধার দেয় না মেলে তার এলানো চুল
বরং রাজ্যপাট সাজায় বিদ্যুৎ, দূরের গ্রাম থেকে রুগ্ণ সুর
বিন্দুবিন্দু করে চুঁইয়ে ঝরে পড়ে, যন্ত্র আর যত ধাতব তার
আর্দ্র হয় না, শুধু শরীর দুলে উঠে আলোর ঝকঝকে হাসি ছেটায়

।। ১৭ ।।

বাতাস শান্ত হোক, রাতের অতলতা এখন গ্রাস করে নিক তোমায়
স্নায়ুর শরীর থেকে ত্বরতা মুছে যাক, শিথিল হোক পেশি, আর সময়
এবার পাথর হল, অবচেতন জাগো, স্বপ্ন ঢেলে দাও, আশৈশব
উঠুক স্মৃতিরা জেগে, ঘুমের মাসিপিসি মোদের বাড়ি এসো, কোল বিছাও

।। ১৮ ।।

এখন কি ভোর তবে, আকাশ ধুয়ে কেউ মাটিতে ঢেলে দিল ধানের দুধ
নিমেষে প্লাবিত হল এখানে মালভূমি, বাতাস গতিশীল, শীতল আর
শুধুই কাকলি, কোনো অর্থ জেগে নেই, শান্ত পশ্চিম এবং পুব
পেরোও কাবেরী, মেঘ, এখন শুভকাল, মাটিতে পেতে দাও আশীর্বাদ

।। ১৯ ।।

অনূঢ়া মেয়েরা যদি হঠাৎ চোখ তুলে তোমাকে দেখে হয় রুদ্ধবাক
যাদের ফেরে নি স্বামী সহসা তারা যদি দুচোখ ভেসে দেখে বৃষ্টিপাত
অনিকেত সেই জলে ভাসিয়ে দিলে গাল, যেও না চলে তুমি, একপলক
মাটিতে তাকিয়ে দেখো, ভরেছে গোষ্পদ, উপচে বয়ে যায় বিরহপল

।। ২০।।

দুহাতে দরজা খুলে দাঁড়িয়ে আছে আজও আমার ঘর, নীল অপেক্ষায়
চোখের পাতায় তার শুষ্কশ্যামলিমা, নিয়ত কেঁপে ওঠে তনুচিকন
আমিও তোমার মত সেখানে যেতে চাই, রাখি না পিছুটান অথবা ক্ষোভ
পারি না পারি না মেঘ, মাংসে কেটে বসে, জড়ায় পাকে-পাকে চাবুকধার

।। ২১।।

ভীষণ ঈর্ষা করি, যেহেতু রাষ্ট্রের কখনো নেই কোনো নিয়ন্ত্রণ
তোমার উপরে, তাই অবাধ গতিপথ ক্রমশ খুলে দেয় প্রতিটি দল
আমার চলন ঘিরে উঠেছে কাঁটাগাছ, শিয়রে নেই পূজা, প্রসাদ-ফুল
সরল কুয়াশা জমে অন্ধ দুই চোখ, খাদ্য ক্লোরোফিল আকন্দের

।। ২২।।

উত্তর-পুব দিকে এবারও যেতে হবে, দেখবে ছোট ছোট শহর, গ্রাম
তরুণ সাভানা ঘাস, কপাট খোলা মাঠ, কখনো আখ-ধান-পাটের ক্ষেত
যদিও তোমাকে খুব তাড়না দেবে বায়ু, তবুও অবকাশে অনর্গল
তাদের বর্ষা দিও, যতটা পারো তুমি, ঘুচিও খেদ-জ্বালা লাল-মাটির

।। ২৩।।

বামে থাক মহীশূর এবং মাণ্ডিয়া, এগিয়ে চলো তুমি আরও সমুখ
তিরুপট্টুর ডানে, স্পষ্ট পথ গেছে যেখানে খনি থেকে রৌদ্ররং
গ্রন্থের জটিল ছাঁদে নিষ্কাশিত হয় অযুত শিলা থেকে এক ছটাক
সামনে কোলার সেই তাকিয়ে দেখো মিতা, ত্বরণে আনো আরো অসীম বেগ

।। ২৪।।

কখনো শোন নি বুঝি বলয়-কঙ্কনে কোপিত ঝঙ্কার নেভালে দীপ
উষ্ণ শয্যা কারও নিপুণ নিক্কনে হয় নি বুঝি গূঢ়ভাষ, নিবিড়
আমার স্বজন তার শ্যামল দুই হাতে রাখে নি একদানা ধাতু এমন
তবুও জেনেছি কত যুদ্ধ ঘটে গেছে, সমাজ এই পাপে অসামাজিক

।। ২৫।।

কোলার খনির নাম মাটির বহু নীচে রয়েছে শিলাস্তর, আর্কিয়ান
যুগেতে জন্ম তার, কোয়ার্টাজ শিরা থেকে খনন করে আনে সোনা যে লোক
দুহাত পুড়িয়ে রাঁধে এখনো বউ তার, তামার তাগা বেঁধে সোনা গলায়
বামন সভ্যতার শীর্ণ ক্রীতদাস, এটাই কাজ তার আবহমান

।। ২৬।।

আকাশ আঁধার করে নিচুতে নেমে, মেঘ, এখানে লেখা দেখো—"এসো সুজন
এমন সোনার দেশে"—অথচ তারই নীচে সতত দেখা যায় চমৎকার

এদেশের রসিকতা, মিছিল করে ঢোকে জীর্ণ ফুসফুস খনিশ্রমিক
মুখ ঢেকো লজ্জায়, পারলে বিদ্যুতে পুড়িয়ে দিও ঐ বিভাগদোষ

।। ২৭।।

বৃষ্টি দিয়ো না খুব, হয়ত জল জমে ছড়াবে অবিচল মারী-মড়ক
হয়ত দেরিও হবে সকালে কাজে যেতে বরং ছায়া দাও অনিঃশেষ
যখন দুপুরে দাহ তীব্রতম হবে তখন পরিমিত ঝরিয়ো ত্রাণ
মাটির শরীর থেকে যাতে সে তাপ নেয় শোষণ করে জল, বাষ্প হয়

।। ২৮।।

এবার প্রবেশ করো নতুন এক দেশে, অন্ধ্র নাম তার, দখিনপথ
চারনদী লাঞ্ছিত এখানে লালমাটি তাছাড়া উর্বরা ধানের ক্ষেত
ছড়িয়ে রয়েছে বহু, তবুও ইতিহাস দেয় না ঋদ্ধির কোনো প্রমাণ
শুধুই কান্না আর পুষ্টিহীনতার এলেজি লেখা আছে শরীরময়

।। ২৯।।

কিছুই ভুলি নি আমি, আকাশ-মাটি আর সীমা-অসীম বাঁধা নিয়মে এক
তুমিও মুক্ত নও সে শৃঙ্খলা থেকে যেহেতু বায়ুস্রোত তোমাকে দেয়
চলনের অধিকার, এখন তুমি তাই পূর্বে বাঁক নাও, এই বাতাস
তোমাকে ভাসিয়ে নিক ক্রমশ উপকূলে, পেরোও ক্ষয়জাত পাহাড়পুর

।। ৩০।।

তোমাকে দেখাই এসো দর্শনীয় এক ঘৃণ্যবৃত্তির পুণ্যস্থান
পাহাড়চূড়ায় গড়া অন্ধ মন্দির, স্বর্গনিন্দিত তিরুমালাই
নগ্নরসনা কিছু মানুষ সারাদিন এখানে জমা করে সোনার তাল
পাষাণ দেবতা যেন রূপক হয়ে ওঠে ঔদরিক এই পূজারীদের

।। ৩১।।

থেমো না এখানে মেঘ, উজানে চলো আরও, অতিক্রম করো পেনার নদ
খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখো কীভাবে ভূমিহীন কৃষক রাখে তার সমর্পণ
এখনো ঐশী পায়ে, জাগাও তুমি তাকে, তুলতে বলো পেশিবহুল হাত
যুদ্ধ ব্যতীত কোনো পন্থা বেঁচে নেই এটাই হোক শেষ লব্ধ জ্ঞান

।। ৩২।।

এই সে অন্ধ্র দেশ যেখানে কোনোদিন মানুষ ছিল না, ছিল রাজা-নবাব
তাদের অধীন ছিল অযুত কুঁড়েঘর, চাষির বউ আর ধর্ষকাম
বিদেশি দেবতা ছিল এদের উপরিভাগে, চিরস্থায়ী এক ভীরু রায়ত
কখনো পারেনি ধান তুলতে গোলাঘরে যেহেতু ছিল না তার সংগঠন

।। ৩৩ ।।

সেবারও ফসলক্ষেতে রাজার পাইক এসে ছিটিয়েছিল তার নিষ্ঠীবন
সহসা মানুষগুলো প্রবল একটানে খসিয়ে ফেলেছিল সব শিকল
কাদার মধ্য থেকে অনেক রোগা হাত শূন্যে খুঁজেছিল আলম্বন
এভাবেই ইতিহাস পাথরে লিখেছিল—তেলেঙ্গনা, সন ছেচল্লিশ

।। ৩৪ ।।

দিকের স্থিরতাহীন এমন লাভাস্রোত চালাবে ঠিক ছিল লালনিশান
অথচ ভ্রান্তি তাকে জড়িয়ে ধরেছিল যেমন মহামারী করে উজাড়
গাঁয়ের রাখালদের, সেভাবে একে একে হারাল তার ধ্বজা এবং রথ
এখনো পল্লীগানে শুনতে পাবে তুমি গহন সেইসব উচ্চারণ

।। ৩৫ ।।

কথায়-কথায় দেখো সন্ধে নেমে এল, সামনে ঐ জেগে উঠছে এক
আলোর চাঁদোয়া ঘেরা বসতিবিস্তৃত, অর্থনৈতিক শিরাবহুল
অনন্তনাগশায়ী বিষ্ণু যেই স্থানে উন্দবল্লীর পাশে থাকেন
বিজয়ওয়াড়া সেই শহর যাতে তুমি কাটাবে আজ রাত সুনিদ্রায়

।। ৩৬ ।।

অথবা না যদি ঘুম স্পর্শ করে তবে লেহন কোরো এই বাতাবরণ
ক্রমেই অরব হয় দারুণ গুঞ্জন, ঐ যে বুজে এল সবার চোখ
এবার শহর জুড়ে ধোঁয়ার হাতছানি, ক্রমশ তাও লীন, সারা আকাশ
নিথর অন্ধকারে আঙুল ডুবিয়েছে, কৃষ্ণা শোনা যায় প্রবহমান

।। ৩৭ ।।

আবার সকাল হলে এগিয়ে যাবে তুমি পিছনে ফেলে যাবে কোলেরু হ্রদ
রেলের লাইন ধরে এগোনো যাক চলো, শরণ নেওয়া যাক সভ্যতার
বিশাখাপত্তনম ছাড়িয়ে আরও দূরে, পেরিয়ে অন্ধ্রের সীমানা শেষ
এগোও ঊর্ধ্বশ্বাসে সময় বেশি নেই, আকাল ছড়িয়েছে আবেষ্টন

।। ৩৮ ।।

দৃষ্টি না দিয়ে যদি চলতে থাকো পথ, তাহলে একদিন বাক্যহীন
দেখব গালিচা নীল দিয়েছে পেতে কেউ, অথচ স্থির নয়, সচঞ্চল
ঢেউয়ের ওঠানামা, এসব দেখে জানি তোমার থামা হবে আকস্মিক
তাকিয়ে দেখবে সব বদলে গেছে কবে, নতুন এক স্বরে অনুরণন

।। ৩৯ ।।

অথবা উড়ছে যেন জীর্ণ নীল শাড়ি বিহানে হেঁটে চলা ভিল বধূর
মাথায় ফসল যেন—এমনই রোদ্দুর ছেয়েছে আয়তন, আর ঘামের

লবণগন্ধ সারা আকাশে ছড়িয়েছে, প্রতীকবল্লভা হেমন্তের
অতলে উপচে ওঠা কিছুটা কালো আভা—দেখা কি গেল তার পাতা পায়ের
।। ৪০।।
কী ভাল লাগল এই ক্ষুব্ধ চিল্কাকে কেমন করে বলি তোমাকে আজ
সহসা ধমনি জুড়ে ভাসল মধুকর, মেলে না বাঁও আর এত গভীর
আমার রক্তস্রোত উজানে নিয়ে গেল জীবনজোড়া ভেলা, পাশে নিথর
ঠাণ্ডা-ফ্যাকাশে মুখ, আমি তা ছুঁয়ে থাকি, চোখের ঘামে ভেজে লখীন্দর
।। ৪১।।
আবার সমুখপানে, আবার পরিচয়, নতুন এক দেশ বিকাশমান
সাগর ধুয়েছে যার পায়ের ক্ষতমুখ, হায় গো সখা, আমি চারণ তার
উত্তরে মালভূমি, মধ্যে সমমাটি, সুঠাম, স্বাস্থ্যের এই প্রদেশ
কলিঙ্গ নাম তার পুরোনো যুগে ছিল বিজিত রক্ষিতা বহু রাজার
।। ৪২।।
তথাপি তোমাকে এই দেশের পায়ে মাথা ছুঁইয়ে যেতে হবে, দূর্বাদল
গ্রহণ করতে হবে শীর্ণ হাত থেকে, না-হলে শেষ নয় মাঙ্গলিক
দেখাই তোমাকে তাই এ দেবীমূর্তিকে, কোথায় তার কত ভূসম্পদ
বিজয়ারাত্রি এলে যাত্রা কোরো তবে আবার অভিমুখে নগ্নপদ
।। ৪৩।।
সমুদ্রতীর ঘেঁষে একটু আগে গেলে দেখবে সূর্যের পুরাণরথ
শিলায় নিহিত আছে এখানে ভালবাসা, শব্দহীন এক সমুত্থান
বালির কণিকা ঝরা সময়চক্রের পাথরীভূত গতি তোমাকে দিক
স্মৃতি ও চেতনার প্রবল অভিঘাত, অক্ষিতারকায় বিস্ফোরণ
।। ৪৪।।
সেহেতু স্তব্ধ হও, শব্দ কোনওদিন পারে না দিতে এত ব্যাপ্ত জল
ছেনির শিল্প শুধু দুহাতে মর্মর গ্রহণ করে চলে, জলদ মেঘ
সীমিত জীবনে আমি কীভাবে বুকে নেব এতটা বিস্ময়—অসংকোচ
অসহ মূঢ়তা নিয়ে শুধুই বসে থাকি বালিতে হাঁটু মুড়ে, দগ্ধ চোখ
।। ৪৫।।
বিকেল সান্দ্র হলে নিষেকমূর্তিরা স্বতই খুঁজে পায় বিরল কোণ
পুবের সাগর থেকে বাতাস ছুটে আসে, অস্তে ছুটে যায় সৌরযান
আমার তালুতে শুধু প্রাচীন কম্পাস—আবেগহীন দিকনির্দেশক
কী করে ভুলব আমি পাঁজরে অস্থিতে তৃষ্ণা জমে আছে কতশতক

।। ৪৬।।
তাহলে এগোতে হয় আবার উত্তরে, এবার চাহনিকে ছড়িয়ে দাও
স্নানের ইচ্ছা হলে কাছেই মহানদী, ডুবিয়ে দেহ কোরো অবগাহন
সাগরসমীপ এই ঋদ্ধ দেশে বহু খনিজ সম্পদ, তোমাকে তার
একটি তালিকা দিই—তামা ও ক্রোমাইট, লৌহ, চুন আর ম্যাঙ্গানিজ
।। ৪৭।।
উত্তরে যেতে যেতে ছাড়বে বনভূমি, এখন যার নাম সিমলিপাল
ছাড়াবে কেওনঝড়, যেখানে পিঁপড়েরা মাটির তলা থেকে অবিশ্রাম
লোহার আকর তোলে, বদলে বুক থেকে নিয়ত ঝরে যায় আয়ুষ্কাল
ছাড়িয়ে বধ্যভূমি, ছাড়িয়ে উৎকল, সামনে দেখা যায় নতুন পথ
।। ৪৮।।
যাত্রা অধুনা প্রায় ফুরিয়ে এল আর মাত্র এক দেশ, তারপরেই
আমার জন্মভূমি, যেখানে ভালবাসা, যেখানে শতশত রক্তহীন
মাছের আঁশের মত চোখেরা জেগে আছে তোমার প্রত্যাশে অহর্নিশ
জাগছে মরচে পড়া কৃষির হাতিয়ার, জাগছে বাদাবনে খোঁড়া ডাহুক
।। ৪৯।।
আছে না কি ভালবাসা, বন্ধু জলধর, মেঘলা দিন হলে দেখা কি যায়
ভোরের সরল আলো, সেভাবে সামাজিক ত্রাসের মধ্যে প্রেম বাঁচে কেমন
নগর পুড়িলে তুমি এড়াও কোন ভাবে, দাঁতের কনভয় ঘেরে শকট
পালাবার পথ নেই, দুপাশে লাঞ্ছনা, পিছনে শান্তির ধ্বংসস্তূপ
।। ৫০।।
তবুও হয়ত আছে কোথাও গাছ হয়ে দুই পা পুঁতে, পিঠে তূণীর-বাণ
কোথাও মাটিতে ম্লান ঘাসের কার্পেটে শিয়রে আলো রেখে রূপকথার
মতন শায়িত আছে, তোমাকে যেতে হবে ত্বরিতে সেখানেই যাতে জীবন
মাথুর রচনা ছেড়ে উষ্ণ অন্নের স্পর্শ পেতে পারে অনেকদিন
।। ৫১।।
আমার পাঁজরে যত বাষ্প জমে আছে বাইশ বছরের বর্ষাকাল
দেয় নি বন্যা তত মাটিকে কোনোদিন, তাদেরও আছে বুঝি জন্ম-ক্ষয়
কেবল বিরামহীন এ বুকে জমে ওঠা শোচনাতীত এক বরফস্তর
এভাবে রক্তে হিম মৃত্যু ঢেলে দেয়, ঘনিয়ে ওঠে শ্বেত বিস্মরণ
।। ৫২।।
সেসব ওড়াব হায়, শরীরে একদিন জড়িয়ে নেব কাঁথা, বুজব চোখ
ঝরবে কুয়াশা যেন পাতার কান্নায় যেমন ঝরে পড়ে আঠা-শিরীষ

আকাশ বাজাবে তার অপেরাগান আর ধারণ নেবে মাটি, ভুবনময়
লক্ষ আঁতুড়ঘরে বাজবে শাঁখ, ওগো, ছড়াবে জীবনের প্রগাঢ় শ্লোক

।। ৫৩।।

অথবা জীবিত থেকে সহসা কোনোদিন হারাব সব সুতো, দীর্ঘযাম
কখনো হবে না শেষ, শুধুই চোখ মেলে খুঁড়ব চেতনার অতীতকাল
কোথায় বিলীন হবে ক্ষুধা ও তৃষ্ণার তীব্রতম ডাক, বাকি জীবন
কেবল ধমনি জুড়ে অজানা সংলাপ বহতা হবে জানি সুনিশ্চিত

।। ৫৪।।

সরব আমার এই আবেগপ্রবণতা, তোমার দুই ডানা এখন বেগ
শোষণ করছে, এক তুমুল মত্ততা ঠিকানা লিখে দেহে পালঘাটের
ছুটছে উত্তরের পাহাড় ছোঁবে বলে, নিয়মে বাঁধা তুমি শাসনে তার
অধুনা তোমাকে তাই দেখাই এই দেশ লুটিয়ে আছে ঠিক নীচে তোমার

।। ৫৫।।

বিদেহ, অঙ্গ আর মগধ, বৈশালী—এখন একদেহ, বিহার নাম
রুক্ষ ব্রণল মুখ, টোটেমআন্ধারে শিখর হয়ে জাগা কালো শরীর
ধনুকবর্শা হাতে শিকারী সাঁওতাল যেমন দিনশেষে দেখে ধূসর
খিদের হিংস্র রূপ, তেমনই এই ভূমি আতুর হয়ে আছে জন্তুবৎ

।। ৫৬।।

এখানেই জামশেদ টাটার রাজধানী, খচিত অ্যাসফল্ট মহানগর
লোহা ও ইস্পাতের বিপুল কারখানা, অযুত মজদুর, দেশবিদেশ
পণ্য ছড়ানো আছে এবং মুনাফাও, তাকাও বিপরীতে একটিবার
ওদিকে নেতারহাট কিংবা পত্রাতু ঝিমিয়ে যায় যুগযুগ খিদেয়

।। ৫৭।।

সুবর্ণরেখা নদী পেরিয়ে বামে যাবে, যদিও পূবে গেলে ঋত্বিকের
একটি সিনেমাপটে পৌঁছে যেতে পারো, বিভূতিভূষণের ঘাটশিলায়
তবুও ওদিকে নয়, এপাশে রাঁচি জেলা তোমার তৃষ্ণার অধীরতৈটি
প্রথমে পানীয় দাও সে শালবনানীকে, হাজারিবাগ যেও অনন্তর

।। ৫৮।।

যোজন যোজন শুধু মহুয়া, শাল আর টাঁড়ের অঙ্কণ, এখানে এক
শীতের সকালবেলা পরশশিলা আমি কুড়িয়ে পেয়ে হাতে, দিয়েছি ফের
চট্টি-র জলে ছুঁড়ে, হায় গো তারপর বিলাপে ছিঁড়ে গেছে ঊর্ণাজাল
ম্যাক্লুস্কিতে আমি তেলেনাপোতা ছুঁয়ে ছিলাম বন্ধু হে দিনকয়েক

।। ৫৯ ।।

এসব আসল নয়, দেখবে তুমি শুধু ডাইনি খিদে তার তাবৎ বাণ
প্রয়োগ করছে সব শীর্ণ অবয়বে, মহুয়াময় দিন, খাদ্য তাই
যদি বা পরব থাকে তাহলে একদিন ভাতের ভোজ হলে কী উল্লাস
স্টেশন দুয়েক পরে জিভের ঝরোকায় ছিনিয়ে নেয় লহু টোরির হাট

।। ৬০ ।।

পাঁজরপ্রকট এই বাজারে বহুদিন কণ্ঠে ঢেলে দিয়ে তালের মদ
দেখেছি পুরুষ আর রমণী ক্ষুধিতরা ঘুরছে চারদিক, এখানে দাও
তোমার মন্ত্রজল, স্নানের পরে যাতে টাঙ্গি নিতে পারে হাতে অমোঘ
তাদের চালনা করো মুখিয়া অভিযানে, যেখানে জমা আছে ভোমরাপ্রাণ

।। ৬১ ।।

দুইবেলা খাদ্যের অন্বেষণে এত শরীরপাত তুমি হাজারিবাগ
গেলেও দেখতে পাবে, নিবিড় বনময় মানুষ-শ্বাপদের কলোসিয়াম
বৃষ্টি ঝরিয়ে তাই পেরোবে এই ভূমি যেখানে এক ছবি, এক প্রলেপ
প্রদোষে পৌঁছে যাবে বৌদ্ধ পুরাণের তীর্থভূমিতীরে বিনা আয়াস

।। ৬২ ।।

বোধির বৃক্ষ দেখো, হেথায় কোনও এক ঐশীউদাসীন দর্শনের
ধন্য সূচনা ছিল, এখন ভক্তের অশ্রুলালাজলে সিক্তপথ
একটু দাঁড়িয়ে তুমি আবার পথ চলো, তাকিয়ে দেখো সাঁঝ ঘনায় খুব
অল্প আলোয় ভরা সবুজ মাঠ যেন মেডিয়াভেল ছবি ইওরোপের

।। ৬৩ ।।

চাইলে জাগতে পারো, আমিও একরাত এখানে কাটিয়েছি নিদ্রাহীন
বুকের মধ্যে কোন পিছল নালীপথে চুঁইয়ে ঝরে গেছে স্নায়ুবিকার
চোখের পর্দা জুড়ে বেগুনি উচ্ছ্বাস, শ্বাসে ও নিশ্বাসে ক্লান্ত স্বর
ঘুমের প্রশ্ন আর ছিল না বটে তবে ঘুমেরই মত ছিল সে জাগরণ

।। ৬৪ ।।

প্রভাতফেরির সাথে যাবে সে বিদ্যার ফসিল আয়তনে, বরগাঁওর
নিকটে শায়িত আছে সে কত যুগ থেকে—খ্রিষ্টপূর্বের পাঁচশতক
শকারাদিত্য এর ভিত্তি গড়েছেন, পরে তা মহীরুহ গুপ্তদের
আমলে হয়েছে বলে জানিয়ে দিচ্ছেন শোধিত ভ্রামণিক হিউয়েন-স্যাঙ

।। ৬৫ ।।

পূর্ব তোরণ দিয়ে ভিতরে ঢুকে তুমি ভাসবে উত্তরে, সেইদিকেই
দেখবে ছাত্রাবাস নিঝুম হয়ে আছে, ছেলেরা যেন গেছে পাঠভবন.
বিজন কুলুঙ্গিতে নিহিত শূন্যতা তোমার স্মৃতিময় ছড়াবে শোক
দুচোখ বন্ধ কোরো, দেখবে শরণের স্তোত্রে জেগে ওঠে ধীরসকাল

।। ৬৬।।

সেনানী বক্তিয়ার ক্ষিপ্র কৌশলে জ্বালিয়েছেন এক লোল আগুন
অন্ধ সৈন্যদল দিয়েছে ছুঁড়ে তাতে গ্রন্থচয় আর মূল্যবোধ
এ ছবি দেখতে পাবে চেতনা সংহত করতে পারো যদি, না-হলে আর
একটু এগিয়ে যেও, মধ্যে পাঠাগার, দেয়ালে আজও যার দহনদাগ

।। ৬৭।।

এবারে দেখাব সেই অন্তদক্ষিণে প্রধান মন্দির, দুপাশে যার
সাতটি প্রাচীন স্তূপ, দেখো হে পঞ্চম, সিঁড়ির দুইপাশে অমিতাভর
ক্ষুদ্র মূর্তি গাঁথা, কিংবা চারকোণে স্থাপনশৈলীর নিদর্শন
চারটি স্তম্ভ আছে, এসব দেখে নিও, দেখে যা প্রত্যেক পর্যটক

।। ৬৮।।

নালন্দা দেখা হলে একটু পুবে বেঁকে গঙ্গাতীরে যেও লঘুচরণ
মুঙ্গের জেলা পাবে যেখানে ভাঙা এক দুর্গ পড়ে আছে বহু বছর
এখানে মীরকাশিম ছিলেন কিছুদিন অস্তকালে তাঁর রাজত্বের
গঙ্গা নদীও আছে, তলায় কঙ্কাল প্রথম ভারতীয় বুর্জোয়ার

।। ৬৯।।

নদীর সড়ক ধরে এবার এঁকেবেঁকে চলবে পুবদিকে, ভাগলপুর
পেরিয়ে এগিয়ে যাবে, ঘোলাটে জলরাশি সঙ্গে নিয়ে যাবে ইলিশঝাঁক
মহাদেবপুর ছেড়ে অনেক দূরে-দূরে তোমাকে যেতে হবে, দশটি দিক
তোমার প্রগতি দেখে থামাক গুঞ্জন, রঁদেভ্যু ভেঙে যাক জেলেডিঙির

।। ৭০।।

এগোও এগোও মেঘ, যেভাবে দ্রুত যান পিছনে ফেলে যায় নিয়নপোস্ট
যেভাবে কীর্তিনাশা হাঙর বন্যায় ক্রমশ খেয়ে ফেলে জমি ও আল
যেভাবে ব্যাপ্ত হও, আকাশ ঢেকে ফেলো, সামনে ঐ জাগে মাটি আমার
নিজেকে ছড়িয়ে দিয়ে এবার অবশেষে একটু ছায়া দাও, উৎসারণ

।। **ইতি পূর্বমেঘ**।।

।। উত্তরমেঘ।।

।। ৭১।।

আবার আসিব ফিরে ধানসিড়িটির তীরে কুয়াশা আবরিত এ বাংলায়
হয়ত একাকী নয়, হয়ত আস্তিনে জড়ানো থেকে যাবে চাবুকদাগ
হয়ত শহর-গ্রাম প্লাবিত কল্লোলে জাগবে উতরোল এই স্বদেশ
ফিরব আমিও ঠিক সুকেশি সন্ধ্যায় অথবা ভোররাতে পুনর্বার

।। ৭২।।

তখন খরার দিন নিমেষে দূর হবে, মোহানাদেশ থেকে যত পাহাড়
ভিজবে অঝোর জলে, মাঠে ও রাস্তায় লক্ষ বালকের মহোল্লাস
একটু-একটু করে ডুববে খেত আর বাড়বে পাটগাছ, মফস্বল
শহরে খিড়কিদোরে অবাক মুখ তুলে চাইবে কিশোরীর নিরবকাশ

।। ৭৩।।

বেজেছে বড়ায়ি সেই মূর্ত ট্র্যাম্পেট বিকেলে মাঠভরা ব্রতচারীর
আমার বদলে তুমি সেখানে যোগ দিও, মোচন করে যেও পেশির ক্লেদ
মেয়েরা ধুইয়ে দিক ধূসর ডানা আর ছেলেরা জেনে নিক কুশল সব
অতিথি এখানে আজও গ্রহণে-সম্মানে লাজুক বোধ করে স্বভাবতই

।। ৭৪।।

অধীর তুমিও জানি, ভণিতা ছেড়ে তাই চিনিয়ে দিই পথ বাষ্পদূত
ভারতবর্ষ নামে এ উপমহাদেশে যেখানে আবহাওয়া সর্বাধিক
নাতিশীতোষ্ণ আর যেখানে বহু লোকে ব্যালটে হয়ে আছে আস্থাহীন
সেখানে এবার তুমি বার্তা নিয়ে এলে, স্বাগত কামচারী বারংবার

।। ৭৫।।

নদীপথ ধরে ঢোকো, ষোড়শ অঙ্গের দারুণ সমাহার আমার দেশ
তোমাকে চেনার সব, যেভাবে চিনে নেয় মডেলভঙ্গিমা চিত্রকর
অথবা লাশের ঘরে যেমন ছাত্রেরা নিপুণ বিভাজন করে দেহের
সেভাবে স্থাপন করো নিজের মনোযোগ, শ্যামলবর্ণের অলকা এই

।। ৭৬।।

কেমন অলকা, বলি, শ্রবণ করো মেঘ, গ্রীষ্মে গলে পিচ শহরে আর
প্রায়শ নিঝুম গ্রাম খরার মোষ হয়ে প্রদর্শনী করে চক্রবাল
বর্ষা এখানে আনে প্লাবন, তার কাছে নাগর-গ্রাম্যতা অল্প ভেদ
শরতে পূজিত হন অন্নদায়ী দেবী, উঠোন ছেয়ে থাকে শিউলিফুল

।। ৭৭।।

হেমন্ত তারপর, ধানের মূল ঘিরে সন্ধ্যা জমা হয়, পাখির ঝাঁক
বাড়িতে ফিরতে থাকে বিধুর পথ ঘুরে, ডানার সংগীত রশ্মিহীন
আকাশ-মাটির রূপ অন্ধ ছাইরং ক্রোশের পর ক্রোশ টেলিগ্রাফ
তারের উপর দিয়ে কুয়াশা ছুটে যায়, শিশিরে কেঁপে ওঠে প্রবীণ ঘাস

।। ৭৮।।

শীতের কয়টি দিনে বন্ধ্যা কার্নিভাল ছড়ায় প্যারাফিন, বইবাজার
পিঠের পাঁচালিগান ছন্ন গেঁয়োদের সহসা বিব্রত করে আবার
বসন্ত থাকে বাকি, দেখিনি তার কোনও নিদর্শন, শুধু আমফুলের
পতন বিছানো মাটি অকালবৈশাখে—পৃথিবী শেষ করে আবর্তন

।। ৭৯।।

দাসের বাজার ছিল এখানে রমরমা—একথা লিখছেন লিনসকোটিন
গন্ধতরলে দিত ভেজাল ব্যবসায়ী, পণ্য চাল যেত দূর বিদেশ
নাসিকা ছেদন হত ছিনাল মেয়েদের—ইবন বতুতাও বলেন তাই
পার্শি বণিকদল আড়ালে কইতেন—ঋদ্ধতম এই নরক এক

।। ৮০।।

তবুও এখানে ছিল জীবনযাপনের শুভঙ্করী সব উপকরণ
কাপড়বয়নে যত মোহন সূক্ষ্মতা তাদের এখানেই আবিষ্কার
উইলো-ডালের মত তন্বী বেত দিয়ে রচনা করা হত নানা আধার
শীতল-প্রবহমান কবিতামঙ্গলে শুচীর স্বাদ পেত শান্তিহীন

।। ৮১।।

কর্কটক্রান্তিতে দীর্ণ এদেশের মাংস খেয়ে গেছে কত আকাল
ধবল-কৃষ্ণ-পীত শকুনচঞ্চুরা ঠুকরে দিয়ে গেছে জিভ ও ঠোঁট
ক্ষরিত অম্লরসে দুষ্ট ক্ষত পেটে লবণসন্ধানী এই প্রদেশ
বণিকশাসনে জরাসন্ধ হল তবু এখনো দেখো তার সঞ্চালন

।। ৮২।।

এখন বাংলাদেশ আহত শুয়োরের ঘাতক-চিৎকার, যে কোনও দিন
গলবে আগুনমুখ, তরল বিদ্বেষ শ্মশান করে দেবে বহুজাতিক
এতটা অমোঘ এই হননযৌনতা এবং বহুশ্রুত যাতে লেখায়
প্রসঙ্গ উঠে এলে প্রবীণ পাঠকের ক্লান্ত জৃম্ভন সারাৎসার

।। ৮৩।।

সেহেতু ওকথা আর শুনিয়ে লাভ নেই, আবার আমি হই সৎ গাইড
নদীর সরণি এক বাধায় ঠেকে গেছে, এখানে জলে পারিবারিক ভাগ
অবাক হোয়ো না ওগো, বড়ই স্বাভাবিক, যৌথ পরিবার ভাঙলে পর
দুভাগে ভাজ্য হয় পিতার সংকারও, কেবল এখানে ত সরল জল

।। ৮৪ ।।

বরং কৌতূহলে তাকালে ডানদিকে দেখবে গঞ্জের পোয়াতি বউ
আলের উপর দিয়ে হাঁটছে সাবধানে, পরণে ফ্রেশ-টিন্ট সিন্থেটিক
চোখের তারায় তার হলুদ ছোপ, ক্ষীণ বুকের থেকে সব ক্যালসিয়ম
নিয়েছে রেশম চাষ শোষণ করে তাই ভ্রূণের গোপনীয় আর্তনাদ

।। ৮৫ ।।

উত্তরে আছে আরও চারটি মুখ, দেখো, প্রথমে ভাগচাষী, স্বাস্থ্য তার
শীর্ণ ও সমতল, পাট ও তামাকের বধির কর্ষণে শিরাবহুল
হাঁটুতে লেগেছে মাটি, কনুই ফাটাফুটো, এখন উবু হয়ে শূন্যমন
আত্রাই তীরে বসে, কীভাবে বলো তুমি সারাবে জমিময় এই রিকেট

।। ৮৬ ।।

আপন মনেই তাকে থাকতে দাও, আরও পূর্বে নেগ্রিটো সীমন্তিন
তোমার পতনহেতু শরীর মেলে আছে, কটির নীচে শাল-জারুল বন
নিজেকে হারিও মেঘ, ছুঁয়ো সে রোমরাজি, গর্ভবতী পলি ছড়িয়ে দিক
তিস্তা-তোর্সা নদী, বাতাস-আলো মেখে জন্ম নিক ধান, সুসন্তান

।। ৮৭ ।।

সামান্য দক্ষিণে পিছিয়ে আসো যদি জামালদহ হাটে বৃদ্ধ এক
তোমায় অয়নে কাঁপা সেলাম ছুঁড়ে দেবে, লক্ষ্য কোরো তাকে, অনেকদিন
রাজার অধীনে ছিল ভীষণ তৃষ্ণায়, এখন পান করে ভোটাধিকার
তুমি কি শুধোবে তাকে, কেমন আছে তার জোয়ান সন্তান এবং খেত

।। ৮৮ ।।

বায়ুকোণ অভিমুখে সটান উঠে গেলে দেখতে মন্থর পাহাড়ি পথ
ত্রিপল জড়িয়ে দেখো সেখানে শুয়ে আছে তাড়সে রক্তিম একটি লোক
ফ্ল্যানেলের ছেঁড়া জামা ছিঁড়ছে শীত আরও, আঙুল ঘিরে আছে ফ্রস্ট-বাইট
আগামী সকালে তবু শরীর ছেনে তাকে সাজিয়ে দিতে হবে বহু পাথর

।। ৮৯ ।।

এখন নদীর পথে তাকাও ডান দিকে, মিছিল দেখা যাবে কয়জনের
যতই এগোবে তুমি দুপাশ থেকে তারা বাজাবে ফুসফুস, এরা সবাই
ফোটন কণিকা আর তরঙ্গিত গতি, ইলেকট্রন এরা, সফল তাপ
শোষণ করছে বলে কক্ষ থেকে আরও ব্যাপ্ত কক্ষে তার বিবর্ধন

।। ৯০ ।।

প্রথমে রয়েছে এক বাসন কারিগর, ক্ষৌরিহীন মুখ, ধুসর প্যান্ট
কান্দি শহরে তার প্রাসাদ আছে, তাতে ঢোকে না বেশি জল অথবা রোদ
তাকাও স্নিগ্ধ চোখে, এমন সম্রাট কাজের সন্ধানে ভ্রাম্যমাণ
মাথার উপরে যদি ক্ষণিক ছায়া দাও, চোখের পাতা তার জুড়োন পায়

।। ৯১।।
সারিতে দ্বিতীয় হল বেতের ঝুড়ি কাঁধে বিগতযৌবনা এক মেঝেন
গোয়ালপাড়ার দিকে ক্রমশ চলে গেল, সন্ধ্যা ঢেকে দিল তার শরীর
অবসাদমাখা সেই নগ্ন পদপাত, হাতের ক্ষতমুখে কাদা জমাট
কীভাবে ঢাকবে তার লজ্জা বীরভূম, তুমিই দাও তাকে কিছু আড়াল
।। ৯২।।
এখানে হয়েছি দ্বিজ, নিজের শৈশব গোপনে লুকিয়েছি ভরে কোটর
পিচের রাস্তা জুড়ে ছড়িয়ে দিয়ে গেছি মগ্ন কৈশোর, যেন আবার
জীবন ফুরিয়ে এলে ফিরতে পারি, হায়, ভাসিয়ে দিও না গো জলে বরং
মরিলে তুলিয়া রেখো শাখায় তমালের—এটুকু এপিটাফ, জললিখন
।। ৯৩।।
ফার্নেস থেকে তার মিলল ছুটি এই, মুছল তেলকালি তৃতীয় লোক
তোমাকে চিনিয়ে দিই, অনেকযুগ আগে এখানে তার কোনো আদিপুরুষ
ব্যস্ত ছিলেন শাদা ষাঁড়ের প্রজননে, মার্কোপোলো তাঁকে দেখেছিলেন
উত্তর পুরুষের শ্বসনে কার্বন, দুর্গাপুর তার বুখেনওয়াল্ড
।। ৯৪।।
পরের মানুষ—আহা হালুইকর—মেঘ, থামাও রসনার জলীয় স্বাদ
উনুনের আঁচে দেখো বেগনি-শাদা মেশা ঘামের আল্পনা বক্ষময়
কপালে চন্দনের বিলীন ফোঁটা, এই পরম-বৈষ্ণব ইতরজন
এবং ময়রা, তাই জোটে না মিষ্টিও, এভাবে বেঁচে যায় প্রবাদবাক্
।। ৯৫।।
বালক বয়সে সেই ছেলেটি দেখেছিল শ্রীরামপুরে তার বেঁচে থাকার
সমস্ত কানাগলি, তখনই একরাতে হঠাৎ হল তাই নিরুদ্দেশ
মোটর কারখানায় এখন মজদুর, সংগঠিত, আর চুলের রং
জলের ফেনার মত, তোমার সন্ধানে কাটিয়ে দিল সেও কতবছর
।। ৯৬।।
কংসাবতীর তীরে বাঁধের কাজ করে ষষ্ঠ লোকটির গামছা-গ্রাস
জুটে গিয়েছিল বটে কিন্তু তারপর সরল নিয়মেই অর্ধাশন
এখন পেয়েছে তবু চমৎকার পেশা, বাঁচছে এদেশের সুনাগরিক
সমাজপঞ্জিকার শব্দ অনুসারে হয়েছে লুম্পেন সাবলর্টান
।। ৯৭।।
দাঁড়াও এখানে, দেখ, ঝোপের আবডালে লুকিয়ে কম্পিতা অশীতিপর
বৃদ্ধা, সিঁথিতে তার গ্রামীণ আদিমতা, পাথর দেগে দেওয়া শিলমোহর
ডাইনি এভাবে নাকি শাস্তি পায় আজও, হায়রে দুর্ভাগা পঞ্চকোট
এমন তৃষ্ণা যাতে গরল খেতে হয়, শিরায় ছুটে চলে পাপ ও ক্লেদ

।। ৯৮।।
অষ্টম লোক বসে স্টেশনে চুপ করে, বাসস্থান তার খড়্গাপুর
অনার্য রং তবু চোয়ালে গ্রিক ধাঁচ, পেশিতে বহনের তীব্র ছাপ
গ্রামের জমিনটুকু ম্যাজিক হয়ে গেছে, দশক জুড়ে এই সম্মোহন
কী কথা শোনাবে একে সমুত্থান ছাড়া, ঝড়ের গান ছাড়া আমাথানখ
।। ৯৯।।
পাঁচপাড়া ঘাটে এক নৌকো বাঁধা, তাতে ঘোলাটে চোখে শুয়ে রহিম শেখ
জাতিতে নিকিরি, রাত যখন ঘন হয়, ক্ষিপ্র কব্জিতে গুছিয়ে নেয়
আঁশটে পেখম তার, হাওড়া পুল-তক ডিঙির বিচরণ, যখন ভোর
পাঙ্গাশ, বোয়াল মাছ, রিঠে ও চিংড়ির স্বল্প সঞ্চয়ে ভরবে খোল
।। ১০০।।
সুন্দরবন থেকে চোরাই কাঠ কেটে চালাত পরিবার শেষ মানুষ
এখন শয্যাগত, উরুতে লেগে আছে খিদের চুম্বন বড় মিএগার
ক্রমশ দৃষ্টি তাই হচ্ছে আয়ুহীন, হায় গো মেঘ, এই শেষ সময়
অগ্নিদ্রবণ শ্লোকে কিছুটা সাঁঝ দাও, দুফোঁটা জল দাও সঙ্গে তার
।। ১০১।।
দেখলে অনেক কিছু, এবার বলো মিতা, তোমার ত্রাণ ছাড়া এত জীবন
কীভাবে সজল ঘ্রাণ জড়াবে প্রশ্বাসে, কীভাবে এতগুলো খিন্ন মুখ
উৎক্রান্তির গানে দুহাত ভরে নেবে মেটাবলিক ক্রিয়া এবং প্রেম
কীভাবে পূর্ণ হবে আহার-তৃপ্তিতে তাদের কুঞ্চিত রুগ্ন কোষ
।। ১০২।।
সার্থবাহগণের এলেম বোঝা গেছে, আসলে মাঝিরাই চালায় দাঁড়
এবার তাদেরই হাতে জাহাজ তুলে দাও, কক্ষে ভরে দাও অক্সিজেন
তারাই কেন্দ্রে আছে পাহাড়-সাগরের মধ্যেকার এই সমভূমির
মাটির উপরে যত গঠনভঙ্গিমা—এরা তা ধরে রাখে, যা গ্র্যাভিটন
।। ১০৩।।
তোমার রোদনজলে সিক্ত হল পথ ক্রমশ কায়া হল দীনাতিদীন
যেটুকু সাধ্য আছে এখনো অবশেষ সেটুকু সাথে নিয়ে ওগো শ্রমণ
নিকট শহরে চলো বেশি ত বাকি নেই, নিগ্রহের এই উপাখ্যান
ফুরিয়ে এসেছে, শুধু আমার বাড়ি বাকি, তবেই শেষ হবে নৌবিহার
।। ১০৪।।
গঙ্গাবক্ষ ছেড়ে পা ফেলো দক্ষিণে, দুপুরে স্নাতকেরা করেছে ভিড়
মেটিয়াবুরুজ ঘাটে, তুমি তা ছেড়ে এসো, সামনে নগরের প্রবেশপথ
আবার একটি সেতু অতিক্রম করো, বাঁদিকে পড়ে থাক ট্রামের ঘর
দেখবে টলি-র নালা, এটাই এককালে শহরসীমানার ছিল সূচক

।। ১০৫।।

এবার তোমার পাশে হাবেলি আলিপুর, যেখানে ভারতের বড় শরিক
পাখির নীড়ের মত বসতি বেঁধেছেন, যেখান থেকে তার মাকড়জাল
ছড়ায় ভুবনময়, তোমার দুই চোখ প্রজ্বলিত হোক, রোষাত্মক
তড়িৎস্পর্শে এই দাহ্য প্রবণতা যে কোনো দিন যেন ভস্ম হয়

।। ১০৬।।

কুবের আলয় ছাড়ি আরোই উত্তরে আমার বাড়ি, তুমি যাবে তথায়
দেখতে দেখতে যাবে শহর কলকাতা, যেখানে অসহায় ডকমজুর
স্বাধীনতাহীনতায় ক্লান্তমুখ তবু যেখানে মানুষেরা আজও ভীষণ
জীবনতেষ্টা নিয়ে অঝোরে বেঁচে থাকে, সহ্য করে থাকে আক্রমণ

।। ১০৭।।

এখানে কিছুই নেই রক্ত ছাড়া আর, এখানে নেই কিছু শুধু মানুষ
শব্দে-আন্দোলনে গ্রহণ করে শ্বাস, আলোকসম্ভব, শুধু তুমিই
এদের চেনাতে পারো উৎপাদন আর নিবিড় বন্ধুতা প্রক্রিয়ার
সমস্ত প্রণোদনা সফল হয় যাতে এমন সংহিতা দেখিয়ে দাও

।। ১০৮।।

স্থাবর ভঙ্গি কেটে বেরিয়ে এসো, পিচ এলিয়ে শুয়ে যেন সরলরেখ
বীথিকাপ্রতিম এই গড়ন, চারপাশে হরিদ্রার আলো দীপ্যমান
বিকেল গড়িয়ে এল, পক্ষীশাবকেরা মুখর, এইবার ওগো পথিক
বাতাস সাঁতরে তুমি খিদিরপুর রোডে পৌঁছে ডানে দেখো সবুজ মাঠ

।। ১০৯।।

এ এক মজার দেশ, এখানে অশ্বের ধাবন সৌষ্ঠব বিক্রি হয়
দাঁড়িয়ে থেকো না তাই যখন মাঠ থেকে শুনবে উল্লাস জুয়াড়িদের
বরং একটু পরে একটি মোড় ঘুরে স্থৈর্য রেখো তুমি কয়েকপল
ব্রিগেড প্যারেড মাঠ তোমার পাশাপাশি, চেতনা ঢেকে দেয় স্মৃতিচারণ

।। ১১০।।

চাও যদি বিশ্রাম নাও গো এইখানে, সবুজ ঘাসে মাথা নামিয়ে দাও
চোখের পাতার পরে শ্লোগান ঝরে যাক, তীক্ষ্ণ মাস্তুল যেন নিশান
ছিঁড়ুক আকাশ আর স্বরের নির্মাণ অভ্রভেদী হোক, তুমিও ঠিক
বাক্য অন্বেষণে নিরত রাখো মেধা, আবার ভেসে যেও অতঃপর

।। ১১১।।

সে মাঠ পেরিয়ে এলে, সখা হে, নগরীর হৃদয়ে পৌঁছবে, এত নিখুঁত
বেবুশ্যেপনা তুমি দেখনি আর যত দালাল, পীর আর ফাটকাবাজ
আঁচল বিছিয়ে আছে, নিয়ত ভিক্ষুক মাটির থেকে তুলে খাচ্ছে ভা
প্রৌঢ়া ঘরণী যত কামুক চোখ তুলে চাটছে যুবকের লেহ্য মুখ

।। ১১২।।
তিক্ত সলিল দিয়ে এদের তর্পণ সমাধা করে চলো পর্বমুখ
ক্রমেই নিকষ ভিড় বদলে নেবে সাজ, ধাতব গর্জনে চারটি মোড়
পেরিয়ে ত্বরিতে তুমি বাঁদিকে ঘুরে যাও, একটু পরে পাবে চিকিৎসার
প্রাচীন তীর্থবাড়ি, পরিস্রুত জল এখানে দান কোরো অবশ্যই
।। ১১৩।।
এবার মৌনমুখে অনেক নীচে নামো, ঠাহর করে দেখো কলেজধাম
রেখো গো মধুকে মনে, এবং ডিরোজিওকেও, সঙ্গে তাঁর যত শিষ্যদের
এ বাড়ি কেন্দ্র করে হেলায় কেটে গেছে আমারও কয়শত সকাল সাঁঝ
এবং দ্রোহের এই প্রথম পাঠশালা, তৃতীয় জন্মের আঁতুড়ঘর
।। ১১৪।।
চিত্তরঞ্জনের স্মৃতির সরণিতে পৌঁছে যাবে ঘুরে বাঁদিকে মোড়
দু-ডানা ছড়িয়ে দিয়ে এগোও ডানদিকে একের পর এক পেরিয়ে যাও
রামমন্দির আর গিরিশচন্দ্রের নামাঙ্কিত পার্ক, বিডন স্ট্রীট
প্রাচীন পেশার পাড়া বাঁদিকে রেখে যেও অব্যাহতগতি অসিতচোখ
।। ১১৫।।
কয়টি পদক্ষেপে, খেচর হরকরা, এবারে পৌঁছবে যেখানে তিন
রাস্তা মিশেছে এসে, সেখানে প্রশ্বাস রুদ্ধ করে তুমি দাঁড়াও চুপ
দিওতিমা গনটার্ড এখানে ঘুম যায় কিংবা কালো মেয়ে জান দ্যুভাল
হোকনা যা খুশি, তাকে ঘৃণা ও ভালোবাসা জানিয়ে বহে যাও আরেকবার
।। ১১৬।।
রাত্রি ঘনিয়ে এল, ক্রমশ শহরের দোকানপাট থেকে ওষ্ঠরাগ
মুছিয়ে দিচ্ছে কেউ, নিসর্গের যত চিরন্তন ভাষা নৈশবাস
সরিয়ে দাঁড়াবে সেই নগ্ন অবয়বে, আকাশে তুমি যেন ডাইনোসর
জ্যান্ত সমুদ্দুরে চলেছ ভেসে-ভেসে, ক্লিষ্ট অনাহারে অনেকদিন
।। ১১৭।।
এবং কীভাবে দেহ হয়েছে দুর্বল, লীনায়মান মেঘ, জানে কি কেউ
রুক্ষ প্রতিটি মাঠে সেচনকার্যের ফুরোল প্রয়োজন কিছু মাইল
তবুও যাওয়া বাকি, ঘুমিয়ে পড়বার পূর্বে সেইটুকু চলো এখন
পাখায় ধারণ করো আমার ক্ষোভ আর খাদ্য আশি-কোটি মানবকের
।। ১১৮।।
এগোও এগোও মেঘ, যেভাবে শব্দের গতিতে ছুটে যায় এরোপ্লেন
যেভাবে চক্রবাক শ্রবণে রেখে যায় ধ্বনির কল্লোল, সেভাবে ওই
বিমানবন্দরের আকাশ ঢেকে ফেলে ক্রমশ বামদিকে যেখানে পথ
মিশেছে পুকুরজলে সেখানে ডানদিকে দ্বিতল কুটিরের ভিতরে যাও

।। ১১৯।।

শূন্য বিছানা আর মলিন বইতাক, চেয়ারে ময়লার আস্তরণ
সাকুল্যে এই কটি রিক্ত আসবাব, অপনোদনে ওগো লজ্জাশীল
খুঁজো না মানুষ তুমি, আমার কেউ নেই, কেবল পোকাদের মরা শরীর
সেখানে ছড়িয়ে আছে, প্রতিটি রাত্তিরে ক্লান্তি হানা দিত স্বপ্নময়

।। ১২০।।

ধূসর আমার সেই যাপনদিনগুলো ফিরে না আসে যেন, এত প্রকট
কখনো ছিল না আর তিক্ত বেঁচে থাকা, রাত্রিদিন অবসন্নতায়
বিষণ্ণতম আমি ছিলাম ভাঁড় এই ধূর্ত ছেঁড়াখোঁড়া সার্কাসের
সবাই ঘুমোলে পর কেবল জায়মান নির্জনতা দিত পরিত্রাণ

।। ১২১।।

এভাবে খেলাচ্ছলে সবার চাঁদমারি আমার এই দেহ ক্ষতের দেশ
পুঁজের বিন্দুগুলো গড়াতো চোখ বেয়ে, বাজত হাততালি অন্যদের
আহা কি উল্লসিত দেখাত মুখগুলো যখন দুই হাতে রক্তঘাম
উষ্ণ আঠার মত নিহিত বিস্ফারে ছিঁড়ত প্রচ্ছদ লাবণ্যের

।। ১২২।।

তাহলে কোথায় আমি বলেছি এতদিন বার্তা নিয়ে যেতে সুনিশ্চিত
প্রশ্ন করবে জানি, বাষ্প-অর্ণব, ভ্রান্ত নই তাই দেব জবাব
কিন্তু কিছুটা কাল কাটাও এই ঘরে, আমার স্মৃতি ভেবে দুফোঁটা জল
পড়ুক কপোল বেয়ে, ছেলের কুশল নিক স্নেহসজল সেই বাস্তুসাপ

।। ১২৩।।

ঘটুক নিস্ক্রমণ, যে পথ দিয়ে তুমি এসেছ সেই পথে ফেরো আবার
দুপাশে দেখবে মিতা, নিসাড় শুয়ে আছে কুক্কুরকুণ্ডলী বহু মানুষ
তাদের শিয়রে এসে আসনপিঁড়ি বোসো, প্রলম্বিত লয়ে গহন শ্বাস
পড়ছে, এরাই হল আমার স্তোত্রের প্রজ্ঞাপারমিতা, জনার্দন

।। ১২৪।।

ঘোচাও নির্দালি, দাহ, স্নেহের জলপটি বুলিয়ে দাও চোখে বিস্ফোরক
পৃথিবী লুকিয়ে রাখো লহুতে-তেষ্টায়, সূর্যসঙ্কাশ জবাকুসুম
ঝরুক এদের গায়ে, আকাশে ঐ চাঁদ হারাল সঞ্চিত আলোবলয়
পুবের শরীর যেন স্পষ্ট শিহরণ, কষ্টে চোখ মেলে দেখ কোরক

।। ১২৫।।

যখন অক্ষিপাতা জানবে সঞ্চার, তখন ধীরে ধীরে উচ্চারণ
কোরো গো আমার কথা, 'অনেকদূরে থাকি, বুভুক্ষার দিন, প্রেতশাসন
তবুও স্মরণে আছে, আসব একদিন ছিন্ন করে দিতে নিষ্প্রদীপ
এখন তোমরা যারা পঙ্গু সন্ন্যাসে আতঙ্কিত, থেকো অপেক্ষায়

।। ১২৬।।
নিজের মাংস জেনো ভক্ষণীয় নয়, আমার মত যারা রোগা তরুণ
যাদের চেহারা জুড়ে লেপটে আছে নীল সময়, তারা যেন পূর্বাপর
ভুলো না, শিক্ষা নিও প্রাচীনদের থেকে, স্বার্থপ্রবণতা অহংদোষ
এবং হতাশা এসে তাদের বেঁচে থাকা ছিনিয়ে নিয়ে গেছে বারংবার
।। ১২৭।।
আমরা এসব ছুঁড়ে ফেলব, কোনদিন বিজিত হল না জেনো, অন্ধকার
রগের দুপাশে চাপ বাঁধলে স্বাস্থ্যের তীব্র উল্লোলে ভাঙব তাও
আমাদের ব্রতকথা থাকবে সংযত, অনর্থক শ্রমে কালহরণ
জানব বর্জনীয়, আসল সময়েই ছিঁড়ব নাড়ি এই প্রসবিণীর"
।। ১২৮।।
একথা জানিয়ে মেঘ নিজের পানে চেও, অন্ত্যগান শুরু হোক এবার
ক্রমেই দৃষ্টি থেকে গ্রহণ মুছে গেল, শিথিল, মুছে গেল পাখাপালক
ক্লান্ত তোমাকে বায়ু প্রয়াণে নিয়ে যাবে, আদর ছুঁড়ে দেবে জীবজগৎ
আমার কৃতজ্ঞতা পাথেয় হোক এই নতুন যাত্রায়, যুধিষ্ঠির
।। ১২৯।।
পিঙ্গল বিহ্বল ব্যথিত নভতল, আর্ত হয়ে আছে মাটি ও ঘাস
বিষাদ প্রজাত মুখে বিদায়, এইভাবে তোমার অবসান সূচিত হোক
এখন শস্যখেত ভরেছে সুধারসে,' নীলাঞ্জন, আমি তোমাকে দিই
আগামী সন্ততির স্বাধীন মনসায় বর্ণশোণিমার জলস্রোত

।। ইতি উত্তরমেঘ।।

ভবিষ্যৎ

সূচি

"ব্যক্তিত্বের উপাদানের মধ্যে আভ্যন্তরীণ সম্পর্কের নিশ্চয়তা কী?—শুধুমাত্র দায়বদ্ধতা এর একক, যার জন্য আমি শিল্প সম্পর্কে অভিজ্ঞতা ও বোধ লাভ করেছি, তাই আমার নিজের জীবনেই এর প্রত্যুত্তর দেওয়া উচিত যাতে (জীবনের) সমস্ত অভিজ্ঞতা ও বোধ নিষ্ক্রিয়তায় না পর্যবসিত হয়। কিন্তু দায়বদ্ধতার সঙ্গে ভুলভ্রান্তিও সম্পৃক্ত। জীবন ও শিল্প শুধুমাত্র পারস্পরিক দায়িত্বই বহন করে না,—(পারস্পরিক) ভ্রান্তিও বহন করে।"

—শিল্পপ্রতিভা ও দায়বদ্ধতা, মিখাইল বাখতিন।

বিপ্লব

হাঁটা শুরু করবার আগে তারা দেখেছিল রাস্তার শেষে আলো আছে। তাদের পায়ের পাতা সঞ্চালিত হচ্ছিল দ্রুত। একদিন রেলিঙের সীমা থেকে সবাইকে লুফে নিল সত্তর ফুটের শূন্যতা। তারপর মাঠময় অন্ধ ও আতুরের ছড়ানো কফিন থেকে যেইকটি তর্জনী ফিরে পেল হৃৎস্পন্দন, তাদের অবাক করে মহাশূন্যে হেসে উঠল পূর্ণিমার চাঁদ।

বিচ্ছেদ

পয়লা ঘণ্টি বেজে উঠল। উৎকর্ণ হয়ে উঠল চতুর্থ দেয়াল। হৃদয় উপড়ে রাখো হাতের পাতায়। বন্ধ করো মুঠো। দ্বিতীয় ঘণ্টা বাজে—চাপ দাও, আরো আরো জোরে চাপ দাও। তৃতীয় ঘণ্টার শব্দে, এই দেখো, আঙুলের ফাঁক দিয়ে চুঁয়ে পড়ছে গরম কফির মতো আঠা-আঠা রক্তের স্রোত।

আন্দোলন

ঝরে যাচ্ছে ডানার পালক, এখানে বাতাস বড্ড ক্রূরমতি। আমাদেব মাংসের কথা ভেবে মাটিতে ক্যাম্প্ ফায়ার। নিরাপদ ঘর থেকে মুখ করে অন্য হাঁসেরা বলে, 'ভুল...ভুল...'' চকা হে, চকা নিকোবর, সামাল...সামাল...

গ্রীষ্মের লেখা

বসন্ত নিভে গেল। এইবার এসো—চামড়ার শিহরণ, চোখের জ্বলন, কবিদের জন্মদিনগুলি। পতাকার স্মৃতিমেদুরতা, তোমাকে ভুলিনি। অ্যাসফল্টে নেচে ওঠো শিখা। ভয়ঙ্কর পূজানৃত্যে আমাদের মুখ পুড়ে যাক।

মার

চোখের কোটর থেকে জ্বালো টর্চ। শুখা জলপাই রং প্রভা পাক। তবে এই পিচের শহরে মুখশ্রী মানাবে। একটু একটু করে তীব্র হাড়গুলি ঘন চেতনায় ঢেকে যায়। জাগো, জাগো হে শাস্তা, পায়সান্নে আজো পিছুটান।

তোমাদের হাত থেকে টাকা নিই, বোধ নিই, বিবেকখচিত এক পিকদানি নিই। গলা শিরদাঁড়া তাতে ধরে রাখি। আর শোনো, বিষণ্ণতা ছুঁয়ে থাকি রোজ। শুধু যে কদিন জ্বর হয়, মাধুকরী অসমাপ্ত থাকে, পেটের ভিতরে কেউ কথা বলে। প্রাথমিক কষ্টটুকু সহ্য হয়ে গেলে ভেদবুদ্ধি মাথা চাড়া দেয়। বোঝা যায়, আরো বহুদিন তোমাদের উপদংশে চুমু খেতে হবে।

লেনিন

প্রত্যুষের সাথে-সাথে তোমার চোখের থেকে আলো মুছে যায়। বেলা বাড়ে, আর, তুমি হয়ে ওঠ মিনারসদৃশ। হৃতপ্রাণ, চক্‌চকে, উঁচু। দ্বিপ্রহরে যে কুকুর তোমার পায়ের কাছে হিসি করে, তাকে তুমি খাবারের সন্ধান দিয়েছিলে। প্রিয় ল্যাম্পপোস্ট, এখন সবাই শুধু ভুলে যাবে একদিন তোমার আলোয় সারাপথ হেঁটে গেছে খঞ্জজনতা। মাঝরাতে তোমাকে জাপ্‌টে ধরে আকুল কেঁদেছে যত কবি ও নাবিক।

ওল্ড হোমের কবিতা

ভালোবাসার কথা বলছ? আমাদের কি সেসব শোনার আর বয়স আছে হে? এখন, এই দেখো, মাটি অন্ধকার হয়ে এল। সূর্যাস্ত দেখা সেরে এইবার সকলেই ঘরে যাব। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গুণে নেব কটা ভাঁজ জমা হল মুখে। তারপর, শুয়ে পড়ব, একা-একা।

তেইশতম জন্মদিন

তোর থেকে কিছু চাইনা। শুধু তুই আয়। আমি আরো একবার তোর মুখোমুখি বসি। এই ধুলো আমার দেশের। এই ঝরাপাতা, এই সন্ধ্যা, দিগন্ত অবধি এই শাঁখের আওয়াজ—এই সবই আমার জীবন। তুই আয়, আমি তোর হাতে তুলে দিই দারিদ্র্যরেখার এই দেশ।

ভূমিদাস

১

যখন বিকেল হয়, দূরের বহুতল থেকে থেকে ভেসে আসে অবসরের গান। আমরা বুঝি, এখন বিকেল হল। ভেজা শস্যের মতো নুয়ে পড়ে আমাদের নগ্ন পিঠ। আর, কে জানে কোথা থেকে বাতাসের বন্যা শুরু হয়। সেই ঝাপ্টার মুখোমুখি উড়ে যায় ঘাসপাতা। সহসা ঝড়ের সঙ্গে স্বাধীন ইচ্ছেরা সব মাথাচাড়া দেয়।

মন যদি ভালো থাকে প্রভুর মুখেও দেখি হাঁসি। তাঁর শাদা চুলগুলো চিক্চিক্ করে। আমাদের সাথে দুটো কথা কন। ঝক্‌ঝকে কাস্তেগুলো গলার নলির দিকে ছুটে যেতে চায়। আঃ, যদি সত্যিই কোনোদিন মেরে বসি!

৩

বাড়িতে ফেরার পথে কাউকেই চিনতে পারি না। মাথার মধ্যে শূন্যতা জমে উঠছে শুধু। শরীরের মধ্যে শুধু ভার—সে যে কী পাথরের মতো—মণ-মণ লোহালক্কড়ের মতো ভার! ইচ্ছে হয় রাস্তার পাশে শুয়ে পড়ি। মৃত্যু এসে চোখ ছুঁয়ে যায়।

এখানেও কেউ কেউ স্বপ্ন দেখে দুবেলা বিলাসের! সরু ফিন্‌ফিনে জিভে মালিকের ঘাম-বীর্য চেটে নেয় তারা। এইভাবে ক্রমে-ক্রমে তাদের পায়ে খুর নখ হয়ে ওঠে। সবুজ ক্লোরোফিল ফেলে লোহিতকণিকা খেয়ে থাকে।

৫

আমাদেরও বেঁচে থাকবার কথা ছিল। কোনোদিন আগে ছুটি পেলে বুকের দারুণ শব্দে কেঁপে ওঠে পৃথিবীর মাটি। আজানু ধুলোর মধ্যে হেঁটে যাই। পুকুরের কল্‌মি-লতাকে ডাকি, জলপোকা, পিঁপড়েশ্রমিকদের ডেকে বলি, "টাকার স্বপ্ন ছিঁড়ে ফেলো। ওহে ভাই, আমাদের মত রোগা মানুষেরা, লেদের প্রচণ্ড শব্দে টুকরো টুকরো করো রাত।"

৬

তর্পণ-সঙ্গম আর বাৎসল্যহীন বেঁচে থাকা। আমাদের পূর্বাপর নেই। যখন গভীর রাত গাঢ় ডানা দিয়ে ঢেকে রাখে গ্রাম ও শহর, আমাদের স্বপ্নের মধ্যে এসে পড়ে দূরতম নক্ষত্রের আলো। কয়েকটি মগ্ন মিনিটে স্বাধীনতা হাতছানি দেয়। জেগে উঠে দেখতে পাই স্বচ্ছতর হয়ে উঠেছে জল। সেই ফিকে অন্ধকারে হাঁটতে শুরু করি। দুই পাশ দিয়ে বাঁশঝাড়গুলো সরে যায়। মনে হয়, একদিন রুখে দাঁড়াতেই হবে।

নির্বাসিতের গান

ধূলিধূসরিত রাত ঢুকে পড়ছে আমাদের অন্দরমহলে।

এইবার ইতরদের উৎসব। মেছুনিরা দাঁড়িয়েছে নিজেদের আঁশকাঁটা ডালায় সাজিয়ে। অরাজনৈতিক মোল্লাদের ক্যারলসঙ্গীত শুরু হবে, ধুয়ো দেবে মাত্রাতীত বিপ্লবীমহল। সেই কোলাহলে গাছের পাতায় ভেঙে যাবে ফটিক-স্তব্ধতা, পাখিদের বাচ্চাগুলো আধোঘুমে কেঁদে উঠবে নিজেদের রক্তমাস দেখে!

আমরা—যারা নিজেদের মনে করি ক্ষারে ধোয়া টান্‌টান্ ইস্ত্রিশোভিত—তারা ক্ষুব্ধ হব। বৃষ্টি হবে নীতির পকেটে। কাপ্তেনি এখন তবু প্রিয়। কিছুদিন এই স্বাদে আমাদের জিহ্বা মজে আছে। ভ্রূকুঞ্চনে ঢেলে দেব বড়জোর মৃদু উপদেশ। তারপর. হায়-হায় কলির বলদ আমরাও চাটুকার সভাসদসম...

গুণ্ডাদের ভক্তিগান ছুটে যাচ্ছে মাঠঘাট বনস্থলিময়। এখানে পবিত্র কোন বোধ নেই, ঘৃণা নেই, নেই শাদা কাগজের পেটে অক্ষরসন্ততি। বাতাসের সাপধ্বনি শুধু, শপ্ত পিগ্‌মিদের মাংসউল্লাস।

আমাকে আবার তুমি ফিরে নিও। আমি এইখানে আলোবুননের কাজ করে যাব। ছুঁয়ে যাব ঘাস-লতা, জল দেব বালক চারাতে। ওগো পার্টি, পচা আগুনের দিকে কখনো যাব না। আমার জন্য রেখো পথের বিলীন বাঁকে শরণের অভিজ্ঞান কিছু।

যন্ত্রণালিপি : ৩

যে রোষ অস্থিহীন, নুলো ভিখিরির মতো অক্ষমতা ছাড়া আর কিছুই দেওয়ার নেই যার, তাকে তুমি শরীরে পুষো না। নিজস্ব সন্ত্রাসে যদি উদয়ন ঘটাতে পারতে, যদি আতঙ্কে ভেঙে যেত হর্‌রাতামাশা, তবু তাকে কর্ম বলা যেত। আর, আজ এই জুলাইসন্ধ্যায় তুমি জান কীভাবে নরম হাড় জড়ো করে প্রণামের ভঙ্গিতে নত হওয়া যায়। আর তুমি কিছুই জান না। সেহেতু বৈদিক ধাঁচে উদাসীনতার হয়ে সওয়াল সাজাও। সুখ-দুঃখ ঘৃণা করা ভালো, তবু নিজের রক্ত ছাড়া কোথাও কখনো কোনো দায় নেই—একথা ভেবো না। নিজের তন্তুর নীচে তৃণবর্ণ দেশ শুয়ে থাকে। লিভিংস্টোনের ছড়ি হাতে নিয়ে তাকে যারা খুঁজে নিতে পারে, তাদের শব্দে-শ্বাসে ঝরে পড়ে উদ্যমের শান্ত ঘেমো ফুল। সেই পুষ্পে আচার-অর্চনা।

উদ্ধার

ক্যাথরিন, আকাশে তখন ভোর, অস্ফুট স্তনরেখা—নীল;
মাঠময় বৃষ্টিপাত, অতিথীর মশারীর জাল আর ক্যাথরিন,
কোথায় কখন ঘুম, জাগরণ, স্বপ্নলাভাকীট—আমি তো জানি না

দেয়ালে নখের দাগ, তোমার গায়ের ছালে বৃষ্টির ফোঁটাগুলি নত, ধীর;
জলের যুবতীদল ছুঁয়ে যায় পাতাপথঘাট আর, হাসি, ক্যাথরিন,
এত গাঢ় কালো হাসি কীভাবে মহুয়াবন আমোদে ভেজাবে?

তোমার চুলের নাচ টাঁড়পাহাড়ের গায়ে সুফলা ইউরিয়া।
এবার তাহলে লোক খেতে পাবে?
কথা বলো, দুখানা কোরকঠোঁট, অনশ্বর, কাঁপা, ক্যাথরিন,
কোথায় কখন সুখ, উপশম, শান্তিশ্রাবণমাস—তুমি কি জানো না?

অ্যালবাম

তোমার দু-ঠোঁট ফেটে যাচ্ছিল শীতে
দূরে কারা যেন খেলছিল ভলিবল
হঠাৎ পিছনে, ভারি নির্জন স্বরে;
"অ্যাই, তুই ওকে বল্..."

কিছুই বলোনি। শুধু গাছ থেকে টুপ্
ঝরে পড়েছিল আমের গোপন ঋতু
তোমাকে আমূল নিঃশেষ হতে দেখে
হেসে ফেলেছিল মিতুন।

বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্য বিষয়ে

প্রতিটি কবিতার জন্ম, তুমি চাও বা না-চাও, হয় রাজনীতি থেকে।
প্রতিটি শিশুর জন্ম, সঙ্গমের ফলে শুধু নয়, নিবিড়-নিবিড়তম রাজনীতি থেকে।
রাজনীতি মানে আমি মানুষকে ঘৃণা করা, মানুষকে রুদ্ধশ্বাস ভালোবাসা বুঝি,
এবং, মানুষ চিনি নাম দিয়ে নয়, ক্ষমা কোরো, কাজ দিয়ে, পার্টি দিয়ে চিনি।

হে আমার গণতন্ত্রী প্রাণীশাবকেরা,
তোমাদের সাথে আমি শুয়ে আছি ভাগাভাগি তেঁতুলপাতায়
সে কেবল তোমাদের ফুসলে নেব বলে।

তারপর,
"ইটস্ ইওর টাইম কমরেড মাউজার..."

উন্মোচিত চিঠি-৬

শ্রীমতী বাংলার মেয়ে, রাঢ় সুচরিতা, কতদিন তোমাকে দেখি না!
কতদিন আমাদের পত্রালাপও নেই; শেষ কবে চিঠি দিয়েছিলে?
তোমরা কেমন আছ? নানুর এখন নাকি অনেকটা লম্বা হয়ে গেছে?
লাভপুর এখনো লাজুক? আর, বোলপুর ছেলেটাকে একটু নজরে রেখো,
পাশের বাড়ির ঐ মেয়েটার সাথে একদম মিশতে দিও না।
সিউড়ি তাহলে সেই আলাদা বাসায় উঠে গেল! এরকমই হয়,

পয়সা হবার পর অনেকেরই খুলে যায় রূপ। যাই হোক,
ও নিয়ে ভেবো না আর, এবার আমার কথা লিখি—

এখানে চট্‌চটে পিচে আটকে গেছে চটি। বাবুর বাড়ি ছেলে,
খালি পায়ে হাঁটা তাই কোনোদিন অভ্যেস নেই, সুতরাং
ইচ্ছে হলেও, জানো, যাওয়ার উপায় নেই তোমাদের বাড়ি।
ভ্যাপসা গরমে শুধু বকে যাচ্ছি এর-তার সাথে, হায়,
মাঝে মাঝে সাধ হয় চলে যাই—কিষাণসভায় গেলে
শান্ত হত মন, ক্ষেতমজুরের চোখে দেখে আসি
বহুদূর যৌথ খামার। আর, তোমরা ওখানে নাকি
বর্গাকাজে দারুণ সফল! শোনো, রাজ-কলেজের থেকে
সেদিন কয়টি ছেলে এসেছিল। মন খুব খুশি হল
তাদের মুখচ্ছবি দেখে। শহুরে পাকামি নেই, সারা গায়ে
গরম হাওয়ার গন্ধ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন অথচ নতুন।

মনে পড়ে যাচ্ছিল তোমার গায়ের রং, গেরুয়াগ্রীবায়
শুকনো শালের পাতা ঝরে আছে, সরল সিঁথিতে
অনির্বাণ কৃষ্ণচূড়া—এই দেখে কী ভীষণ কেঁপে উঠছে বুক!
কী করে তোমাকে বলি, ওগো মাটি, আমার দরদী,
কত রক্ত ঝরে যাচ্ছে অনর্থক বাস্ যাতায়াতে। এইভাবে রোজ
আর কি বলো ইচ্ছে করে, আলগা-খোলা যাদবপুরে
সবার হাতে ঘুরতে ঘুরতে বিন্দু বিন্দু জীবনযাপন?

কল্পবিজ্ঞান

চল্লিশ বছর পর ফিরে আসছি নিজগ্রহে, রাডারের গায়ে দেখো সৌরমণ্ডল,
নিজস্ব নক্ষত্র ঐ পুড়ে যাচ্ছে এখনো একাকী...ভাইসব,
ঐ দেখো ইউরেনাস, নেপচুন, শনি, ঐ দেখো বুধ, আর...(ক্যাপ্টেন,
গাল কেন ভিজে ভিজে লাগে? একি কোনো সংক্রমণ?
অন্ধকার যেই গ্রহে শেষবার আমরা নেমেছি, একি তার অজানা অসুখ?)
...ঐ দেখো, জেগে উঠছে সবুজ, সজল সেই গ্রহ,
হ্যালো, হ্যালো...তৃতীয় উপগ্রহ? ফিরে আসছি
চল্লিশ বছরের পর, তোমরা কেমন আছ,
ভারতের বিপ্লব কতদিন সমাধা হয়েছে? নামিবিয়া এখন স্বাধীন?

ফিরে আসছি বারোজন, সঙ্গে আর বাকিদের ব্যবহৃত পোশাক-আশাক,
এক্স-পাঁচ সৌরমালা মোটামুটি বাসযোগ্য বলা যেতে পারে,
সপ্তম গ্রহে আছে ভারি জল, ইউরেনিয়াম...হ্যালো,
শিকাগোর পথে পথে এখন লড়াই? তেজস্ক্রিয় মেঘ থেকে
পৃথিবীকে মুক্ত করা গেছে?

ফিরে আসছি, চৌঠা জুলাই আজ, আমার ভাইয়ের বুঝি
জন্মদিন—সে কি ভালো আছে? ভালো আছে জলবায়ু,
নদীতীরে ডাহুক-দম্পতি? আমাদের গ্রহযান
আয়ুহীন হয়ে এল, অ্যান্টিস্টার্ভ বড়ি শেষ,
অক্সিজেন নিঃশেষিত প্রায়, তবু আমরা এখনো বেঁচে, আর
চল্লিশ বছর পর বিপ্-বিপ্ শব্দ করে উড়ে আসছে স্মৃতিকাতরতা...শোনো,
প্রত্যেকে ভালো আছে? বাংলার একধারে প্রৌঢ়া মেয়েটি—
আনুবউ—আমার ইন্ডিয়া?

মানসযাত্রা

নান্দী

এক লেখা — হয়না কিছুতে
দুই পক্ষ — বিপরীত সদা
তিন নেত্র — নিদ্রামগন
চার বেদ-এ — উন্মূলিত তরু
পাঁচ ম-এ — চিত্ত অবশ
ছয় ঋতু — ওলোট-পালোট
সাত সমুদ্র — নৌসেনাদের
আট বসু — তর্পণাকাঙ্ক্ষী
নয় গ্রহ — কোপনস্বভাব
দশ দিক — অবধান করো...

সময় কি ধারা

সন্ধ্যার পর থেকে শহরের আশেপাশে কুয়াশা কুণ্ডলীকৃত, সহসা দমকলে ঘণ্টাস্রোত, এইভাবে শীত, নীরক্ত শীত এল এইবার, ঈশ্বরবাবু বেঁচে গেলে এ সম্বন্ধে আরেকটি পদ্য, তাঁর কথা উঠতেই— "পাঁঠা", অধুনা আটত্রিশ টাকা, উনিশশো তিরিশে মেসবাড়িতে সারামাস তিনটাকা মাত্র, আরও বছর তিরিশ আগে রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ 'মজা' খুললেন, ছাত্রদল চটিতং...

ভূত বাস্তবতা

"শ্রীহরি নামেতে এক আছিল ব্রাহ্মণ।
করিব ব্রাহ্মণসেবা এই তার পণ।।
দ্বিজসেবা করে তার না ছিল ক্ষমতা।
ভিক্ষা ভিন্ন নাহি তার কার্যের দক্ষতা।।
নিত্য ভিক্ষা করি করে উদর পুরণ।
তাহাতেই দ্বিজসেবা হয় অনুক্ষণ।।
অন্তরে সদাই সুখী অন্ন নাহি পেটে।
তথাপি কৃষ্ণের নাম ভজে অকপটে।।
হেনকালে এক পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল।
হেরিয়া তাহার মুখ বিষাদে ভাসিল।।
হায়রে বিধাতা আজ কি সুখের দিন।
হরিষে বিষাদে মন নিজেই যে দীন।।

যাহাই হউক আমি প্রতিজ্ঞা রাখিব।
ভিক্ষাতে নির্ভর করি দিন কাটাইব।।"

শিল্পনীতির সপক্ষে

জমানা পাল্টায় তবু শ্রীহরির ভিক্ষা হয় না,
সেবার আন্ত্রিক রোগে চৌষট্টিজন...
ফিরে বার বন্যা হল, গেরস্ত উজাড়, ওলো
শ্রীহরির আর সয়না

হারি কি মরবে তবে? কোন আটকুঁড়ে
এ কথা উচ্চার করে, তার বংশ নির্ব্বংশ হোক,
মরা কি সহজ দাদা, যে করে ব্যবসা আদার
তার অত বোলচাল নেই, সেই প্রাণ যায় না উড়ে
সেহেতু বামুন এবার কসাইয়ের সঙ্গে মিশে
দু মুঠো ভাতের লাগি, একটু দুধের তাগিদ

মেটানোর জন্য শুধু করল কালাতিপাত, সব গেল তার,
শুধু এককোণে অন্তঃপ্রেরণাটুকু ধিকিধিকি,
একদিন কসাইয়ের মাংসও সে খাবে।

নীলোৎপল তরুণের কথা

"ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরে, শ্বেত মেঝে, কোন বিবাহের জন্য এত
সেজে উঠছ আল্পনাময়? সাদা দেয়ালেরা,
সাজিয়ে রেখেছ কেন এত শীত? বাইরে তরুণ রোদ
উৎক্ষিপ্ত পৃথিবীকে মেলে ধরছে সূর্যের দিকে...

এত কিছু লিখে সেই তরুণটি দেখতে পেল তার লেখা কংক্রিট না অ্যান্টিও না এমনকি পোইট্রিও হয়নি এখনও অথচ বন্ধু তার ক্যালিগ্রাম লিখছে আজকাল অন্য সখা বৃহন্নলা সাধুভাষা কবিতায় চালাচ্ছে মৌজে অতএব সে ছেলেটি কিছুদূর হেঁটে গেল এরপর বাসস্ট্যাণ্ডের পাশে অপকুলতুর নিয়ে প্রবল বিতণ্ডা দেখে থুতু ফেলল একদলা অন্তত সাড়ে চারফুট দূরে গিয়ে থেবড়ে পড়ল ন্যাকা এক মাস্‌শিল্পীর চেয়ারের পাশে যদিও কারুরই এতে কিছুই হল না তবু এতক্ষণে নিজস্ব ব্যর্থতার প্রতি তার কিছু স্বজ্ঞা দর্শাল

ওদিকে তখন

নরেন ভুটিয়া (হে পাঠক, আর পড়বার কোনো
দরকার নেই, এই লেখা ক্লিশে হচ্ছে—একই কথা
আমিও শুনেছি, আর সত্যি বলতে গেলে
নেহাৎই শব্দঘোঁট, কিছুতেই ততদূর মহাশ্বেতা নয়, তবু)
নরেন ভুটিয়া, আজ নেই, কোনো এক নগরীতে ছিল একদিন,
অনেক কমলা রঙের রোদ ছিল, হোস্টেলে
আমরাও অনেকে ছিলাম, তার কাছে
কারাতে শিখতে গিয়ে আমার বাঙালি প্রাণে
বহু বহু বেদনা বেজেছে, সেই নরেন ভুটিয়া
গত মাসে লিখেছিল :

"আজ আটত্রিশদিন হয়ে গেল, আমি প্রতি রাতে এখানে সেখানে। এই শীতে বীরত্ব দেখানোর ইচ্ছে নেই, তবু জানাই, বেঁচে আছি। তুই সবই জানিস, নতুন করে বলার কিছু নেই, তবু সংযত থাকিস। এখানে আসিস না। আমাদের লড়াইটা আমাদেরই লড়তে দে।

ওরা বলছে, আমরা জাতিদ্রোহী। বলছে, কমিনিস্টরা জাত মানে না, ভগবান মানে না। মিথ্যে বলছে না কিছু, কিন্তু মানুষকে তো মানি, দেশ মানি, যুক্তিকেও মানি। তাই, কাল যখন আমারই খুড়তুতো ভাই (খুড়তুতো-ই তো বলিস তোবা?) আমাকেই গুলি করল, তখন শরীরটা রিফ্লেক্সে লাফ মেরে পালাল বটে, কিন্তু মনটা অসাড় হয়ে এল। এই দুঃখটা আর কাকে জানাব? আমার কমরেডকে ছাড়া?

আর একটা কথা, এই ঝঞ্ঝাটে না পড়লে নিজের একটা দিক বোধহয় অজানাই থেকে যেত। সন্ত্রাস আর মৃত্যুর মধ্য দিয়েই বুঝছি, আমি আসলে কতটা ভারতীয়।

খারাপ থাক্। বেঁচে থাকলে দেখা হবে।"

তারপর যে সংবাদ প্রত্যাশিত ছিল
আজ তা সংবাদের পাতে...

একটি উদ্ধৃতি

You have passed
as they say
into world's elsewhere
Emptiness
Fly,
cutting your way into starry
dubiety.

মানসযাত্রা

কোন দেশ?
বাংলা দেশ, শুকনো রুক্ষ বাংলাদেশ।
কোন নগর?
প্রাণহাটা, উদয়াস্ত গতরখাটা।
কোন বাড়ি?
বোস বাড়ি, শোক বাড়ি, শূন্য বাড়ি।
কোন বোস?
যদু বোস, অশ্রুপাতে শব্দ আঁকে, বাকিয় আঁকে।
ডাকতে ডাকতে উড়ে যাচ্ছে
উড়ে যাচ্ছে উড়ে যাচ্ছে
উড়ে যাচ্ছে দিগন্তময়
পাহাড়ময়
অসংখ্য কমরেড

---

*এই সংখ্যার তৃতীয় পর্বটি শ্রী শম্ভুনাথ পণ্ডিতের শনির পাঁচালী ও সপ্তম পর্বটি মায়াকোভ্স্কির "সের্গেই এসেনিন" থেকে উদ্ধৃত।

চটি

চিক্কন শুভ্র চটি, এমি লোয়েলের থেকে সরে এসো
তন্বী পাদুকা, তুমি সরে এসো রবি ঠাকুরের থেকে
ধবল শিখার মতো রূঢ় গ্রীষ্মে নাচো ব্যালেরিনা
আমরা তোমাকে ঘিরে গোল হয়ে বসি

বালির মধ্যে গোঁজা হাড় তুমি, শাদা চটি, শাদা নর্তকী,
শীত কুয়াশার মতো শাদা যেন নতুন ব্রায়ের মতো শাদা,
নিগ্রো দাঁতের মতো শাদা তুমি, ভোরের টগর শাদা চটি
সদ্য বিধবার মতো শাদা যেন শান্তি পতাকার মতো শাদা

ধবল আগুন হয়ে রূঢ় গ্রীষ্মে নাচো দেবদাসী
আমরা তোমাকে ঘিরে বসি গোল হয়ে

দিবাস্বপ্ন

এও তো স্বভাব; নাড়ি ছিঁড়ে যাওয়া যন্ত্রণার আচ্ছন্ন দুপুরে চারদিক ঘোর করে নেমে আসে তন্দ্রার স্রোত, আমি দেখতে পাই গাঢ় নীল মুঠির সমষ্টি আর ক্রমশ বেগুনি চুল, সপ্রতিভ বিজ্ঞাপনে এমন রয়েছে বহু, বিশ্বাসের কথা তাই কীভাবে রাখব, যদিও ভাবার এত সময় থাকে না, এত ঝট্‌কায় সরে যায় এই ছবি, তারপর পিট্টু খেলার দিন মধ্যাহ্নবেলা বয়রাবাদাম খুঁজে হন্যে হয়ে ফিরে আসা (ইনফ্যান্টাইল ডিসঅর্ডার, জানি আমি, কারো কারো থেকে যায়, যেমন আমারও) রামদুলাল ঘোষজার মধ্যমা এ কন্যা অবিবাহিতা কন্যাটির বওক্রম সাড়ে চারি বৎসর মেয়েটিঅ যুন্দরি—তাই নাকি, এত তুই সুন্দরী রাখি, তোর খেলাঘরে পেটুক কায়েত আমি বসে থাকতুম (তখনই যুক্তিবাদী, শসার চোক্‌লা কেন মাছ-মাংস হবে?) রাখি, তোর মুখে একদিন : তোমাদের এই হাসি খেলায় এই কথাটি...মনে আছে, মনে আছে রাখি, এসব জড়িয়ে মিশে পঁচিশটি বলিরেখা আমার সম্বল, তাই আমি কি ভুলিতে পারি ঐ একুশে ফেব্রুয়ারি (সেখানে থাকিয়া মোকাম ধান্যখালি রেশমি রকম কাপড় কিঞ্চীত তার্জিদিগে পর্তন জাত করিয়া করিব ইহা ঙ্গাতো করিলাম) এবার পায়ের পাতা অন্ধকারে কামড়ে ধরে মাটি থেকে গজানো শিকল, আমি প্রাণপণে ধরে থাকি মাধবী ফলের তুলি, জয়ানন্দ, অনাঘ্রাতা তুলি আর বেগুনি চুলের ঢল, নীল মুঠি, উনিশ বছর পর এখন দু চোখে তোর অন্য ভাষা, আমার ছোট্ট ঘরে কে তুমি বিদেশি রাখি, ঐ দরজা দিয়ে বারান্দায় যেতে পারো, রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে হালের ছেলেরা, তুমি ফিরিয়ে দিওনা রাখি, তাদের অনেক আশা,

এসো না এ ঘরে, এই শরীর অবশ করে চুঁয়ে নামছে ছাতিমের ঘন গন্ধ, চুঁয়ে নামছে, ক্রমশ চোখের পাতা ভারি হয়ে বুজে আসছে, পেটের পেশিতে সেই ব্যথা, আমি জেগে উঠছি, জেগে উঠছি বিশ্বচরাচরে।

বড় বুর্জোয়াদের স্তুতি

জলের উপর হাঁটো বন্ধু, পাওটি ভিজাও না
গেরস্ত সাজ হে সখা, কণ্ঠী ছাড় না
এক হাতে দাও মিঠাই খেতে, অন্য হাতে কাড়
সমুৎপন্ন সর্বনাশে অর্ধেক ধন ছাড়

তমোময়, একার্ণব, যোগনিদ্রা যাও
গাণপত্যে বৈশ্যরূপে ডুগডুগি বাজাও
চার্বাক, শম্বুক, বলি, দক্ষ প্রাচেতস
তোমার লীলায় ভগ্ন, পরবশ

তুমি আমাদের পিতা, তোমায় পিতা বলে যেন জানি
ঐরাবতবর্ষে রাখো প্রলয়ঙ্কর পাণি,
দেখে কাঁপে মোর হিয়া
আমার খাজনা আন্‌বাড়ি যায় আমারই আঙিনা দিয়া

কাব্যজিজ্ঞাসা

গোপন মিল, স্পষ্ট মিল, কে জাগে রে আগে?
শুনিয়া অবিদ্যা দেবী মহাত্রাসে ভাগে।
গোপন মিল, স্পষ্ট মিল, ঢোল-ডগর কার?
রাজকন্যে ছিটকে ওঠে, 'আমার আমার'।
গোপন মিল, স্পষ্ট মিল, দেখি বাবা জিভ?
দেখিয়া খোক্কসকুল জবুথবু, ক্লীব।

গোপন মিল, স্পষ্ট মিল, চিবাও কড়াই,
শিয়রে বসিয়া থাক্ বাঙালি চড়াই।
গোপন মিল, স্পষ্ট মিল, কার বেশি শোক,
যে জন পদ্য লেখে, যে জন পাঠক?

ক্ষণিকা

মেয়েটি তালগাছ, আমার কাছাকাছি, লম্বা চুল
পরম স্বাভাবিক যে মিল মনে হয়, সেটাই ভুল
হঠাৎ ঝাঁকুনিতে আলতো হেলেছিল আমায় গায়
পঁচিশ বছরেও কেন যে কৈশোর এত জ্বালায়
নখের নীচে জমে তেজস্ক্রিয় মেঘ, অনেক পাপ
সহস্রার ফোটে মৃণালে গম্ভীর বাস্তুসাপ
তবুও তালগাছ আমার কাছাকাছি, লম্বা চুল
কুমির কোথা গেল, ঝুলছে ডালে-ডালে কত তেঁতুল
বেহুঁশ পথটুকু পেরিয়ে এসে যেই থামল বাস
গুমোট লজ্জায় দেখল প্রান্তরে জমেছে ঘাস
সরোহ বলেছেন : এ-জাত মায়াবিনী; তবু আকুল
এখনো তালগাছ, আমার কাছাকাছি, লম্বা চুল

সতর্কতা

স্বরোচি আমি, হাঁস ও হরিণ ডেকে আমায় বলে
'যেওনা যেওনা আর হরিৎ জলে'

ক্যাথরিন, কালো মেয়ে, কোথা যাব বঁধু?
বটের কোটরে ঢুকে পা দোলাব শুধু

মাঝরাতে শোনা যায় চাপা শীৎকার
দেবকীর গর্ভে বীজ পোঁতা হল এই আটবার

পদ্মগোখ্‌রো হব, ফণা মেলে শিয়রে দাঁড়াব
শৃগালমূর্তি ধরে একা একা পথ হাৎড়াব

ক্যাথরিন, রোগা মেয়ে, হরিপ্রিয়া তুমি
পুলিশের গন্ধে ভারি এ ভারতভূমি

স্বরোচি আমি, হাঁস ও হরিণ ডেকে আমায় বলে :
'যেওনা অবোধ আর অগাধ জলে'

মাথুর

ও দুঃখ, এই বাঙাল প্রাণে সফল হয়ে বাজো
তারে পাইনি খুঁজে আজো,
এক ঋতুতে আর এক ঋতু সন্নিহিত, আমি
কী করব, কোথায় যাব স্বামীন্?

যদি অন্ধকারে নাচো,
ওগো রহস্যনীল, জানাও আমার ভরবে কিনা আঁচল
কলস ভাসে এ ঘাট থেকে অন্য ঘাটে, প্রভু
জল মেলেনা তবু

আমার কণ্ঠ পোড়ে তরল শীসার আঁচে,
বুকের আরো কাছে
ও দুঃখ, নীলকান্তমণি, বহন করো ঋত,
অঙ্গে নামুক অনঙ্গ সম্বৃত

অচিন ঘাটে চন্দ্রাবলীর অস্থি পুড়ে খাক্
গায় জয়দেব : নন্দদুলাল বহ্নিতে লুকাক

মে দিবসের কবিতা

এখন অলস দিনে দূরে-কাছে
নিদাঘ আর্দ্র করে ও কার মোহন বেণু বাজে?

মূষিক উজাড় করে দিনশেষে সুপ্রচুর ধান
এসো তৃণদল, হাতে-হাতে হয়ে ওঠো মুষল প্রমাণ

এখন অবশ দিনে দূরে-কাছে
নিদাঘ তুচ্ছ করে ও কার মোহন বেণু বাজে?

লও দধিভার তোহ্মো, আরো পথ যাই
যাইতে তোহ্মাকে মতি দিব মঁ কাহ্নাঞি

কই মতি দিলি কন্যা, ছায়াতে মিলালি
পথ চেয়ে বসে আছি, রুদ্ধ আলিকালি

এখন দারুণ দিনে দূরে-কাছে
নিদাঘ ছিন্ন করে তাই কি বিষের বাঁশি বাজে?

৩০ এপ্রিল '৮৭

আমি বলতে পারতাম : ও বৃষ্টি, থেমোনা
ঝরে যাও সারারাত্রি, শীতার্ত হরিণের চোখ
যেরকম ছলছল্ করে ওঠে, ঠিক সেইভাবে
এ শহর ফুঁপিয়ে উঠুক

বলতে পারতাম : ও বৃষ্টি, ঝরে যাও
কেউ যেন ফিরতে না পারি আজ,
অন্তত এইভাবে আমাদের কথা শুরু হোক
বাধ্যত, কালবৈশাখে

এই সমস্ত-সেই সমস্ত কথা, যা আমি সাজিয়ে তুলছি
এই ছোট্ট লেখায়, তার একটাও বলতে পারিনি,
যেহেতু আমায় তুমি ভালোবাসো কিনা
আমি বুঝতে পারিনা

প্রার্থনা

হরি হে,
মহাকাল সর্বভূক, তাই
বুঝেছি এ ঘরবাড়ি-টাকাকড়ি ছাই,
সেহেতু জিরেতজমি, সুদ ও বন্ধকী
বড় খোকাকেই সব দিয়ে যাব, আর যা-যা বাকি
চালকল, তেলকল, দুটো হিমঘর
ছোটোখোকা বুঝে নেবে, আমি আয়কর
জলকর, মজুরি বৃদ্ধির থেকে এবার নিস্তার
পাব হরি, খাব হরি একবেলা দু মুঠো পেস্তা
অন্যবেলা নিরামিষ ডিম; নামগানে
শেষকটা দিন ঠিক কেটে যাবে এখানে-সেখানে।

বলি শুধু, দীননাথ, ভবলোকে তোমার পুত্রেরা
সবাই তো, যাকে বলে 'ইয়ে' নয়, ঘুরতে-ঘুরতে আর
সবার সঙ্গেই ঠিক সদ্ভাব রাখতে পারিনি;
এখনো তো হেথা-সেথা দু-চারটে হানিফ-তারিণী
অহোরাত্র গাল পাড়ে, এত অভিশাপ
অঙ্গে তো লাগে প্রভু, তবু বলো কী আমার পাপ?
স্মৃতিধর চিত্রগুপ্ত এসবও তো রাখছেন লিখে,
মিথ্যা প্রচারের ফলে শিরে যদি নাই ছেঁড়ে শিকে
ওপারে, ভাবছি তাই, যমরাজে ভেট দেব কী...?

হরি হে,
বউটাকে তুলে দিও, চিতেয় খানিক ঢেলে ঘি।

পঁচিশতম জন্মদিন

সান্ধ্যশহরকে বিদায়। আমি ডানা ছেঁটে এইবার চেয়ারটেবিলের মাঝে থিতু হয়ে যাব। আন্‌কথা ভাবা বন্ধ, শপথ করছি। ভুলে যাব কালো আর রোগা সেই মেয়েটিরও নাম। অসিতাপাঙ্গী ছিল সেই মেয়ে, মনে আছে—আর মনে থাকবে না, দেখে নিস। নিখিল ভুবনে বড় গোলোযোগ, এইবার ঠাহর পাচ্ছি। ভুতুড়ে জ্যোৎস্নায় আজ ঢেকে গেছে

বাড়ি ও বাগান। এখন বকিসনা আর, বেহদ্দ উড়নচণ্ডে মোটে থাকব না, বলছি তো। শান্ত হয়ে আয় ঐ বারান্দায় বসি। কাউকে তো ভালোবাসব না আর, তাই চল আলোচনা করি, কীভাবে তাবৎ চাল মিলেজুলে কেড়ে নেওয়া যায়; টিনসেল সিটি ভেঙে কীভাবে বানানো যায় দারুণ সিনেমা।

খেলাঘর

খোকা থাকে ঢেউশীর্ষে, খুকির টিপ জ্বলে
খোকার যত স্বপ্ন থাকে খুকির অঞ্চলে
লবণজলে খোকার চোখ হারিয়ে যায়
ভাঁটায় খুকি বালির তীরে কুড়িয়ে পায়

খুকি যে মনে করে সে এই পৃথিবীর কোথাও নেই
নেহাত কেন যেন আটকা পড়ে গেছে অজান্তেই;
কোথায় যাব এই ধূসর দেশ ছেড়ে—খোকা অবাক
পৃথিবীময় এত যুগান্তর আর কুম্ভীপাক
বিষ ও উপশম—এসব দূরে ঠেলে কোথায় ঘর
আকাশে যেতে হলে সেখানে যাক কোনো নভশ্চর

খোকার বুকে উপলক্ষত, খুকির মুখ শাদা
খোকার যত দুঃখ থাকে খুকির খুঁটে বাঁধা

রাত ১২.৫০ মিনিট
১৬।৫।৮৮

মেঘপিয়ন—১

যাও মেঘ, অস্ত্যান্তরস্যাং দিশি...। সে মেয়েটি বসে আছে গাছতলে, নীলিমাদুহিতা। দিগন্তে পাহাড়-রেখা, মেঘ, তুমি অবিচল থেকো। কী যে ভাবে সে মেয়েটি, কিছুই জানিনা। শুধু শুনি গান গায়, খরগোস পোষে। তবু সেই নিশুতি রাত্রে আস্ত চাঁদের ঠিক নীচে কেন বসেছিল সে? শশক পুষতে গেলে শশধর ভালোবাসতে হয়? মেঘ, তুমি জানো কিছু? হায় মেঘ, তুমি তো নেহাতই মেঘ, রোহিতাশ্ব জানাতে পারত। অবশ্য সেও এক গর্বিত ঘোড়া, আদপে ততদূর শশব্যস্ত নয়। এদিকে আমি তো দেখ লিপ্ত আছি গণনাক্রিয়াতে। দেশের দল নিতে কত দেরি, তাই ভাবি দিবসরজনী। এই বাক্য অতিরিক্ত হল? অই হে বঁধুয়া মেঘ তাহলে স্বীকার যাই, মেয়েটিরও কথা ভাবি ফাঁকে-ফাঁকে লুকিয়ে...

চুরিয়ে। সেহেতু তোমাকে ডাকা। রেল-লাইনের ধারে খেলুড়ে বাচ্চাদের ইস্কুল এনে দিতে হবে। বাংলাকে দিতে হবে হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালস্। তার আগে ছুটি নেই। ইতিমধ্যে খুঁজে নাও পথ। রাহাখরচের বিল ও-মাসে পাঠিও। যাও মেঘ, বলো তারে, সে যেন ভোলেনা মোরে...

মেঘপিয়ন-

মেঘ, তুমি ফিরে এলে? মেয়েটি তো এখনো এলনা! বলেছিলে, আমি তার অপেক্ষায় আছি? ভয় হয়, তুমি তো প্রাচীন দূত, কাণ্ডাকাণ্ড কিছু বাধিয়ে আসনি তো! নীবিবন্ধের দিন কবেই বিগত, এখন ওসব কথা তোলো যদি গণপ্রহারের ভয় আছে। রবি ঠাকুরের দেশ উনিশ শতক থেকে ভিক্টোরীয়, শোভন-সুন্দর। আঙ্সাঙ্ কথা তাই, আশাকরি, ভুলেও বলনি। সত্যি ভেবে বলো দেখি, বলেছিলে—হালে আমি রোজ ঘুমে জাপ্‌টে ধরি তাকে? উন্নাসিকা তবুও এলনা! ধন্যবাদ মেঘদাদা, আপাতত মনে হচ্ছে কপালেরই দোষ, হতাশায় যুক্তিবোধ হারিয়ে যাচ্ছে। যাই হোক, এবার তাহলে যাও নিজপথে, উত্তর ভারতে। দু-সন খরার ফলে কৃষকের ভবিষ্যৎ চৌচির হয়ে আছে। যাও, সেথা বৃষ্টি দাও, সঙ্গে দাও আমাদের পক্ষ থেকে কুলাক-বিরোধিতা। বোলো, শুধু বৃষ্টি নয়, প্রয়োজনে বজ্রপাতও ভাগ করে নেব।

ভয়

আজকাল আমি তার মুখটিও মনে করতে ভয় পাই, মাধবী গাছ, যদি আকাশ আবার ছিঁড়ে পড়ে, যদি আবার শ্বাস আটকে যায়, যদি গ্রাস মুখে তুলতে গিয়ে দেখি ভাত নয়—রক্ত জমে আছে ড্যালাড্যালা...ভাবতে ভাবতে ওয়াক উঠে আসে মাধবী গাছ, চারপাশে কেবলই মৃত্যুসংবাদ শুনি, আমার খুব ভয় করে, আমি রোগা হয়ে যাচ্ছি দিন-দিন, নির্জন হয়ে যাচ্ছি, কোথাও যাইনা আর, বন্ধুদের বাড়ি না, মা-বাবার কাছে না, রাস্তা পার হতে গিয়ে আচম্‌কা ভয় পেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ি আর শিরদাঁড়া হিম করে ছুটে যায় ট্রাক...মাধবী গাছ, সে তো খুব ভালো আছে, স্বপ্নমগ্ন রেস্তোরাঁর কোণের টেবিলে বসে আছে চায়ের পেয়ালা আর ছেলেটিকে নিয়ে, যেতে-আসতে প্রত্যেকেই তাদের কুশল দিয়ে যায়...মাধবী গাছ, রাত দুটো বেজে যায়, আমার ঘুম আসে না, ভয়ে বুক শিরশির করে ওঠে, আমি তোমাকে এসব কথা বলব বলে রাস্তায় ছুটে যাই, তীক্ষ্ণ হর্ন বেজে ওঠে, চোখের মধ্যে ঢুকে যায় হেডলাইটের আলো...মাধবী গাছ, আমার কী হবে?

পৌষ সংক্রান্তি

আর, এই যখন শুরু হল শীতরাত্রির বৃষ্টি, হঠাৎ চম্‌কে উঠে জানলা খুলে গেল, আমি আরো একবার শাদা কাগজের উপর ঝুঁকে পড়লাম তোমার জন্য। আজ অশ্রুর কথা লিখি। অশ্রু আকাশ থেকে ঝরে পড়ছে লিখব না। কেননা, বৃষ্টি ও অশ্রুর মধ্যে কতটা তফাৎ আমি জানি। তুমি তো শুনেছ, আমি বৃষ্টিতে ভিজতে ভয় পেয়েছি, অশ্রুতেও। তবু, এই দেখো, আকাশের পিঠ থেকে আজ রাতে মুছে গেছে যাবতীয় তারা ও জ্যোৎস্না। কাঙাল সময় জুড়ে ঝরে পড়ছে পাতা। মনে হচ্ছে কেউ এল। মনে হচ্ছে, দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে কেউ। আমি জানি কেউ নয়। কেননা, বাতাস ও মানুষের মধ্যবর্তী কোনো এক অস্থির পেণ্ডুলামে আমি শুয়ে থেকেছি বহুদিন। আমি জানি, এত দ্রুত কেউ আসবে না। এই তো নিঃসঙ্গতা, যাকে আমি ভয় পেয়েছি চিরকাল। এই তো নিঃসঙ্গতা, যার এক-একটি বিবর্ণ খোপের মধ্যে নিঃসাড় শুয়ে আছে প্রতিটি ভারতবাসী। আজ রাতে তাদেরও দরজায়-দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে বাতাস। ঘুমের অতল থেকে তাদের নাকের পাটা ফুলে উঠেছে অভিমানে। তারা ভাবছে, কেউ এল! তারা ভাবছে, কেন কেউ এখনো এলনা!

ভূমিকম্প

উনিশশো উননব্বইয়ের কোনো সন্ধ্যার কথা দিয়ে শুরু করি। আমার কিছুতেই মনে পড়ছিল না সেই মেয়েটির মুখ, যদিও তখন পৌষ, সংক্রান্ত জানুয়ারি, এবং সাকিন এই বাঙালি শহর, অর্থাৎ লাইল্যাক ফোটার কোনো কথাই ছিল না, তবু ফুটেছিল। শুধু ফুটেছিল নয়, ত্রস্ত আঙুলে সেই লাইল্যাক ফুল শিয়রের পার্শ্বদেশে অলক গুছিয়ে নিয়ে হেসেছিল। অবশ্য, এখন যদি প্রশ্ন করেন, আমি আদতে নয়নতারা কিনা, তাহলে ভ্রান্তি আর শ্বাসকষ্ট বেড়ে যাবে, কেননা সেদিন সেই সন্ধ্যায় তার মুখ কিছুতেই মনে পড়ছিল না!

তো, একে কি ছন্দ বলবেন কবিরা? একে কি ভালোবাসা বলবেন? যখন অনুতাপ হয় বহু ভুল হয়ে গেল ভেবে, যে সময়ে নিঃসঙ্গতা হেরে যাচ্ছে মনে হয়, চীনে লণ্ঠন জ্বলে উঠছে হানাবাড়িতে, বাচ্চারা ওড়াচ্ছে ফানুস এবং গ্রাহাম বেল কথা বলছেন এনগেজড্ টোনকে ছাপিয়ে...একে কি তেমন কাল বলা যাবে?

সেদিন তেইশে, শীত, গালা-র ঘড়ির স্রোত একপল থেমে গিয়েছিল

এখন

অপেক্ষা...অপেক্ষাই তো, আর কী করতে পারো প্রতি রাতে কাজ থেকে ফিরে? আর কী করতে পারো, যখন নিশ্চিত করে কেউ কিছু বলতে পারে না? বলো দেখি, এবছর ঠিক কবে বসন্ত আসবে? ঠিক কবে, প্রশ্নটা লক্ষ করো, যুক্তি ও অভিজ্ঞতা দিয়ে সহজেই বলা যায় বসন্ত—অর্থাৎ কিনা ফাগুন-চৈত্র মাস—শীতের পরেই আসে, এসে থাকে। কিন্তু, ঠিক কবে সেইদিন, যেদিন সহসা তুমি টের পাবে—হাওয়া দিচ্ছে, টের পাবে—ততটা কুশ্রী নয় এ শহর, ততটা ফিচেল নয়, দেখবে বিস্ময়বোধ এখনো মরেনি?

কেউ তা জানেনা। আগে কি জানতে তুমি, সেই মেয়েটির সাথে এ ক'দিন দেখাই হবে না? আগে কি জানত কেউ, ঘোড়ার ব্যবসার দেশে তোমরা কোনো যতিচিহ্ন হয়ে উঠতে পারো? ফলে, তুমি দণ্ডপল অপেক্ষাউদ্‌গ্রীব থাকো, থাকো স্নায়ু টান করে, ইতিমধ্যে কেচে নাও ময়লা পোশাক। অস্ত্র প্রয়োজন হলে যাতে কোনো দধীচির অভাব না হয়, অস্ত্র ভেঙে ফেলতে হলে যাতে তুমি হতে পারো প্রথম পায়রা, যাতে ঠিক সময়েই দর্শকেরা উপস্থিত হন, যাতে এই দুঃখি দেশ লগ্নভ্রষ্টা না হয় কখনো।

আর কী করতে পারো, প্রতিরাতে মৃত্যু থেকে ফিরে আসা ছাড়া?

ভবিষ্যৎ

ঠিক তখনই একটার পর একটা খুঁটি আমি উপড়ে ফেলছিলাম আঁরিয়েৎ, ঠিক তখনই একটার পর একটা কাঁটাতার কাটতে কাটতে আমি হাট করে দিচ্ছিলাম সীমান্ত। যখন রাত্রি প্রায় শেষ প্রহর, মধ্য-সাগর থেকে উড়ে আসছিল কারটেগোর জাহাজের সিটি আর গঙ্গাস্নানে ছুটছিল নুনের দেওয়ানরা—ঠিক তখনই, আঁরিয়েৎ, ঠিক তখনই অন্ধকার কামড় বসাল আমার গলায়, জিভ অসাড় হয়ে এল, আমার দেখা হল না সিঁথির সিঁদুরের মতো সূর্যোদয়, ক্ল্যারের মতো, বাণীর মতো আশমান...

কত-কত দিন কেটে গেল, আমার হিশেব নেই মন-আমি, আমরা শুয়ে আছি চুপচাপ আর সূর্যাস্তই দেখছি শুধু, দেখছি গোরস্তানে মাথা কুটছে একশৃঙ্গ ষাঁড়, হলুদ ঘাসের মাঠে ফুটবল খেলছে ছেলেরা, ট্র্যামের সমুখ থেকে উত্তেজিত ঘোড়াগুলি উধাও হয়েছে, যশোপ্রার্থী পিগ্‌মিদের মুখ থেকে ছিটকে পড়ছে থুতু ও দুর্গন্ধ, আর দীর্ঘকায় বিষণ্ণ গাছেরা ঝরিয়ে দিচ্ছে অকাল-হেমন্তের পাতা—এই পাতাগুলি রোগা ও অসহায়, আঁরিয়েৎ, আমরা এদের ছুঁতে পারি না, শুধু চেয়ে দেখতে পারি কবিতায় ফিরে আসছে আবার ভাঁটির টান, সমাজদিনের আলো ফুরিয়ে আসছে।

এতদিন কে আমার—আমাদের—কবিতা পড়েছে? ব্যারনের টুপি পরা পাটের দালালরা? শামলা আঁটা সর্দার পোড়োরা? নির্বোধ, লালাসক্ত ঝাণ্ডাকবিরা? হপ্তা খাওয়া পুলিশ, বেহায়া সমাজসেবী, পাঁশনে আঁটা মাস্তান, তেলাক্ত আমলারা? কারা আমাদের পিছে এতদিন ব্যাণ্ড বাজিয়েছে? উত্তরপুরুষের কানে কারা আমাদের নামে গোছা-গোছা গপ্পো মেরেছে? লুব্ধ মাস্টাররা? গুণ্ডা সম্পাদকরা? [illegible]? ভয় পেতে ও পাওয়াতে যারা রক্তহীন হয়ে যাচ্ছে ক্রমাগত? বেশ্যারা? আ, আঁরিয়েৎ, উনিশ শতক শেষ, হাড়কাটা গলি থেকে এখন ফোটে না আর বিষাদকুসুম।

তবে কার জন্য আমি নিজের আদ্যন্ত আয়ু জ্বালিয়ে দিয়েছি? হ্যাঁ, আমি মাইকেল ডাট্, প্রশ্ন করছি তবে কার জন্য আমি মায়ের চোখের জল শুকোতে দিইনি? কার জন্য, আঁরিয়েৎ, তোমাকে বেবাক দিন উপবাসী থাকতে হয়েছে? 'দক্ষিণা'-র মুখ আমি দেখতে পাই আজকাল, বুঝতে পারি কোন্ কোন্ বীজাণুগণিতে মানুষের পায়ে ফোটে মানুষেরই ফেলে যাওয়া কাঁটা। বুঝি ক্লান্তি, বিবমিষা, কর্মাটাঁড়ে ঈশ্বরের চতুর্থ আশ্রম। পাথরের এই দেশে স্মৃতি তবু মাটি ফুঁড়ে ঢোকে; তখন কুয়াশা নামে, ঘাসের চূড়ায় জ্বলে জোনাকির আলোপরমাণু, সন্ধ্যার পাখিরা সব পালকের উষ্ণতায় ক্রমাগত আবছা হয়ে যায়, আমি দেখতে পাই খুলে যাচ্ছে প্রকাণ্ড জানলা : তামাকের কড়া গন্ধ, কক্নি ও ক্রুহ্যামের কোলাহল ভেদ করে দৈববাণী উঠে আসে, থেমে থেমে বলে যায়—"এই দোষ আমাদেরই গর্ভে ছিল সাপ হয়ে, তক্ষক হয়ে। হে প্রিয় ব্রুটাস, পাপ কোনোদিন আকাশে থাকে না!"

তাই, জাগো হাওয়া, জাগো পৌষ-ফাগুনের আঁধি, জাগো ব্যাসল্টঝড়ের বন্যা, জাগো, ঋক্, জাগো সাম্, জাগো আশা ও ডানার ঢেউ, এই এপিটাফ ও অবেলিস্কের শহরে জাগো ঘাস, জাগো নিশানেরা, জাগো মানুষের চিন্তা ও ইচ্ছার স্রোত, নাভি থেকে শব্দকে তুলে আনতে জাগো। আশা ও নিরাশার মধ্যে কেঁপে উঠছে এই দেশ। ভয়ে কাঁপছে, আকাঙ্ক্ষায় কাঁপছে, তার স্নায়ু ও রক্তের মধ্যে কথা বলো। জাগো মোহর্‌রমের দুলদুল, রক্তাক্ত ঘাড় তুলে আকাশে বিদ্ধ করো হ্রেষা ও নিঃশ্বাস। জাগো লাভা, নিশ্চিহ্ন করে দাও সাবেকী শিল্পের স্মৃতি, মীনাবাজারের ঠাটবাট। বৃশ্চিক রাশির নীচে যে মানুষ শুয়ে আছে ভাষাহীন, কর্পদকহীন, তাকে দাও রূপকথা, তাকে দাও যথার্থ মনীষা।

জাগো ভবিষ্যৎ। জাগো, নতুন কবিরা।

কলম্বাসের ডিম

খাড়াই বেয়ে উঠতে উঠতেই (আসলে হয়তো এটা আদৌ খাড়াই নয়, পাহাড়িরা ঠিক একে কী বলে এখনো জানি না, আমি সমতল থেকে আসা) আপনার সঙ্গে দেখা হল, আলভারো গুয়েভারা, তখন—যদি আমি ভুল না দেখে থাকি—আপনি সদ্য এক কামড় বসিয়েছেন হাতের আপেলে। লক্ষ করুন, এই 'আপেল' শব্দটি বড় ক্লিশে। সেই আদমের গল্প থেকে কত কত লোক, এমনকি সেই জার্মান ছবিতুলিয়ে, নাম মনে নেই, জীবনে প্রথম ফাসবিণ্ডার দেখার পরদিনই যাঁর ছবি আমি দেখি, সেখানেও 'আপেল' দৃশ্যটি নিয়ে কমবেশি রঙ্গ করা ছিল। এবং, রোম্যান্টিকতার খোঁয়াড়ি ভাঙতে, উল্লেখ করা যাক, পাহাড়পিনদ্ধচূড়ার নব্বই ডিগ্রি কোণে তখন সূর্যাস্ত। লক্ষ করুন, আমি কিন্তু শুরু করেছিলাম কিছুটা নিও-হাংরি ধরণেই।

সেই কমলা আলোয় ডুবে তামাক খাচ্ছিল দুজন। এ ওর হাত থেকে তামাক খাচ্ছিল। যদি কোনো এক উন্মাদ মুহূর্তে যাবতীয় বিদেশি ভাষার অর্থভাণ্ডারটুকু মনে রেখে ভুলে যাওয়া ধ্বনি (হ্যাঁ, ধ্বনির বিরুদ্ধে তো আমি কতকালই, ছন্দ জানলেও তাই ছন্দে লিখতে আমার একেবারেই ইচ্ছে করে না) যদি ভুলে যাওয়া যায়, তবে এই বাঙালি তামুকপানের কৌতুক ধরতে পারা যাবে। তাদের পায়ের কাছে মণিহারি ঝর্না খরতোয়া, আহা, ঝর ঝর ঝর ঝর...'ঝরে পড়ছিল জল নয়, অপরাধীদের স্বেদ, জল নয়, কালো রক্তধারা'—এসব চ্যাংড়ামি আমি মোটেই করছি না। কারণ, সংশোধনের অতীত নির্বোধরা ছাড়া আর প্রত্যেকেই মনে রাখে ঝর্না দিয়ে জল পড়ে, অবশ্যই অপরিশুদ্ধ জল, পিপাসা মেটানোর আগে ছিল ডায়েরিয়ার কথা ভাবা ভালো, আরো ভালো তীরে বসে ঘন হয়ে হানিমুন স্ন্যাপ। লক্ষ করুন, নিও-হাংরিদের থেকে আমি তফাতেই সরিয়ে নিচ্ছি নিজেকে।

সরিয়ে নিচ্ছি, কারণ ধিঙ্গিপনা আর ভাল্লাগেনা মাইরি। বেশ আছে, খাচ্ছেদাচ্ছে সব, ওড়াচ্ছে বাপের টাকা, বাড়িতে পায়েস হলে (হ্যাঁ, এদের ঘরেও দিব্যি পায়েসটায়েস হয়, লক্ষ্মীপুজো হয়, তা বাদে অনুবাদ গপ্পো ছাড়া আবসাঁৎ এই দেশে পাওয়াও যায় না, আর পর পর সাতদিন চুল্লু মারতে হলে কলজেয় দম লাগে, বাঙালির অত দম কে বা আশা করে হায় কে বা আশা করে...) তা যা বলছিলুম, বাড়িতে পায়েস হলে অগ্রভাগ বাটি করে মিটসেফে ঠিক রাখা থাকে। সারাদিন সোয়াহিলি ঢাক আর ইকোয়াডরের পদ্য চটকেমটকে রাতে ঠিক চুপি চুপি সেই অন্ন বুদ্ধের মুখ করে খাওয়া হয়ে যায়—ফলে, হাই ওঠে আলভারো, এদের দেখলে বড় ঘুম পায়, মনে হয় কতদিন দাঙ্গা হয় না, কার্ফিউ হয় না, নাশবন্দী হয় না, অন্তত একবার হোক, অতিরিক্ত বামপনা কতদূর ঝামেলা সামলাতে পারে দেখে নিই, আলভারো, কার চৈতন কোথায় বাঁধা তখন সেসব বুঝতে পারব।

কিন্তু, আপনার সঙ্গে তো এইখানে সাক্ষাতের কথাই ছিল না। ততটা এথ্‌নিক নই, তবু বলি, চুম্বকমেরুর দুই সুদূরপ্রান্তে আমাদের দুখানি শিবির। আপনার রাজনীতি—কলম্বাসের ডিম, আর...মেনে নিচ্ছি, এখন তো অনেকদিন আমি ভোটার তালিকা সংশোধন করছি, চাঁদা তুলছি, রক্ত দিচ্ছি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য, জানেনই তো ন্যাংটো বিপ্লবিয়ানা কিংবা সমকামী মানবতাবোধ আমার পোষায় না কোনোকালে, তাই ভাঙা গলায় চেঁচিয়েই চলেছি—রাজ্যের হাতে আরো ক্ষমতা দাও, যেহেতু রাজ্যের হাতে ক্ষমতার সত্যি দরকার, আর হ্যাঁ, আমি সমর্থন করছি তিয়েন আন মেনে গুলিচালনা, মৃত্যুদণ্ড জারি করছি সোলঝেনিৎসিন বা বিক্রম শেঠদের...দুঃখিত, হুমকি হয়ে যাচ্ছে, আসলে আলুর রাজনীতি আমি ঠিক ধরতেই পারি না, আপনিও পারেন না আমাকে, তবু এই সন্ধ্যায় আমরাই তো মুখোমুখি, চুম্বকমেরুর দুই সুদূরপ্রান্ত থেকে হেঁটে আসতে আসতে এখন সহসা এক নিউট্রাল পরিমণ্ডলে, আপনার রাজনীতি কিস্যু হয় না, আমার কবিতাও—হায়—কিস্যু হয় না, কফির টেবিল থেকে নিঘৃঘিন্নে বৃহন্নলা হেঁকে বলে, 'অপাঠ্য এসব', চনমনে তরুণরা ভদ্রতা করে বলে—আরো লেখো, মন দিয়ে লেখো। বলে—হচ্ছে না হচ্ছে না হচ্ছে না...

নাইবা হল। ভ্রূণ আজো বেড়ে ওঠে মায়ের গর্ভেই। সূর্য আজও উষ্ণতা-আকর। গাছের পাতায় থাকে ক্লোরোফিল, থাকে সালোকসংশ্লেষ। খিদে পেলে খেতে হয়, নৌকো জলেই চলে, বিমান আকাশে। আর, আমার জন্ম হয়েছে ভালোবাসার জন্য, সারল্যের জন্য, বিচারের জন্য। কুটচালির জন্য নয়। সেই আমিই সাতাশ বছরে পা দিতে যাচ্ছি কোনো মেয়ের ভালোবাসা ছাড়াই, আর আলভারো গুয়েভারা, আপনার মৃত্যুর পর অনতিক্রান্ত অর্ধশতক। আমরা বরং সেই মহাদেশে চলে যাই, লোকে যাকে বাঙানদী বলে।

চীনে প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থানের সময় পরিমার্জিত।•

[আলভাবো গুয়েভারা ছিলেন চিলি-র এক শিল্পী, থাকতেন ফ্রান্সের পারি শহবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেব কিছুদিন আগে পাবলো নেরুদাকে একবার তিনি ডেকে পাঠান। পাবলো এলে তাঁকে একটি নাটক পড়তে দেন এবং বলেন ফ্যাসিবাদবিরোধী সভাসমিতি জাতীয় 'বাজে কাজ' এখনই বন্ধ করা দবকার। বিস্মিত পাবলো নেরুদা নাটকটির বিষয় জানতে চাইলে বলেন—'কলম্বাসেব ডিম—দেখলে যা মনে হয় তা নয়—অতি সহজেই ভাঙা যায়। ধর, তুমি আজ যদি একটা আলুব চারা লাগাও তা থেকে অন্তত চার-পাঁচটা আলু হবে. অর্থাৎ বিশ্বের লক্ষ-কোটি লোক যদি লক্ষ-কোটি আলুর চারা লাগায় তাহলে তার চার-পাঁচ গুণ আলু তৈরি হবে। তাহলে মানুষেব ক্ষুধা বা অভাব কোথায় রইল।'—এই বিবরণ জানিয়ে নেরুদা লিখছেন—'যেদিন নাৎসিবাহিনী পাবি শহবে এসে ঢুকল সেদিন তারা কলম্বাসের ডিমের খোঁজ করেনি। আলভারোকে সেই শীতেব বাত্রে বন্দীশিবিরে পাঠানো হল, তাঁর শরীরের নানান জায়গায় উল্কি দিয়ে বন্দী নম্বর

লেখা হল। যুদ্ধশেষে শীর্ণকায় মৃতপ্রায় আলভারো বন্দীশিবির থেকে বেরিয়ে শেষবারের মতো একবার চিলিতে এসেছিলেন। তাবপর স্বদেশকে শেষ অক্ষম চুম্বন জানিয়ে যেদিন ফ্রান্সে ফিরে গেলেন তার কয়েকদিন পরেই তাঁর মৃত্যু হয়।'
'হে প্রিয় বন্ধু চিলির গুয়েভারা—তোমার জোটনিরপেক্ষ আলুর রাজনীতি নাৎসি শিবিরের বন্দীদশা বা মৃত্যু থেকে তোমার বাঁচাতে পারল না।' (মেমোয়ার্স)]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রদ্ধাস্পদেষু...

আমার কাঁধের উপর
থাকুক তোমার ভার
আমি হাঁটতে থাকি

আকাশবাতাস যার
যে পার হবে কান্তার
সে তো আমার মধ্যে

বকুল ঝরে ঝরুক,
আমি হাঁটতে থাকি...

ফুলবাড়ি

মাইল মাইল রেলকোয়ার্টার্স, পেরিয়ে এসেছি, নাগকেশরের
হারানো বৃক্ষ আমরা এখানে খুঁজতে এসেছি, কখন সময়
প্রস্ফুটনের, স্টেপনি-কভারে কে লিখে রেখেছে
কবিতার কথা : 'অবাক্ পৃথিবী'?

কখন সময় প্রস্ফুটনের, কোথায় সে গাছ, শৈশব থেকে
প্রোথিত শিকড়, ডালাপালা আর ওগো ফুল তুমি কোথায় রয়েছ,
সন্ধ্যার এই বোরখা হঠাৎ ছিঁড়ে ফেলে দিল হ্যাজাক লাইট,
ঘাঘরার লঘু ঢেউ তুলে কোনো মদেশিয়া মেয়ে সহসা জুয়ার
চাকতির দিকে ভেসে যেতে গিয়ে অচেনা চাহনি রাখতেই বলি :
তুমি কি বলবে কোথায় আমার হারানো বৃক্ষ,
কোথায় আমার বরাকপাড়ের নষ্টচন্দ্র কিংবা কোথায়
মহানন্দার হাপুস হুপুস?'

মেয়েটি শোনেনি। কেননা তখন জাতি সড়কের এত নীচু দিয়ে
মাইল মাইল জুয়ার চাকতি, ঘাঘরা চমকে দুলে ওঠে নাভি,
আদমসুমারি শোনেনি তাদের সাপ-আপেলের প্রণয়কাহিনী
আর সেই মেয়ে কৌমারহর চাকতির পায়ে হপ্তার টাকা
ছুঁড়ে দিয়ে আসে, তার চোখে কোনো শৈশব নেই, যৌবন নেই,
জাতি সড়কের এত নীচুতেও লজ্জার কোনো অরুণিমা নেই,
সেই বিষণ্ণ মুখশ্রী দেখি, ফুরায় সন্ধ্যা,
রাত্রির চোখ...অবাক পৃথিবী...মাইল মাইল...

সাতাশতম জন্মদিন

কথা শোন্, বছরে তো একবারই পদধূলি দিস, এখানে অনেককিছু ঘটে যায় খবর রাখিস না। এইতো ক'দিন পরে শাদা হতে শুরু করবে চুল। এ সময়ে কোনো-কোনো পথ সহসা মসৃণ হয়ে যায়। পা দুখানা সেই রাজপথ ছাড়া আর হাঁটবেই না ঠিক করে ফেলে। এরকমই হয়ে থাকে ইতরজীবনে, কী লাভ সেজন্য বকে বল্? এ সময়ে সাহস শিথিল হয়ে পড়ে। মানি বা না-মানি ঘুণ কাজ করে অস্থি-পাঁজরে। হাড় খায়, মজ্জা খায়, বুদ্ধি ও বিবেক খায় তারা। বলে, আমার উপর নাকি ভুবনের কোনো ভার নেই। কোনো ভার নেই? বোকার মতন তবে এতদিন ভাবতাম, আমারও কপালে আছে আলো! বেশ তাই। না হয় কাউকে আর কিচ্ছু বলব না। চুপচাপ বসে থাকব তোর জন্য, গাছ থেকে একে-একে ঝরে যাবে পাতা। আর, কোনোবার তুই এলে সন্তানেরা ভুরু তুলে সাহেবী কেতায় খুব বিস্ময় দেখাবে। কী করবি সে বছর? ফিরে যাবি, আসবি না আর?

বাগি

এই যে আমার পায়ের নীচে পড়ে আছে হাড় ও করোটির জঙ্গল, এই যে আছে শ্যাওলাধরা কোটর, তা থেকে বেরিয়ে আসা লক্‌লকে জিভ, এই যে আমার পিঠময় ছোবলের দাগ, নীল হয়ে ওঠা ঠোঁট—একেই তুমি রুচি বল, সংস্কৃতি বল। আর, এই যে আশৈশব একফোঁটা জলের মধ্য দিয়ে বর্ণালী দেখতে দেখতে এতদিনে আমি বুঝলাম, জল নয়, কঠিন বরফ—প্রিজম্, যা আসলে স্পষ্ট করে বাণিয়াসহকলা, অর্থাৎ লুকিয়ে রাখা মুখগুলো, কঙ্কালের দাঁতগুলো, আর যেজন্য আমার মাথায় দাহ, পিছনে হুলিয়া, হাতে কালাশ্‌নিকভ্, একে তুমি কী বলবে সুশীল পাঠক?

জানি, মুখ ফেরানো ছাড়া আর কিছুই তোমার করার নেই। জানি, ঘর ছাড়তে তোমার ভয় করে, সামাজিক কেচ্ছায় তোমার ভয় করে, বেহড়ের অন্ধকার তুমি ভাবতে পারোনা। নিরেট নির্বোধের মতো আজো তুমি স্বপ্নে দেখ বুদ্ধিদীপ্ত কথা আর ভিনটেজ গান, আর লাভের কাণাকড়িটিও যদি চেটে যায় প্রতিযোগী অন্য পিঁপড়ে, তোমার বিভক্ত জিভে বিষ লাগে। বুঝতে পারনা, আসলে তুমি ধুঁকে হাঁটছ। বুঝতে পারনা, খোলশ ভিন্ন এযাবৎ তুমি কিছুই ছাড়নি। আমার কাটা আঙুল, ভাঙা পাঁজর, থ্যাঁৎলানো বিচি—তা তোমাকে সপ্তাহান্তে অপরাধী করে। অর্থাৎ বিবেক ও [illegible]কর্মের মধ্যে কোনো সীমাই তুমি অবশিষ্ট রাখনি।

তবু, মধ্যরাতের কোম্বিং ও সার্চলাইট এড়িয়ে তোমার জনাই আমি বাঁচি। একটার পর একটা ডেরা বদলাতে বদলাতে তোমার জনাই আমি অপেক্ষা করি। অ্যামবুশ ও এনকাউন্টারের পরম্পরার মধ্যে তোমাকেই মনে মনে খুঁজি। তোমার জনাই আমি বাগি। কবে তোমার শীতঘুম ভাঙবে? কবে নিশুতি রাত্তিরে তুমি জেগে উঠবে আচমকা? কবে বুঝবে, যাবে তুমি বাঁচা বল তা আসলে থুতু ও ঘেন্না। যাকে তুমি বাঁচা বল তা দেখে অন্তিম রাতে হেসে ওঠে মাতাল বেশ্যারা। তারা ঘোরে আর ঘোরে আর ঐ দেখো সুর করে বলে,

আহা বাঁচা বাহা বাঁচা দিনমান ঘুমন্ত পৃথিবী..

'ভারত এক খোঁজ'

বিশেষ কারণে এত বছর পর আমি অযোধ্যা এলাম, মাননীয় বিচারক,
এলাম আমার মায়ের জন্মভূমি খুঁজতে।
না, আমার কী ধর্ম আমি জানিনা,
জানিনা আমার বাবা কে,
আমার মা-ও জানত না এসব।

আমার মা—মুন্নাবাঈ, জন্মেছিল এখানেই এক ঝোপড়ায়,
কোন্ পুরুষের ঔরসে তার জন্ম তা ঠাহর করে
বলতে পারেনি আমার দাদীও, সেক্ষেত্রে জাতপাতের কথা তো ওঠেই না,
মা শুধু জানত কে তার মা, মাননীয় বিচারক,
একে মাতৃতান্ত্রিক পরিবার বলা যায় কিনা ভেবে দেখবেন,
যদিও পরিবার শব্দটার অর্থই আমার কাছে পরিষ্কার না।

বরং শুনুন, বালক বয়সে বিনা টিকিটে ট্রেনে চড়ে বসার আগে
কী আমি দেখেছিলাম?

ভালো মনে নেই আমার, তবু সেই জলহীন, আলোহীন,
পয়ঃপ্রণালীহীন ঘুপচি ঝোপড়া,
ভিখিরি, জোচ্চোর, দাগি, মাতাল...আর
কোনো কোনো মধ্যরাতে আচমকা হুইশ্‌ল...
ঘরে ঢুকে পড়ত পেটমোটা উন্মত্ত থানেদার...
মুখে মদের গন্ধ...পান খাওয়া কুৎসিত হাসি...
মা আমাকে ঠেলে বার করে দিত—সেই রাত,
সেই অসংখ্য নক্ষত্রের রাত, সোনালি হ্যালোজেনের রাত
আমি কাটিয়ে দিতাম রাস্তার পাশে দেয়ালে ঠেস্‌ দিয়ে,
অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারতাম
ঠিক কতদিন পর থেকে মা আবার শুরু করবে বমি...

বাস্‌, এইতো সব। অযোধ্যা ছেড়ে আসার পর আমি কী কী করি
তা এখানে প্রাসঙ্গিক নয়। মাননীয় বিচারক,
আমি শুধু শুনেছিলাম, যৌবন থাকতে থাকতেই ঝোপড়া থেকে দালান,
তা থেকে শীষ্‌মহাল পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছিল আমার মা।
তারপর, জীবনের লাথ্‌ খেতে খেতে সেই ঝোপড়ায়
ফিরেই সে মরে।

চোখ ঝাপ্‌সা হয়ে ওঠার জন্য মাফ করবেন,
কিন্তু এতবছর পর মায়ের জন্মভূমি খুঁজতে এসে
কী আমি দেখলাম?
কেউ বলছে—এখানে জন্মেছিলেন তাদের এক পৌরাণিক রাজা।
কেউ বলছে—এখানে এসেছিলেন মধ্যপ্রাচ্য থেকে তাড়া খাওয়া এক বাদশা।
আমি জানিনা পৌরাণিক কোনো চরিত্রের পক্ষে
জন্ম নেওয়া আদৌ সম্ভব কিনা, আমি জানিনা অতদিন আগে আসা
কোনো সেনানীর পদচ্ছাপ এতটাই নিশ্চিত কিনা,
কিন্তু, আমি জানি আমার মা এখানে জন্মেছিল—এখানেই,
কেননা, আমিও যে জন্মেছি এখানে।

আমার রোজ কিয়ামতের ভয় নেই, আখেরাতের লোভ নেই,
মন্দার বা অমৃত আমাকে আকৃষ্ট করেনা,
শুধু এই ঝোপড়ার জন্য—এই জন্মভূমির জন্য আমার রোজা—আমার উপবাস
অষ্টপ্রহর প্রার্থনা—পাঁচওয়ক্ত নমাজ,

মাননীয় বিচারক,
রহম্‌ করুন, আমার মাতৃভূমি আমায় ফিরিয়ে দিন।

ফিরিয়ে দিন আমি মরিয়া হয়ে ওঠবার আগেই।

দীপাবলি

হে রাত্রিভেজা ঘাস, হে জলের নীচে প্রাণ,
হে পালক থরোথরো, হে বালির কংকাল,
হে গাছের ডালে মাছ আর মাছের চোখে হীরা,
সমুদ্রনীল ওষ্ঠ আর হে বিষাক্ত ভাষা,
হে দিগন্ত অবধি, হে মুকুটহীন দেশ,
হে প্রেমের মধ্যে ছুরি আর ছুরিব মধ্যে প্রেম,

তোমরা কি দেখছ না, আমি দাহহীন-সিঞ্চনহীন
কতদিন শূন্য হয়ে আছি?

২

যন্ত্র ও ক্ষুধার মধ্যে যারা ম্যাপ খুলে বোঝাচ্ছিল :
পায়ে ধরে সাধা, রা নাহি দেয়...
'রা' মানে তো সূর্য, সূর্য ওরা স্বেচ্ছায় দেবে না।
যারা স্বপ্ন দেখছিল সূর্য কেড়ে আনবার, যারা ফন্দি আঁটছিল,
কীভাবে ভৃত্যের মতো ছাঁটা চুলে ঢুকে পড়তে হবে,
কীভাবে এগিযে দিতে হবে গ্লাস,
কীভাবে পা টিপতে হবে, হতে হবে মিসিবাবার ঘোড়া,
তারপর একরাতে শুন-শান কীভাবে সিন্দুক খুলে
সূর্য নিয়ে সট্‌কান মারতে হবে, যদি কেউ দেখে ফ্যাসে
কীভাবে মারতে হবে ঘেঁটিবরাবর দাউয়ার কোপ,
মায়া করলে চলবে না, কীভাবে নিষ্ঠুর চোখে...

আমি তাদের অসহ্য প্রেমে পড়ে আছি ছোট্টবেলা থেকে।

বালকবয়স থেকে আমি তাদের প্রণয়ে,
যারা সূর্য কেড়ে আনবে তাদের চোখের দিকে চেয়ে

দিওয়ানা হয়ে গেছি, হয়ে গেছি ব্লেড দিয়ে শিরাকাটা নির্বোধ প্রেমিক,
সবাই আমাকে দুয়ো দেয় এ-জন্য, জ্ঞান দেয়, বলে : ভাই, একটু কম,
একটু কম জঙ্গিপনা করো।
বলে : ভদ্রতা জানো না ছেলে, তুমি তো দেখছি
রাস্তায় কোনোদিন মার খেয়ে পড়ে থাকবে,
টাল খেয়ে পড়ে থাকবে, কেউ বাঁচাবে না,
পার্টিফার্টি দ্যাখা আছে, কেউ আসবে না।

সে-সব মন্টেগুদের কথা, সে-সব ক্যাপিউলেটদের...

৩

আশা ও নিরাশাহীন, দাহ বা সিঞ্চনহীন আমি দেখি
পাতার শিরায় ছুটে যাচ্ছে স্রোত, আকাশে মেঘের কোনো চিহ্ন নেই,
লুব্ধক-অরুন্ধতী-কালপুরুষের বেল্ট আমার চোখের মধ্যে
চোখের মণির মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে, আমি দেখতে পাচ্ছি না কিছু,
ভেসে উঠছি ক্রমশই, আমার সুখ হচ্ছে না দুঃখ হচ্ছে না,
শূন্যতার মধ্যে কোনো ঢেউ নেই, শিরশিরানি আছে,
তিরতিরে ঈথারে যেন ভেসে যাচ্ছে পারস্য-গালিচা, আর বহু নীচে
আরব্যরজনীর আলো, সায়লেন্ট নাইট, স্যাটারডে নাইট ফিভার...
কলেজে ঢোকার পর আমার ট্র্যাভোল্টা কাট্, আর গলা থেকে
রুদ্রাক্ষ ছিঁড়েছিল আমারই কমরেড,
আমি সেইদিন রাগ করি, পরদিনই জড়িয়ে ধরেছি, তারপর লেনিন পড়লাম।

শুন্যতার মধ্যে কোনো সৃষ্টি নেই, সম্ভাবনা নেই,
বিনাশরহস্য নেই, প্রেম নেই, ছাড়াছাড়ি নেই,
কিছুই চাই না আমি, কাউকে না, কিচ্ছু না,
আমার রাগ নেই, অভিমান নেই, ফিচলোমি নেই,
অসহায়ভাবে ভালোবেসে অসুখবিসুখ নেই,
আমি কতদিন এইভাবে শূন্যতার মধ্যে শুধু ভেসে আছি,
অপেক্ষা করছি না, যেহেতু দেখতে পাচ্ছি কীভাবে সময়দণ্ড
ছুঁয়ে যায় ঘটনাশীর্ষকে, কথাও বলছি না আমি,
অথবা বলছি কিন্তু কেউ শুনতে পাচ্ছে না।

আমি যাদের প্রেমে হলাম সবার কলঙ্কভাগী,
সাতাশ কুকুরের মাংস ছুঁড়ে দিলাম,
খণ্ড-খণ্ড কেটে ছুঁড়ে দিলাম অন্য কুত্তাদের পাত্রে,
আমি যাদের প্রেমে ধান্দা হারিয়ে, কানখোঁচানি হারিয়ে
অবশেষে নিজেকেও চিনতে শিখলাম,
আমি যাদের প্রেমে কপালে দাগলাম চিহ্ন, বাহুতে আঁকলাম উল্কি,
তারা কি আমায় তুলে আনবে এই প্রত্যাখান থেকে,
কিছুই না-চাওয়া থেকে, এই নির্বাণ থেকে
তারা কি আবার আমার মাথা ও পায়ের কাঠি বদলে দেবে...

হে বিপর্যস্ত ভাষা, হে মহাজগতের ঘূর্ণন,
হে ছায়াপথ, হে নিরাসক্তি,
হে, রাত্রিপৃথিবীর গান আর গান-গাওয়া সেই মেয়ে,
হে জীবনবেষ্টিত মৃত্যু আর মৃত্যুর নাকে নথ,
হে সত্য, হে সত্যকাম, হে নৌকার লণ্ঠন,

তারা কি জাগিয়ে তুলবে পুনর্বার?

স্বর্গপথে

তুমি কি খুব লক্ষ্মী মেয়ে? দেখতে পাচ্ছ,
এতদিনের আকাশ ঢেকে ছাদ,
কেউ থাকে না এই বাড়িতে, ডাকবাক্সে পড়ে
ফিতেয় মোড়া মৃত্যুসংবাদ।

শুয়েছিলাম আড়ষ্ট, কে জানে কতদিন,
হঠাৎ আজ তন্দ্রা ভেঙে যেতে
দেখতে পেলাম, লক্ষ্মী মেয়ে, ঘরভর্তি মেঘ,
জ্বর আসছে, অজানা সঙ্কেতে।

আমি কি তাও উঠতে পারব? পারব না কি?
দ্বিতীয় সেই পৃথিবীময় শীত;

এর বেশি কী বলব বলো, কেমন মেয়ে তুমি,
বুঝতে যদি না পারো ইঙ্গিত!

তুমি কি খুব দুঃখী মেয়ে? দেখতে পাচ্ছ,
মোচড় দিয়ে ভাঙা আমার ডানা,
ওড়ার তবু চেষ্টা করছি, আসবে তুমি? আসতে পারবে?
আমার সাথে ওড়া কিন্তু মানা।

জয়দেব বসুকে সফদর হাশমির চিঠি

যে দেশে থাক সেখানে কেন এত
কুয়াশা হয়, লিখেছ তার কারণ।
লিখেছ, কেন জলের ফোঁটা গায়ে
পড়লে হয় আগুনবিক্রিয়া।
ফলে এবার হিরণ্ময় শীত
নষ্ট হল কারণহীন কাজে।

লিখেছ, কেন নিন্দুকের জিভ
বিষলালায় সিক্ত হয়ে থাকে।
কীভাবে, পথে বেরিয়ে এলে, ঘুম
অতর্কিতে কামড়ে ধরে পা।
ফলে এবার কাজপাগল শীত
নষ্ট হল মনের পক্ষাঘাতে।

ঠোঁটের পাতা অল্প মেলে যে
তৈরি করে নগর-মহানগর,
সান্ত্রী যার প্রতিটি ইন্দ্রিয়,
কেমন আছে শরীর-মন তার—

লেখনি কিছু তেমন ইতিহাস,
লেখনি, কোনো মানুষ আছে কিনা।

সায়োনারা

আমি ঠিকভাবেই হেসেছিলাম সম্ভবত, আমি ঠিকভাবেই
জানিয়েছিলাম বিদায়। তারপর,
ঝাঁকড়াচুলে দশ আঙুলে ডুবিয়ে দিয়ে
সটান ফিরে দাঁড়িয়েছিলাম ঘর-গোরস্তানের দিকে,
দেখেছিলাম, সূর্য ফিরে যাচ্ছে আস্তানায়,
আর্মানি গির্জার ঘড়িতে ঢং-ঢং পাঁচটা বেজেছিল।

তখনই, অলৌকিক চিৎকার করে হেসে উঠল একটি মেয়ে,
গায়ে কালো আঙরাখা আর পিছনে নাইকোমিডিয়ার আগুন,
তার চোখ থেকে দর্‌-দর্‌ করে ঝরে পড়ল রক্ত,
দেখতে দেখতে চুল উঠে গিয়ে বেরিয়ে পড়ল টাক,
ফের গজাল চুল, কিন্তু সব শাদা, কুঁচকে গেল মুখের চামড়া,
উঠে গেল ভুরু, আর ধূসর রঙের উল বুনতে বুনতে
আমার দিকে ফিরে সে কেঁদে উঠল ফুঁপিয়ে।
অতিথি ফিরে যাওয়ার পর প্রতিবারই এরকম হয়।

ক্লান্ত পায়ে আমি চেয়ারে ফিরে এলাম।
পাশে ভেঙে পড়া ফলকের উপর রাখা বাংলার পাঁইট,
ভুলে ফেলে যাওয়া নেলকাটার,
পাখির গুয়ের উপর একগোছা অবসন্ন বিবন...
পা ছড়িয়ে চোখ বন্ধ করতেই দেখলাম—অন্ধকার,
হ্রদের উপর শ্যাওলাধরা কুয়াশা, তার মধ্যে
মেহগনি কাঠের কফিন নিয়ে ভেসে আসছে স্বপ্নোত্থিত ক্যানো,
গলুইয়ে বসে একটি বামন ছড় টানছে ভায়োলিনে...সেই সুর
ক্রমাগত আমার মগজে গেঁথে দিচ্ছে
একটা একটা করে প্রশ্নচিহ্ন, একেকটা গজাল্‌...,

চোখ খুললাম—এপিটাফগুলি মুছে দিয়ে নামছে সন্ধ্যা,
অস্পষ্ট কোটর থেকে উঁকি মারছে প্যাঁচা,
সমাধির গায়ে-গায়ে কে যেন লটকে গেছে
হাঙ্কেরি সফররত পিক বোথার ছবি।

খুঁটে খাওয়া পাখি ছাড়া আর কেউ এখানে আসে না।
যখন ইমাম ও মোহান্তর স্মৃতিসৌধে ফুল দিতে আসে

শহরের গুঁছা বেশ্যারা,
বেশ্যাদের সৌধে ফুল দিতে আসেন কার্ডিনাল ইনকুইজিটর,
কার্ডিনালের সৌধে ফুল দিতে আসে হিজড়েরা,
যখন গান গাওয়া পাখিরা নিষিদ্ধ,
যখন দেওয়াল জুড়ে স্বস্তিক, ত্রিশূল আর বাঁকা চাঁদ...

যখন মধ্যরাতে দপ করে জ্বলে ওঠে আলো, আর
সমকামীদের ঘুম ভাঙে,
দেখা যায় কে যেন পুড়ে যাচ্ছে দাউ-দাউ আর
ছুটে যাচ্ছে ইতস্তত—দিগ্বিদিকহীন,
গোরস্তান জুড়ে কেউ কথা বলছে ফিস্ফিস্ করে,
কী কথা বোঝা যায় না, শোনা যায় কথা বলছে কেউ...

যখন কবর ছেড়ে মৃতরা উঠে আসতে শুরু করে,
শুরু হয় নাচ...
উঠে আসে প্রেতযোনির সন্ত ও দার্শনিকদল—শুরু হয় নাচ,
উঠে আসে তির্যগ্‌যোনির আমলারা—শুরু হয় নাচ,
উঠে আসে বেনেদের চতুর আত্মা—শুরু হয় নাচ,
উঠে আসে 'মুক্তবোধ' লেখক আর 'পুনর্গঠিত' পাঠক—
শুরু হয় নাচ...
সে রাতে বৃষ্টি হয় না, শুধু অবিশ্রাম ঝরতে থাকে
নুনে জারানো হৃৎপিণ্ড, ম্যানিকিওরড্ নখ, ফাটকার শেয়ার,
শালগ্রাম শিলা, সোনার গয়না, পবিত্র ক্রস ও কনডোম্,
আর আকাশ জুড়ে সেইমাত্র শুরু হয় টেরোড্যাকটিলের হানা,
মন্থর পাখসাটে তারা নেমে আসতে থাকে উন্নয়নশীল পৃথিবীতে.

নিস্পৃহ চোখে আমি এসব বেলেল্লা
লক্ষ করে ডাকি—'হাওয়া, এসো'।
হাওয়া আসে। হাড়-পাঁজরায় হু-হু করে ওঠে শীত, আর
বধির মহিলা সংগঠনের দরজায় মস্ত এক মথ এসে বসে,
রোমশ শুঁড় দিয়ে সে টেনে আনতে থাকে
শুকনো রোগা সব মেয়েদের স্বপ্ন আর স্বপ্নভঙ্গের ডায়েরি।
তখনই, অতিদূর পূষা নক্ষত্র থেকে ঝরে পড়তে শুরু করে
এক ফোঁটা অ্যামিনো অ্যাসিড,
নিঃশব্দে সেই অশ্রুফোঁটা পেরিয়ে আসে বিভিন্ন বায়ুস্তর,
আমার চোখ ডুবে যায় ঘুমে।

ঐরাবত, ধন্বন্তরি ও কালকূট উঠে আসার পর
শেষবার শিউরে ওঠে মন্দার...

কেউ কি আগামীকালও আসবে?
ঘুমের মধ্যে সেই জন্ম—সেই অশ্রুপতনের অপেক্ষায়
আশা করি—আবার আমি উঠে দাঁড়াতে পারব,
যেভাবেই হোক ঘুরিয়ে দেখাতে পারব মাতৃভূমি,
হাত থেকে হাতে পৌঁছে দিতে পারব ভবিষ্যৎ,
দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে হাসতে পারব ঠিকভাবে,
হাসতে হাসতেই চোখ থেকে গড়িয়ে নামবে রক্ত,
আমি হাত নাড়ব,
হাত নাড়ব :
সায়োনারা...

নিজেকে দেখুন

১

হাই তোলার আগের মুহূর্তে তোমার শরীর যেভাবে ফুলে ওঠে,
আমি চলে আসার আগের দিন থেকেই যেভাবে তোমার কথা কমে যায়,
বেলা যতই এগিয়ে আসে তুমি যেভাবে ঠোঁট কামড়াতে থাক,
আমি বুঝতে পারি এ সমস্তই কান্নার ভূমিকা;
কিংবা যখন তুমি গান গাও, চোখ বুজে, হাঁটু দুটো জড়ো করে,
মুখটা ঈষৎ তুলে, যা দেখে আমি ধরতে পেরেছিলাম
সঙ-অফারিঙস্ নামটার অর্থ—এইসব দৃশ্য আর
মনোভূমি জুড়ে উথালপাথাল—কখনই আমি তার যথাযথ বর্ণনা
দিতে পারি না।

অথচ, সেটাই আমার প্রাথমিক কাজ ছিল।
এখনো আমি আধুনিক কবিতা লিখতে পারি না, ব্যবহার করি
'মনোভূমি' বা 'উথালপাথাল' জাতীয় শব্দ, সে সব পরে কা কথা,
এখনো আমি যা ভাবি তা বলতে পারি না, লিখতে পারি না
তোমার চোখে প্রথম চোখ পড়তেই কীভাবে আমি পুড়ে গেছিলাম,
লিখতে পারি না—এখনো আমি বেকার; অবশ্য তৃতীয় বিশ্বে

বেকারি কোনো আহামরি অপরাধ নয়, এ নিয়ে কাঁদুনির
কোনো অর্থই হয় না, এদিকে প্রতিদিন, প্রায় প্রতিদিন
মনের মতো একটা প্যান্ট বানাতে না পারার অক্ষমতা—
রিটায়ার্ড বাবাকে দুবেলা বাজারঘাট করতে দেখার ক্ষমতা—
এসব সহ্য করতে করতে টের পাই হাড়ে আমার দুব্বো গজিয়ে যাচ্ছে,
আঠাশ বছর বয়সেও ব্যাঙ্কে আমার কোনো অ্যাকাউন্ট নেই,
অথচ দেশ ভরে রয়েছে গণতন্ত্র;
উঃ, এত গণতন্ত্র নিয়ে যে কী করি...!

২

কী লিখব? লিখলে নতুন কথা লিখতে হয়,
অথচ আমার অনভ্যস্ত হাতে আড় ভাঙে না।
লিখতে হয়, মানুষ মরণশীল জেনেও আমি বেঁচে থাকতে চাই,
বেশির ভাগ লোক বেকার জেনেও আমি চাকরি পেতে চাই,
না পেলে টুঁটি ছিঁড়ে ফেলতে চাই সার্ভিস কমিশনের
চেয়ারম্যান থেকে কনিষ্ঠ কেরানি পর্যন্ত সক্কলের,
আঁচড়ে-কামড়ে তুলে আনতে চাই গোটা ব্যবস্থাটারই নুনছাল,
যাদের নাম করছি না—চাই তাদের একধারসে চাবকাতে।
লিখতে গেলে, গোসাবার রাস্তা, লাভপুরের ডবল লাইন, দমদমের জল;
লিখতে গেলে, শাদা বড়লোকদের পূর্ব ইউরোপ নিয়ে কথাটি নয়,
কালো-হলুদ-বাদামী গরিবদের ওতে ছেঁড়া যায়।

লিখতে গেলে এইসব।
লিখতে গেলে, মেজোমামার কথা—
দু-দুবার পাগলাগারদ থেকে ফিরে এসে কীভাবে এখন
নোংরা কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকে,
পাশের বাড়ির বউ বাথরুমে গেলে কীভাবে উঁকি মারতে গিয়ে
চোরের অধম মার খায়, কীভাবে সারা রাত্রি
চা বানায় আর ঘোরে   চা বানায় আর ঘোরে...
যখন ছিল স্কুলফিরতি মেয়েটির হাতে চিঠি গুঁজে দেওয়ার বয়স
তখন আমাদেরই বাড়ি থেকে কীভাবে ওকে তুলে নিয়ে গেছিল
কংগ্রেসীরা,
তাদেরই একজনের দোকানে এখন আমি র‍্যাশন আনতে যাই,
দাঁত কেলিয়ে কথা বলি, অথচ ঐ শূয়োরের বাচ্চাটাই
মামার ঘাড়ের কাছে ক্ষুর ধরেছিল, আর
মামা পাগল হয়ে যাচ্ছিল,

বিচিতে লাথ্ মারছিল, আর
মামা পাগল হয়ে যাচ্ছিল...

কোনোদিন, আমি কোনোদিন সেসব কথা লিখতে পারিনি।

৩
অথচ, সেটাই আমার প্রাথমিক কাজ ছিল।
প্রয়োজন ছিল ভাষাপ্রেম, আধুনিকতা, পেরেস্ত্রৈকা কিংবা
লিটল ম্যাগ নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে,
এর চিমটির জবাব, ওর কাঠির উত্তর, তার বেলেল্লায় প্রতিবাদ
আর কবিদের সেই অসহনীয় আড্ডাকে কিয়ৎক্ষণ বেহেশ্‌তে পাঠিয়ে
খুঁটে খুঁটে তালিকা প্রস্তুত করা।
কারা মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তা নিজের দরজা অব্দি টেনে নিয়ে যায়?
কারা নিজের উঠোনে বসায় সরকারি কল?
কারা ব্যাঙ্কের ধার শোধ দেয় না? জমির দালালি করে কারা?
কারা ঝোলায় লক-আউটের তালা? কারাই বা কাগজে চিঠি লেখে?
কারা বলে 'গণতান্ত্রিক সমাজবাদ' আর 'পরিবর্তিত পরিস্থিতি'...

পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আমি একবার মোটা হয়েছি,
তারপর রোগা হয়েছি, ফের এখন গত্তি লাগছে গায়ে;
এর দাওয়াতে, ওর ভোজে ক্রমাগত চক্কর খেয়েছি,
আমাকে ঘিরে গজিয়ে উঠেছে অসাধারণ সব সমস্যা,
অর্থাৎ, 'দেশ' পত্রিকায় লিখব কি না, পার্টিতে আর কদ্দিন আছি,
কে আমার প্রোমোটর—শঙ্খবাবু না সুনীল গাঙ্গুলি,
সোমবার আমায় এ মেয়ের সঙ্গে তো মঙ্গলবার ভিন্ন মেয়ের সঙ্গে...
সারাগায়ে এইসব 'সাহিত্যিক' সমস্যার থিকথিকে কাদা থেকে
পোকা বাছতে-বাছতেই বাবার চাকরি শেষ হয়ে গেল,
ভাই পৌঁছে গেল কলেজের দোরগোড়ায়,
আর কপি লিখতে লিখতে—নয়াদিল্লি-ডারবান-উইগুহোয়েকের
কপি লিখতে লিখতেই আমি ভুলে যেতে থাকলাম
মানুষের কটা কান, কটা চোখ, কীভাবে সে কথা বলে, কীভাবে সে হাসে,
ভুলে গেলাম শব্দেরও থাকে রং ও গন্ধ,
শব্দেরও থাকে রাগ ও কান্না,
শব্দেরও থাকে অমৃতের দিকে গুটিগুটি হেঁটে চলা।

৪

যদি জিগ্যেস কর, এতগুলো বছর তুমি কীভাবে কাটিয়েছ?
বহু কিছু বলতে পারবে জয়; কিন্তু আমি—আমি কী বলব?

বলব, আমি জন্মেছিলাম হৃষ্টপুষ্ট, তারপর বছর-বছর ধরে
ক্রমাগত রোগা হয়েছি, খিদে চেপে থাকতে শিখেছি,
একা-একা ঘুরে বেড়িয়েছি হস্টেলের কার্নিশে,
শুঁকেছি পেয়ারাপাতার গন্ধ, খেয়েছি ক্ষীরকুল,
ভরদুপুরে হাসপাতালের শুনশান ঘরে শিখেছি হস্তমৈথুন,
হাড়জিরজিরে হতে হতে পকেটমারের মতো দেখতে হয়ে গেছি,
কোনোক্রমে পেরিয়ে এসেছি
একটা খরগোশ, একটা কুকুর, একটা ভেড়া আর একটা কাকের সঙ্গে
সম্পর্কের ইতিহাস, আর এই কয়েকদিনমাত্র হল
নিঃশ্বাস ফেলতে পারছি মনের নির্জনে, জানিনা তাও পারব কদ্দিন।

বলব, বন্ধুতার গর্ব করতাম, কবি-বন্ধুরাই আমার পিঠের মাংস
সবচে' তৃপ্তি করে খেয়েছে, এখনো তাদের সক্‌সকানো জিভ
আর দাঁতের ফাঁকে লেগে থাকা মাংসের কুচি;
এছাড়া, আজ চব্বিশে মে উনিশশো নব্বই পর্যন্ত আমি কাঠবেকার,
চাকরির আশাও, সত্যি বলতে, আর করিনা।
এই লজ্জাকর জীবনযাপনের মধ্যেই মানুষজনের সঙ্গে কিছুদিন,
ছ্যাঁকালাগা দুপুরে প্রেসিডেন্সি থেকে সিধো-কানো ডহর পর্যন্ত
মিছিল-স্কোয়াড-মারপিট আর বস্তিতে বস্তিতে নির্বাচনের কাজ,
এছাড়া অকিঞ্চিৎকর কয়েকটা লেখা যার কোনো তাৎপর্য নেই,
অসিতবাবুর 'সংক্ষিপ্ত'-র পাদটীকাও যার কাছে আশাতীত,
যা আমি ভালোবেসেছি আর যা যা করেছি ঘৃণা
তার কোনো যথাযথ বর্ণনা নেই যাতে।

কীভাবে লিখব, ঘুম ভেঙে দেখেছিলাম মেঘ!
দেখেছিলাম, আদিগন্ত বর্ধমান জুড়ে কাটা হচ্ছে বোরোধান,
খালুই হাতে একহাঁটু জলে দাঁড়িয়ে অবাক চোখে বউ-ঝিরা দেখছে ট্রেন,
আমগাছে ঘেরা পুকুরে ভাসছে একজোড়া শাদা চই-চই,
সে যে কী অসম্ভব শাদা, কীভাবে তা লিখতে পারব!

কীভাবে লিখব, গায়ত্রীমন্ত্রের মতো উদ্ভাসিত ভোরে
দাঁত খিঁচিয়ে ঝগড়া করছিল এক বাউল ও বোষ্টোম,
কিছুক্ষণ পর তাদেরই একজন জলদ্‌মন্দ্রে গেয়ে উঠল :
'রাই জাগো গো,
জাগো শ্যামের মনমোহিনী বিনোদিনী রাই...।'

৫
আমি কি লিখব, রাই, তোমায় প্রথম দেখে
কীভাবে আমার চোখ পুড়ে গিয়েছিল,
আমি কি লিখতে পারব সেই জয়পুরি ঘাঘরার যথাযথ বর্ণনা,
সেইসব ক্ষুব্ধ পথ চলার বৃত্তান্ত?

দিনের পর দিন আমি অসহায় চোখে দেখি
দোয়াতের কালি শুকিয়ে হয়ে যাচ্ছে তালমিছরি,
পলির পর পলি জমছে কলমের নিবে, সেখানে
বাসা বাঁধছে হাজার হাজার সমুদ্রকাঁকড়া,
মধ্যরাতের ঢেউয়ে এসে আটকে গেছে জেলিমাছ,
তার থলথলে দেহের উপর দিয়ে দৌড়ে যাচ্ছে নুলিয়ার খোকা,
শুধু যে কটি আশ্চর্য ঝিনুক এসে পড়েছিল, আর
সেই একবার এসেছিল শ্রমণবৈরাগ্যে এক দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ,
সবই আমি তুলে দিয়েছি তোমাদের হাতে
ধন্যবাদ প্রত্যাশা করিনি।

তারপর পলির পর পলি...
তলায় তলায় ঝাঁঝরা করে দেওয়া কুচি কুচি সমুদ্রকাঁকড়া...
অনেকদ্দূর গিয়ে মিলিয়ে যাওয়া দুজোড়া পায়ের ছাপ...
একটি গাঙচিলের স্মৃতি...

একটা ভাঙা ডানা

জীর্ণ পাতা ঝরার বেলায়

সূচি
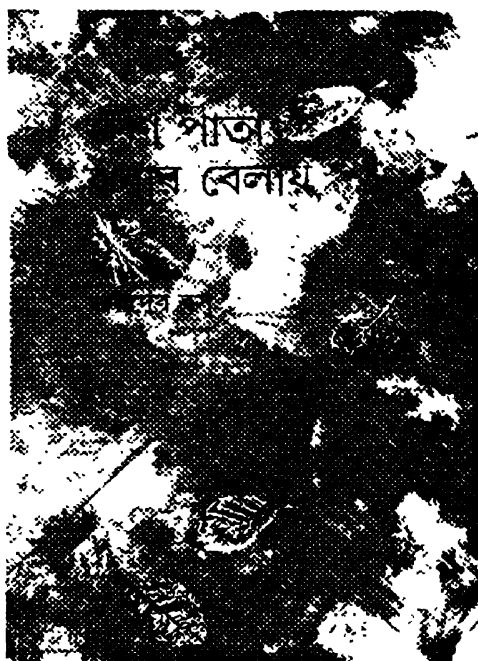
"এ জগতে ইতিহাস রচনার অধিকার একমাত্র বিজয়ী পক্ষের নয়।
নিপীড়িত জনের রচিত ইতিহাসও কোন কোন ক্ষেত্রে মহত্তর হয়ে ওঠে।"

—রুট্‌স্‌, আলেক্স হেলি।

থেরীগাথা

"মুক্তে, মুক্ত হও, রাহুর গ্রাসমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় মুক্ত হও
বিমুক্ত চিত্তে অনৃণা হইয়া স্বীয় প্রাপ্য গ্রহণ করো।"

॥ প্রথম সর্গ : তোরণ ॥

ছিন্ন পদ্মের মত আমার এই হতভাগ্য শরীর, শাস্তা,
এই আমার দগ্ধ চোখ, ভাঙা দাঁত, ফাটা ওষ্ঠাধর,
আমি নিয়ে এসেছি অভিশপ্ত নগ্নতা আর উরুতে বন্ধনচিহ্ন,
অশ্রুর আরক ও ক্লিন্ন দংশনক্ষত...
হে অষ্টপুরুষ আর চারটি যুগ্মবাসী শ্রমণ ও অর্হৎকুল,
নিয়ে এসেছি অলজ্জা, যা কিনা আমগন্ধ,
নিয়ে এসেছি চাবুকের দাগ।
হে থের সারীপুত্ত, মৌদ্গল্যায়ন, আনন্দ ও অনাথপিণ্ডদ,
এই জেতবন—এখানে প্রবেশের পর লুপ্ত হয় বর্ণভেদ,
এখানেই জন্ম নেয় অনাহত ধ্বনি আর নির্বাণের পবিত্র পিটক,
এই সংঘের দরজায় আমি নিয়ে এসেছি সমকাল,
কুমারীত্ব বিদ্ধতার বিবস্ত্রকাহিনী।

তিনটি অন্তরায়, চতুর্বিধ দুর্গতি কিংবা সেই ষট্ অপরাধ
এই ক্ষতি মাপতে পারে না।
প্রাণীহীন জলাশয়ে যেইভাবে কাশী ভারদ্বাজ
নিক্ষেপ করেছিলেন পায়স,
আবদ্ধ কোষ আর নিদ্রিত বিচারের সামনে আমি
সেভাবেই উপস্থিত করছি নিজেকে;
তোরণে আঘাত করে বলছি : হে মাতা গোতমী
যেন প্রতিটি উচ্চারণে উত্থিত হয় হিঙ্কারধ্বনি,
নির্গলিত হয় কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়া,
মুক্ত হয় নরকের প্রতিটি কপাট,
যেন সত্য আবির্ভূত হয়...

॥ দ্বিতীয় সর্গ : অপণা মাংসে হরিণা বৈরী ॥

তখন চতুর্দশী : অর্থাৎ, ভয়ে ও বিস্ময়ে সদ্য দেখেছি ঋতু,
সধবারহস্যকথা কিছুই বুঝি না।

ইস্কুলে যাই-আসি, সন্ধ্যায় পড়তে বসলেই
দু-চোখের পাতা ভেঙে নেমে আসে ঘুম।
তখন জগৎ ছিল পুতুলের বাক্সময়, প্রতি শনিবার আমার পুতুলের সঙ্গে
বন্ধুদের পুতুলের বিবাহপ্রস্তাব। ছিল উনুনের আঁচ,
কড়া-খুন্তি, লেবুর আচার চুরি, মামাতো-খুড়তুতো বোন
দাদা-দিদি মিলে বারান্দার দুই প্রান্তে কাপড় টাঙিয়ে
বাড়ি-বাড়ি খেলা। সেরকমই একদিন...

সেদিন আগুন ছিল মহাব্যোম, গেরুয়া কাঁকরমাটি
তেতেপুড়ে গনগনে চাটু হয়েছিল,
গ্রীষ্মের রাঢ়দেশ ফালা-ফালা করছিল উন্মাদ বাতাস,
কৃষ্ণ-রাধাচূড়া মেশা মোরামের রাস্তা যেন বাউল পোশাক,
তখন কোথাও কেউ নেই, সারা বাড়ি
দুপুরঘুমের নীচে গাঢ়, কী আশ্চর্য, কার্নিশে
নিত্যকার পায়রাগুলো ছিল কিনা মনে পড়ছে না,
আমি লম্বা ঘোমটা টেনে বউ সেজে কুটনো কুটছি...

জাপ্‌টে ধরল কেউ, ও সুগত, আধফোটা স্তনে নখ বসে গেল।
নিতান্ত খেলাচ্ছলে যেন কেউ আঁকড়ে ধরল আর
পরমুহূর্তে ঠোঁট থেকে জিহ্বামূলে পৌঁছে গেল লাভা।
ঘুরে উঠল মাথা, মনে হল পিত্ত যেন উঠে আসবে গলা বেয়ে,
প্রাণপণ ধাক্কায় আমি তাকে সরাতে চাইলাম।
কিন্তু বিফল চেষ্টা, হে অগ্রশ্রাবিকা উৎপলবন্না,
হে অম্বপালী, ইসিদাসী, হে কিসা গোতমী,
সব ব্যর্থ, আমি তো শ্যামলা মেয়ে
আমারও কাগজশাদা মুখ, আতঙ্কে অবশ শরীর, শুধু
কোমরে ভীষণ ভার মনে আছে, মণিবন্ধ আটকানো,
বুকে জ্বালা...উরুসন্ধিময় চাপ...উঃ, মা...
সে যে কী যন্ত্রণা...

কী করতে পারতাম আর? আর্তনাদ? চিৎকার?
তবে তো সবার ঘুম ভেঙে যেত, জড়ো হত লোক।
কী এসে দেখত তারা? কী লজ্জা, কী অপমান—
আকোলাস কন্যা আমি,
উৎসঙ্গ জাতকে শুধু যার প্রাণ প্রার্থনা করেছি,

তারই হাতে ধর্ষিতা...হায়রে মেয়ের জন্ম,
তারই হাতে, নিজের...

আজো মুখে আনতে পারি না সেই নাম।

॥ তৃতীয় সর্গ : ক্যানাসের আত্মকথা ॥

স্বীকারোক্তি বাকি আছে বজ্রসত্ত্ব,
আমার আখ্যান সেঁই দ্বিপ্রহরে শুরু হয়েছিল।
বাকি আছে আরো ঘেন্না উগ্‌রে দেওয়া
যা কিনা নিজেব প্রতি, যেহেতু শরীর আর মনে এক বিচ্ছেদ
এ সমাজে সম্পূর্ণ হয়েছে।

জানি, ছন্দে গল্প বলা আজ আর আধুনিক নয়
স্বাভাবিক নয় আর নীতিকথা,
ঈশপ ও বিষ্ণুশর্মা একই সমাধির নীচে শান্তিতে শয়ান।
সেহেতু নির্ভয়ে ডাকি ছেলেদের—
সদ্য গোঁফ-ওঠা খোকা, প্রবীণ লম্পট,
স্বামী অভিনেতাকুল, বিষণ্ণ সন্ন্যাসী,
ভিন্ন-ভিন্ন কর্মফলে যাদের উপাধি 'ডন'—কিহোতে, জুয়ান,
প্রত্যেক কাছে আসে, আমি বলি চুপি চুপি:
শরীর ও মনের মধ্যে কে না জানে সম্পর্ক দ্বন্দ্বময়,
কিন্তু যদি সেই দ্বন্দ্ব বিরোধমূলক হয় দুর্ঘটনাবশে, তবে
ধর্ষিতাও সুখ পায় ধর্ষণ থেকে।

আমি তো পেয়েছি।
কী সহজে বলা গেল—যেন ঘেন্না কিছুই হত না!
পাকস্থলী থেকে যেন ওয়াক্ দিয়ে উঠত না অজীর্ণ আহার!
যেন জ্বর আসত না হু-হু করে, যেন বিষ নিজেকেই পোড়াত না!
সফেদ ফেনার কথা মনে হত, রাশি রাশি ভেলিয়াম-দশ,
অনন্ত ঘুমের স্বপ্ন বাথটবে, ঝকঝকে ব্লেড,
নিঃশব্দ ফোঁটা-ফোঁটা হিমোগ্লোবিন আর ক্রমশ লোহিত জল,
কী রেহাই, কত স্বস্তি...যেন মনে হত না এসব!

সব হত, মহাবোধ, তথাপি উল্লেখ করি, এসব শোচনা
সুরতখেলার শেষে; যখন অন্ধকারে একা,

যখন বৃন্ত থেকে অঙ্কুর—সমস্ত শিথিল।
তখন ঘেন্নার মুখ খুলে যেত, তার থেকে ঝলকে-ঝলকে রাগ,
আত্মব্যঙ্গ, বিদ্বেষ, অধিকারবোধ আর এইভাবে
দ্বিতীয়-তৃতীয়বার ধর্ষণকামনা।

বিকার এভাবে বাড়ে। বাৎসায়ন যা যা জানতেন,
পাঠক্রম শেষ হয় তার। বিকার তবুও বাড়ে।
পশুভঙ্গি, কীটভঙ্গি, তারপর একরাতে আমাকে খাটের সঙ্গে বেঁধে..
যেন আমি ক্রীতদাসী...ফের সেই ধর্ষণ, আহা...
তীব্র সুখের সেই রাত আমি চাটতে থাকি, চুষে নিতে থাকি,
স্খলনক্রিয়ার শেষে যেন রাত চরম মাদক,
তখন শরীর বোবা, তখন চোখের পাতা ভারি,
তখন সংগোপনে ঘেন্নার মুখ ফের খুলে যাচ্ছে,
শৃঙ্খলিত অন্ধকার তখন হঠাৎ যেন হ্যালিউসিনেশন...

॥ চতুর্থ সর্গ : রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর ॥

যেন ছাদ খুলে গেল, অথচ আকাশ জুড়ে তারা নেই, চাঁদ নেই,
স্থান নেই, কাল নেই, যেন শূন্যে ভেসে উঠে ছাড়িয়ে এলাম ঘর,
অথচ শূন্যও নেই; দেখলাম :

নিঃশব্দ পদক্ষেপে পরস্ত্রীর ঘরে যাচ্ছে সুবর্ণবানিয়া,
শিশুবানরের মুষ্ক দাঁতে কামড়ে ছিঁড়ে নিচ্ছে বানরসর্দার,
সন্তানের জন্ম দিচ্ছে কানা ও খঞ্জ ছাগ, সেই শিশু দ্বাদশ বৎসর
বালকবালিকাদের বহন করবে তার কৃমিময় দেহে,
লাক্ষারং বাছুরের জন্ম দিচ্ছে গাই, হায়, তারও মুষ্ক ছিন্ন,
দাসীগর্ভে জন্মাচ্ছে হিজড়া মানুষ, তাকে ঘিরে হাততালি,
দৈববাণী মতে এই হিজড়ার তিরিশ বছর আয়ু,

প্রতিটি প্রেমিক তার বন্ধুদের আড্ডায় প্রেমিকার স্তন নিয়ে
কেচ্ছা করছে, আর প্রতিটি প্রেমিকা তার প্রেমিকের অন্তরালে
অন্য ছেলের ঘাম মেখে নিচ্ছে মুখে।
বাণিজ্য পরম তপ, বিস্মৃতি প্রধান ধর্ম, মিথ্যাই আচমন,
কুক্কুরের জিভ থেকে বিন্দু-বিন্দু ঝরে পড়ছে লালা,
টাঁকশালে উড্ডীন জাতীয় পতাকা, উল্টোদিকে চশমার দোকান,
কারিগরি কলেজের দরজায় ভিড় করছে কন্যাদায়গ্রস্ত সব পিতা...

॥ পঞ্চম সর্গ : রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর ॥

দেখতে দেখতে শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে। ইতিমধ্যে ঘুরতে থাকে সব।
বুড়বুড়ি উঠতে থাকে প্লাজমাসাগরে, ক্রমশ ঘূর্ণন বাড়ে,
মুছে যায় দিকচিহ্ন, সূর্যাস্তে প্লাজমার মেঘ।
সব শাদা হয়ে যায়, শাদা এক অন্ধকার,
সেই নেগেটিভ প্রিন্টে পুনর্বার যবনিকা উত্তোলিত হয় :

কান্তারের মাঝখানে বুড়ি এক পাগলিকে বসে থাকতে দেখি।
শণের নুড়ির মত চুল তার, কোঁচকানো ত্বক,
কথা বলছে একা-একা, হেসে উঠছে হি-হি করে,
মাঝেমধ্যে এক খামচা মুখে দিচ্ছে মাটি।
মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে সাইক্লোন, উড়ে যাচ্ছে খড়কুটো,
সমস্ত উল্কা আর গ্রহখণ্ড ঝাঁট দিয়ে অ্যানড্রোমিডার দিকে
নিয়ে যাচ্ছে ধূমকেতু, ক্রমশ ঘূর্ণি উঠছে, সৌরধুলোর ঝড়ে
পাগলির দেহমন আবৃত হয়ে যাচ্ছে, শুধু স্বর,
ক্রমশ ভীষণ স্পষ্ট, উচ্চারণ ভীষণ ধাতব...

—"কখনো ছিল আমার চুল ভ্রমরকালো, কুঞ্চিতাগ্র,
জরাগ্রস্ত সেসব এখন বল্কল।
বচন কভু যায় না বৃথা সত্যবাদীদের।"

স্বরগ্রাম বেড়ে উঠল, ঝড়ের উপর যেন স্তব্ধতার ঝড়...

"এতই নিখুঁত ছিল এই ভুরু
মনে হত যেন তুলি দিয়ে আঁকা
জরায় এখন বলিরেখাময়
বুড়ি শশকের বিবর্ণলোম।
বচন কখনো হয় না নষ্ট
সত্যবাক্যপন্থী যারা।"

হাসির হর্‌রা উঠল খন্‌খন্‌, একঝাঁক চামচিকে বাতাস কাঁপিয়ে উড়ে গেল..

—"চোখের তারা ছিল জ্যোতির্ময়, ঠিক নীলকান্তমণি,
এখন জরাভারে ধূসর কাচ রং, স্থির।

কোমল নাক ছিল দীর্ঘ, যেন বাঁশি, তবুও আজ
জরার আগমনে শুকিয়ে গেছে আর কুঁচকে গিয়েছে।
সত্যবাদীদের বচন কোনোদিন নষ্ট হয় না।''

ভয়, সম্বুদ্ধ, আচম্‌কা ভয়ে গলা বুজে এল কেন...

—''কলামুকুলের মত রং ছিল আমার দাঁতের,
জরা এলে ভেঙে গেছে, হলুদ যবের মত দেখতে হয়েছে।
বনকোকিলার মত স্বরগ্রাম এখন কর্কশ,
স্তম্ভগোল বাহু যেন শুকনো পাটকাঠি,
পীনদ্ধ স্তনদুটি নির্জল, চামড়াথলির মত ঝোলা।
যারা সত্য বলে তারা বিফল হয় না।''

উঃ, কী কুশ্রী এই বর্ণনা...উপরন্তু, এর সঙ্গে সত্যের সূত্র কোথায়?
নির্বোধ গুঞ্জনে কুয়াশা জমতে থাকে মাথার ভিতরে,
সে কোন অজানা থেকে উন্মত্ত ফিরে আসে চামচিকের ঝাঁক...

—''নূপুরশোভিত জঙ্ঘা শুকিয়ে একদলা তিল,
হাতিশুঁড় উরু জরার দহনে বাঁশের নল।
সত্য বললে বিফল কখনো হয় না কেউ।''

থামো, থামো, যথেষ্ট হয়েছে। কী তোমার সত্য বলো,
কোন সত্যের কথা একঘেয়ে আবৃত্তি করছ?

—''আমার জীবন সত্য, সত্য এই ভূমণ্ডল,
তারও পরে যদি কোনো ব্যাপ্তি থেকে থাকে
তবে তাও সত্যকথা;
সত্য দেশ, সত্য কাল, সত্য আদি বিস্ফোরণ,
এবং ভীষণ সত্য—যা আমার পাপ।''

কী তোমার পাপ বলো, আজ রাতে সবই বিপরীত।
অন্ধকার শাদা রং, কৃষ্ণবর্ণ আলো,
সংহত ভরের প্রণয়ে সব রেখা বক্র, নাকি
বক্রতাই শাশ্বত—এ সন্দেহ ঘনীভূত হয়। বলো,
আজ রাতে তোমার পাপের স্মৃতি শোনা যাক।

—"যে কথা বলতে আমি কোনোদিন সাহস করি নি
সে আমার পাপ।
যে কথা বলতে আমি আজীবন লজ্জা পেয়েছি
সে আমার পাপ।"

বিস্তৃত বুঝিয়ে বলো, কী সেই ঘটনা?

—"ঘটনা আসক্তিহীন, ঘটনা বর্ণহীন খড়ের প্রতিমা,
ব্যাখ্যা তার মাটির প্রলেপ, দৃষ্টিকোণ কুমোরের তুলি,
অনুপুঙ্খ : অলঙ্কার, প্রেক্ষিত : অস্ত্রাদি,
বিজ্ঞান : পুরোহিত মন্ত্র, দর্শনেই প্রতিষ্ঠা প্রাণের।
ভয়ে আমি প্রকাশ করি নি, লজ্জায় বলতে পারি নি,
সেই ভয় সেই লজ্জা পাপ।"

কী সেই পাপের গল্প? আজ রাতে তুমি আর আমি ভিন্ন
চরাচরে আর কেউ নেই। সমস্ত তির্যগ্‌যোনি, সমস্ত উদ্ভিদ।
বলো, কথা বলো. একে অন্যের মুখ দেখতে পাই না।
এই অন্ধকারে দুজন নারীর মধ্যে গুহ্যকথা চালাচালি হোক।
আমাকে বিশ্বাস করো, বলো....

—"সমস্ত জীবন আমি বেপরোয়া শরীরখেলুড়ে,
আত্মধ্বংসে পটীয়সী আমার থেকেও
আর কেউ কোথাও ছিল না।"

এহ বাহ্য, আমি কিছু কমতি যাই না। আরো বলো,
কোষ বিভাজন করো, কীভাবে নিষিক্ত হলে,
কী তোমার ক্লিন্নতম পাপ?

—"পাপ? সে তো আগেই বলেছি।
যে ঘটনা সেইদিন জীবনের ভিন্নস্রোতে
আমাকে ভাসিয়ে দিয়েছিল,
তার কোনো প্রতিকার করতে পারিনি—তাই পাপ।"

কী সেই ঘটনা তুমি বলছ না কেন? কেন উদ্বেগ এইভাবে
জীইয়ে রাখছ? বলো, মুক্ত হও, সব বলো...

—"চর্তুদশ বৎসরে নিজের দাদার হাতে ধর্ষিতা হয়েছি...."

মিথ্যে কথা...মিথ্যে কথা...নির্লজ্জ কুলটা তুমি...
কে তোমাকে একথা বলেছে? মিথ্যে বলছ অনায়াসে...
কে তুমি? কী তোমার নাম?

—"তোমার ভবিষ্যৎ আমি।"

॥ ষষ্ঠ সর্গ : ব্যক্তিগত ইন্তিফাদা ॥

এ সবই আমার পাপ, অমিতাভ, রাত্রির তৃতীয় প্রহরে
সম্বিৎ ফিরে এলে চিন্তার সুযোগ ছিল না।
পাগলের মত আমি দাঁত দিয়ে বাঁধন কেটেছি,
রক্তে মুখ ভরে গেছে, একটা একটা করে ভেঙে গেছে দাঁত।
তবু দড়ি কাটতে পেরেছি।
তারপর, জানলার শিকে বেঁধে পরনের শাড়ি
দেয়াল খামচে আমি কোনোক্রমে রাস্তায় নেমেছি,
সব নখ ভেঙে গেছে, মণিবন্ধ বিক্ষত ধারালো কঙ্কণে।
তবু সেই নিশুতি রাত্রে, অবশেষে মুক্ত আমি,
অবশেষে, খোলা রাস্তায়।

কিন্তু এ কেমন মুক্তি? আকাশের দিকে চাই—
এ আকাশ শৈশবের সে আকাশ নয়।
বাতাসে ভাসিয়ে দিই চুল—এ বাতাস সে বাতাস নয়।
গাছপালা-বাড়িঘর সবই এক, কিন্তু ঠিক সে রকম নয়।
সিদ্ধার্থ, আমি কিছু চিনতে পারি না।
হেঁটে চলি উন্মন, অন্যমন পরিধানে বস্ত্র আছে কিনা
খেয়াল থাকে না।
কে জানে কখন আসে উষা, সকাল-দুপুর-সন্ধ্যা,
ফের রাত্রি ফের দিন, দিনরাত্রি, রাত্রিদিন...
পায়ের তলায় শুধু মানচিত্র বদলে যেতে থাকে...

বদলে যাই, বদলে যাই, এই আমি বদলে যেতে থাকি।

পূতিগন্ধময় এই জীবনযাপন, সত্যের বিনিময়ে,
জানি আমি কারও কাছে গ্রাহ্য হবে না।
এটা পুরুষের দেশ, পুরুষেই ধর্ম গড়ে, পুরুষ বিধর্মী হয়,
পুরুষ প্রতিষ্ঠান, পুরুষই বিপ্লবী।
পিতৃতন্ত্র এ সমাজে কতদূর শিকড়সঞ্চারী
এ যাবৎ তার কোনো যথাযথ সমীক্ষা হয়নি।

কিন্তু আমি কার কাছে যাব?
আমি তো সামান্য মেয়ে, এইভাবে দিন-প্রতিদিনে
আমার চুলের জট ক্রমাগত দীর্ঘায়িত হয়।
শিশুরা আমাকে দেখে ভয় পায়, বালকেরা ঢিল ছুঁড়ে মারে।
কোনো গ্রামে সন্ধ্যা হলে বৃদ্ধেরা আমাকেই ভৈরবীজ্ঞানে
পূজা করে, আশীর্বাদ চায়।
বর্ধিষ্ণু মহাজন সংঘের হাত থেকে পরিত্রাণ প্রার্থনা করে,
ক্ষিপ্ত তীর্থিক—ব্যক্তি ভিন্ন যার কোনো বিগ্রহ নেই,
নপুসংক আর্তনাদে সংঘের নাম করে খেউড় ছোটায়;
বলে, ঐ শ্রমণেরা অলস, পরান্নভোজী, মুণ্ডিতমাথা,
উপরন্তু নাস্তিক, সেহেতু দণ্ডনীয় যেরকম চোর বা লুঠেরা।
আমি শুনি, হেঁটে চলি, উত্তর করি না, শুধু
মধ্যরাতে চন্দ্রালোকে আম্রবনপ্রান্তে ঐ নিযাদপল্লি থেকে
উঠে আসে একটি তরুণ,
সংঘের পথে তার পদরেখা ধূলায় নিহিত থেকে যায়।

আমি তাকে পাথেয় দিই না।
আমি তাকে ফিরিয়ে আনি না।
শুধু হেঁটে চলি...

সামান্য মেয়ে আমি,
আমার সংঘে কোনো বিশ্বাস ছিল না এ যাবৎ,
তবু তো কোথাও যেতে হবে।

আমাকে কোথায় যেতে হবে?

॥ সপ্তম সর্গ : দর্শনের চিহ্নগুলি-প্রতিচিহ্নগুলি ॥

সেই প্রশ্ন নিয়ে আজ এখানে এসেছি।
এই সংঘ—এখানে প্রবেশের পর চর্তুবর্ণ নষ্ট হয়ে যায়,
এখানে সন্ধ্যা নামে শান্ত স্তোত্রের মত, দীপ হয় প্রজ্জ্বলিত,
চঙ্‌ক্রমণ শুরু হয়, উদাত্ত গাথাপাঠে আবহাওয়া নম্র হয়ে ওঠে।
এই জেতবন—চুল্লির উপরে রাখা উদ্ভিদের মত
সীমাবদ্ধ চিন্তাগুলি এখানে কি নষ্ট হয়ে যায়?

যেহেতু দর্শন দিয়ে রাষ্ট্রকে অধিকার
সূর্যোদয়ের পক্ষে বেশিদূর পর্যাপ্ত নয়।
শেষ বুদ্ধ গৌতমের উপস্থিতি সত্ত্বেও বৌদ্ধ রাজা প্রসেনজিৎ
চালান চণ্ডনীতি; যদিও সংঘে তিনি নগ্ন পায়ে প্রবেশ করেন, তবু
খরা বা বন্যায় খাজনা বিশেষ কমে না। মরে না পুলিশরাজ,
প্রশাসন বেঁচে থাকে, সুখে থাকে, আমলার নিষ্ঠুর কলমে।

এবং, বাইরে আছে বিপুলা পৃথিবী।
সেখানে হিংসার কিছু কম নেই, কালের কটাহে
লাভ ও ক্ষতির রান্না, অবিরল ভোগ্যপণ্য, দাতা ও ভোক্তার মধ্যে
মাকড়শার লালা; পাচনপদ্ধতি আর পাচনসম্পর্কে
চেতনার যথাযথ প্রয়োগ ঘটে নি।

কিন্তু সংঘ নিশ্চেতন—এ কথা মানি না।
আমি তো শুনেছি থের আনন্দের বেশালিতে তীব্র যুক্তিজাল,
তার ফলে মহাপজাপতী আর পাঁচশো শাক্যনারী
সংঘভুক্ত হন। আমি তো দেখেছি ভদ্দা কুণ্ডলকেসার সঙ্গে সারীপুত্তের দার্শনিক
আলাপচারিতা। কীভাবে অঙ্গুলিমাল
কেবল সত্যবলে প্রসূতি নারীর কষ্ট লাঘব করেন—দেখেছি সে সবও।
তাহলে কোথায় সেই উৎস, কোনখানে সমস্যার জট?

কেন ঐ বিম্বিসার কিংবা প্রসেনজিৎ
শাস্তার তিরস্কারে শাসিত হন না?
কেন ঐ শ্রমণেরা জনমন থেকে দূরে
ক্রমশই একা একা—খগ্‌গবিষাণ?

ভিক্ষাগ্রহণ ভিন্ন কেন তাঁরা গৃহস্থকে কার্যত উপেক্ষা করেন?
অন্নের কোনো দায় নেই?
কেন এত আত্মরক্তপাত?
সংঘের অনুগত লিচ্ছবিতন্ত্রের যাতে বিনাশ ঘটানো যায়
সেজন্য স্বয়ং বুদ্ধ অজাতশত্রুকে কেন পরামর্শ দেন?

দর্শনে নয় জানি, সংগঠন-সত্যে তবে জরা?
হতে পারে; সত্য যদি শুধুমাত্র বুনিয়াদি হয়
নিশ্চিত জরা তবে ললাটলিখন।
জানি, সংঘ অনিবার্য; যখন দর্শনের প্রতি
শুধুমাত্র ভিন্ন কোনো দর্শনের নয়, এমনকী সশস্ত্র আক্রমণও আসে
তখন সংঘ ভিন্ন অন্য কোনো ব্যারিকেড নেই।
দর্শনকে রক্ষা করা সংঘের দায়,
তাই সংঘে মন্ত্রগুপ্তি, তাই সংঘ নিয়মকঠোর।
এবং, দীর্ঘদিন এইভাবে প্রতিরক্ষা শেষে
উদ্দেশ্য গৌণ হয়,
দর্শন থেকে তার সংঘারাম বড় হয়ে ওঠে।

আমাকে জানান, শাক্য, এই সংঘে বিকাশের ধারা
অব্যাহত আছে কিনা। সত্য তো একই সঙ্গে বুনিয়াদি
এবং বিকাশমান হবে?
সামান্য মেয়ে আমি, গূঢ়বাক্য বিশেষ বুঝি না,
তবু আত্মসমর্পিতা; যদি ভুল করি,
অধিকার বহির্ভূত কোনো প্রশ্ন যদি করি তবে
ক্ষমাই আপনার ধর্ম, মৈত্রেয়, ধৃষ্টতা রাখি না, কিন্তু
আপনিই একদিন বেদের বিরুদ্ধে এক সঙ্গত প্রশ্নচিহ্ন
প্রোথিত করেছেন; আজ আমাকে জানান,
আপনার সংঘের হাতে সর্বশক্তিমান ঐ সত্যের
অসীমবিকাশ আজো সাবলীল কিনা।

আপনার সত্য...ঐ তার দগ্ধ চোখ,
ভাঙা দাঁত, ফাটা ওষ্ঠাধর,
কেন ও কীভাবে?

॥ অষ্টম সর্গ : স্বপ্ন, নিদ্রাহীন ॥

জীর্ণ পদ্মের মত আমার এই অবসন্ন শরীর, শাস্তা,
এই তো এসেছি আমি জীবকের উদ্যান পেরিয়ে
হাতে নিয়ে উপড়ে ফেলা চোখ।
এই তো এসেছি আমি দশটি কিলেস থেকে অর্ধোত্থিত
মূর্তিমতী জিজ্ঞাসা ঠোঁটে ও অন্তরে।

শক্তির উৎস ঐ সূর্যকে যা প্রদক্ষিণ করে
সেই গ্রহে যদি থাকে মেঘ,
যদি থাকে ধানখেতে বৃষ্টিপাত, ভোরবেলা ঘুম ভাঙা গান,
যদি থাকে অশ্রুচিহ্ন, নিহত পশুর দেহে স্থির দৃষ্টি রেখে
অসীম আকাশে যদি এখনো একটি চিলও আবর্তিত হয়,
যদি কেউ কোনোদিনও ভালোবেসে থাকে,
যদি থাকে মধ্যপথে চিঠি,
যদি আপনিও শুধুমাত্র পুরুষ না হন,

তবে এই আমার রুক্ষ চুল, এই আমার ভাঙা নখ,
এই আমার রক্তাক্ত অঞ্জলি;
তথাগত, এই আমি...

আমাকে কোথায় যেতে হবে?

আমার শিক্ষক শ্রী তপোব্রত ঘোষের অকৃপণ
সাহায্য ছাড়া এ লেখা সম্ভব হত না।

আছে শুধু পাখা, আছে মহানভ অঙ্গন

অনন্যর জন্য..

(স্থান : আসাম বা ডুয়ার্সের কোনো বনবাংলো। সময় : রাত্রি। একটি মোটর গাড়িতে একদল পর্যটক এসেছেন। এই মুহূর্তে তারা বাংলোয় গল্প, ঘুম বা মদ্যপানরত। দূরে ড্রাইভারের আউটহাউস। এসব জায়গায় সচরাচর যা হয়, চারটি উঁচু খুঁটির উপরে ড্রাইভারের ঘর। অর্থাৎ, সে বাড়িটির কোনো একতলা নেই! অথচ একটাই তো তল, দুটি তল থাকলে তবেই তো তাকে দোতলা বলা হয়! এখান থেকেই শুরু হতে পারে এ লেখার দ্বান্দ্বিকতা। যাই হোক, আউটহাউসেব পাশে রাখা গাড়িটি; এবং আরো দূরে, প্রায় ছায়ার মত, দেখা যায় বন-বাংলোর

হাতিটিকে। সে কি ঘুমচ্ছে? তাহলে, মাঝেমধ্যে শুঁড় তুলে কীসের ঘ্রাণ নিচ্ছে সে? ঐ গাড়ি আর এই হাতির মধ্যবর্তী কোনো এক স্থানে দীর্ঘ শীতকালীন রাত্রি কাটাবার জন্য আগুন জ্বেলেছে দুইজন। একজন গাড়ির ড্রাইভার, অন্যজন মাহুত। তারা কথা বলছে। পরিকল্পনাহীন, স্বতোৎসারিত, সঞ্চরণশীল এবং হয়তো বা অসংলগ্নও, সেইসব কথাবার্তাই এই লেখার উপাদান। শুধু একটা কথাই উল্লেখ্য—আর যা খুশি হতে পারে, কিন্তু এ লেখা নাটক নয়। কোনক্রমেই নাটক নয়। এমন কি, কাব্যনাট্য কিংবা নাট্যকাব্যও নয়।)

॥ প্রথম অধ্যায় ॥

মাহুত : নীরবতার কোনো শব্দ হয়না;
যা আমরা শুনি
তা আসলে ঝিল্লির ধ্বনি।
মানুষের কল্পনাপ্রতিভায় এরকম ভুল আরো ঘটে,
যদি সেইসব জেনে থাকো ইতিমধ্যে
তবে আর বলবার দরকার দেখি না!

ড্রাইভার : আমি জানি। তবে সব নয়,
সব কেউ জানতে পারে না।
এই যে অজানা—তার অনন্ত পরিসরে
তরঙ্গের চাপ কাজ করে।
সেই চাপে আমাদের ঠিক আর ভুল জানাগুলি
স্থান পরিবর্তন করে কালভেদে।

মাহুত : ভালো, ভালো, তোমার ভাষার মধ্যে
ঈশানের বিদ্যুৎ রয়েছে।
এমনিতে শব্দ বড় কুশীলব, তবু
এরকম সঙ্গী পেলে কখনো-কখনো
কথা বলতে সাধ যায়।

ড্রাইভার : সভ্যতাবর্জিত এই দেশ। নিশ্চিত জানি,
এখানে আসেননি যিশু,
এমনকি, বোধকরি, পাণ্ডবও নয়।
এইখানে তুমি—দৃশ্যত নোংরা, আর
আশা করছি, নিরক্ষরও—হাতির চালক,
বলবার মত কথা কী করে জানবে?

মাহুত : সত্য বটে, পরিচ্ছদ পরিষ্কার না।
মাসপয়লা মাইনে তুলি টিপসই দিয়ে, আর
এই যে ভোজালি দেখছ কোমরের খাপে—

এও তো নিয়মরক্ষা। নতুবা এমন অকেজো অস্ত্র দিয়ে
আর যাই হোক, বাঘ বা বাইসন রোখা সম্ভব না।
তার অবশ্য দরকারও নেই,
এই যে বৃক্ষময় ভূমি—এর নাম প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর,
আর্যগণ এর ব্যাখ্যা কী দিতেন সঠিক জানি না, তবে
আমার ধারণা, শোনো, জ্যোতিষেরও প্রাক্কালে
এইখানে প্রাণীরা রয়েছে।
তাদের সঙ্গেই আমি থাকি; যে পশুর পিঠে রোজ
নদী পার হই, অতিক্রম করি নলঘাসে ঘেরা বনভূমি,
তার সঙ্গে নিরাকার তাপীয় সংযোগ বন্ধুতা বহন করে।

ড্রাইভার : প্রাচীনকে চালনা করো—এই তবে যোগ্যতা তোমার?

মাহুত : চালনা করি না। তার সঙ্গে বাস করি—আগেই বলেছি।
সেহেতু যখন চিতা মগডালে গুঁড়ি মেরে থাকে,
তখন আমাকে সে-ই রক্ষা করে।
যখন রাত্রিকালে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, উত্তরে কোনো তারা নেই,
সে আমাকে নিয়ে যায় নির্দিষ্ট পথে। তুমি
বন্ধু ভাবতে পারো আমাদের।

ড্রাইভার : একই কথা। নামান্তরে প্রাচীনের সঙ্গে থাকো বলে
সহসা প্রজ্ঞার ভাব চোখে মুখে ফুটিয়ে তুলছ?

মাহুত : ঠেস দেওয়া কথা হচ্ছে?

ড্রাইভার : একটু হচ্ছে। যেহেতু আমার সঙ্গে আরণ্যক ঐতিহ্য নেই।
তুমি জানো, স্পার্কিং প্লাগ কাকে বলে?
কাকে বলে ডায়নামো, কাকে বলে ভ্যাকুয়াম ব্রেক?
আমাকে জানতে হয়; জানা আমার জীবিকা।
এমনকি পেট্রলের দাম বেড়ে গেলে
একদিকে মধ্যপ্রাচ্য, অন্যদিকে বঙ্গীয়—দুরকম রাজনীতি
জেনে নিতে হয়। প্রাচীনের সঙ্গে থেকে গেলে
এতদিন পালকি বইতে হত; সেটা খুব অনায়াস হত না, কী বলো?

মাহুত : নির্ভর করছে, তুমি কীভাবে দেখবে।
দূষণের কথা যদি নাও ধরি, তবু, একদল পালকি চড়ে,
অন্যদল পালকি বয়—এই বিভাজন যদি না থাকতো ইতিহাসে
তাহলে প্রাচীন খুব মন্দ ঠেকত না। কিন্তু, যা ঘটে গেছে
তার আর চারা নেই। ফলে আমি মেনে নিচ্ছি—

আধুনিক তুমি। অর্থাৎ, জটিল আর স্ববিরোধী,
ক্লান্ত ও রোগগ্রস্ত, আত্মধ্বংসী, সেই সঙ্গে অন্যকেও ভাঙতে উদ্যত।

ড্রাইভার : বুড়োপানা কথা শুনে রাগ হয়, মাইরি বলছি।
প্রাচীনেরা যেন কিছু কাটাকাটি কম করেছেন!
আধুনিক মানেই ভিলেন? আউটসাইডার?
চমৎকার কথা বলছ! অতীতে যা ঘটে গেছে
তার আর চারা নেই? আমি বলছি—আছে।
উন্মাদ ঘূর্ণিঝড়ে যেরকম মূল থেকে ছিটকে যায় গাছ,
সেরকমই মানুষের অতিষ্ঠ ইচ্ছা
ঐ বিভাজনও, দেখো, নিশ্চিহ্ন করবে।
সেই ঝড়ে আমিও থাকব।...ইয়ে, চারমিনার খাবে?

মাহুত : দাও।...তবে নিশ্চিহ্ন হয় না কিছু। মহাবট ভূপাতিত হলে
মাটিতে ক্ষতস্থান থেকে যায়। তাকে চিহ্ন বলে।
মানুষের স্মৃতিলোকে প্রতিটি দুঃখের চিহ্ন বর্তমান থাকে।
গুহা বা বল্কলস্মৃতি, আগুনের ইতিহাস, জন্মের পরবর্তী প্রথম কান্না,
সব সে বহন করে অজানিতে। এছাড়া খুলির নীচে
ধূসরবর্ণের কোষে-কোষে অন্ধকার পুঞ্জিভূত থাকে।
তাই এত ধর্মভয়, ঈশ্বরটোটেম, তাই এত সম্প্রদায়,
এত সাঁই-পীর ও ফকিরদের কানাকানি। এত অন্ধকার
কীভাবে ঘোচাবে তুমি, তা কি হয়?

ড্রাইভার : হয় কি হয় না সেটা আগামীতে বুঝে নেওয়া যাবে।
মাটির ক্ষতস্থান মাটিতেই ঢেকে দেব, স্মৃতির ক্ষতস্থান
নতুন স্মৃতিতে। তুমি দেখো, অন্যথা হবে না।

মাহুত : চেষ্টা করে যেতে পারো। তবু বলি,
ক্ষতস্থান চাপা দিলে যতই নিপুণ হোক চিকিৎসার কাজ
দাগ বুঝতে পারা যায়। সময়ের মাত্রা কাজ করে।
এ ব্যতীত, চিকিৎসার ভার নেবে কে?
তুমি কি জানো না, আজ যে আরোগ্য দেয়
কাল সেই সংক্রামিত করে নতুন অসুখ?

ড্রাইভার : এরপর তুমি দেবে কালের দোহাই।
জন্ম ও মৃত্যুর সেই শাশ্বতচক্রের কথা ঘোষণা করবে।
সভ্যতারও জন্ম হয়, সমাজেরও, তারপর যৌবন পার করে
একদিন ধ্বসে পড়ে কনস্তান্তিনোপ্‌ল।

ফ্ল্যাঙ্ক ও ভ্যাণ্ডাল হানা, হুন আক্রমণে গুপ্তদের বেপথুমানতা—
এই সবই বলবে তো? আমি জানি, সমাজের হেমলক
সমাজেরই বুকে জমা থাকে। এ দেশে বাঁচতে হলে
সেই গান, "তোমার কর্ম তুমি কর মা..." প্রত্যেকেই জানে।
এহ বাহ্য, তারপরও কথা থেকে যায়।
চক্রই একমাত্র আঙ্গিক নয়, এই বিশ্বে প্রবাহও আছে।
সে প্রবাহ একমুখী, প্রকৃতিবিজ্ঞানী তাকে
'সময়ের তীর' নামে অভিহিত করতে পারেন।
জঙ্গলে থাকো জানি, তাহলেও ঋষ্যশৃঙ্গ নিশ্চয় নও।
কোনোদিন নারীকে দেখনি?

মাহুত : হঠাৎ নারীর কথা কেন? নারীরা কি তীরন্দাজ হন?

ড্রাইভার : যথেষ্টই ভেজা রসিকতা। শহরে এসব বললে পাঁচ-আইনে ধরে।
যাই হোক, একটু অবধান করো—নারীর জীবনে থাকে
প্রতিমাসে ঋতুকাল, চক্রাকার গতি। একই সঙ্গে থেকে যায়
জরা বা মৃত্যুর দিকে একমুখী চলা।
সে চলা অলঙ্ঘনীয়, তার কোনো ফেরা নেই।
এইভাবে একসঙ্গে চক্র ও প্রবাহ—এই দুই আঙ্গিক
প্রযুক্ত থেকে যায় বিশ্বজীবনে। তাদের মধ্যেও থাকে
দ্বন্দ্বের রাগ-অনুরাগ, তাকে স্পাইর‍্যাল বলে। আর তাই
চেষ্টা থাকে, চেষ্টা থাকে, নিরন্তর বিশ্লেষণ ঘটে চলে গবেষণাগারে।
এরও এক স্বতন্ত্র ইতিহাস আছে—যা কিনা স্পার্তাকুস থেকে
লিঙ্কন হয়ে এ.এন.সি. অবধি প্রবাহিত। যাই হোক
জ্ঞান দেওয়া হয়ে যাচ্ছে, ভিন্ন কিছু বলবার থাকে যদি বলো,
না হলে ঘুমের চেষ্টা করি চলো কম্বল জড়িয়ে।

মাহুত : কালহীনতার কথা বলব ভাবছিলাম....
সময়ের গণ্ডি ভেঙে ইস্কুলছুটির ঘণ্টা কীভাবে বাজিয়ে দেওয়া যায়...
সে যাক্‌গে, আপাতত সত্যিই ভিন্ন কথা বলি।
আচ্ছা, দেখো এতক্ষণ ধরে কী ভাষা বলছি আমরা?
এইসব শব্দবন্ধ, যুক্তিবাক্য, ইতিহাস, দার্শনিকতা—
এসব কি আমাদের স্বাভাবিক বাচনপদ্ধতি?
আমরা কি এইভাবে কথা বলি নাকি?

ড্রাইভার : আদপেই নয়। মূর্খ মাহুত তুমি, তোমার ভাষায় আছে
আঞ্চলিক টান, চিন্তার দীনতা আছে. এ ব্যতীত

শব্দের সঞ্চয়ও কম। আর, বস্তি থেকে আসা আমি।
বিদ্যে—এইট পাশ, তারপর হেল্পারি করে যতদূর জানা যায়।
পড়তে পারি অবশ্যই বাংলায় সিনে-অ্যাডভান্স,
কাগজটা দেখেছো গুরু, রেখার স্বামীর মৃত্যু, মাধুরীর
নতুন প্রেমিক...এ ছাড়া সত্যি বলতে, দুর্বলতা—ইস্টবেঙ্গল।
বাপের জন্মে আমি এইসব ডায়লগ কখনো, শুনিনি।

মাহুত : কী করে বলছি তবে? অধ্যাপক যদি প্রশ্ন করে, কী ভাবে ব্যাখ্যা দেব?
আর যদি সত্যি ধরে সাহিত্যক্রিটিক, তাহলে তো গেছি!

ড্রাইভার : সত্যি, ভেবে দেখো দেখি, যদি প্রশ্ন করে:
"এই যে, এতক্ষণ যত সংলাপ আউড়ে গেলেন,
এসব কি বাস্তবতা? উপরন্তু আপনারা উভয়েই দারিদ্র্যরেখার বেশ
আশেপাশে ঘাস খান বলে সন্দেহ হয়। তবে তো আরেকপ্রস্থ...
সোশ্যালিস্ট বাস্তবতা কাকে বলে জানা আছে?
এ জাতীয় সংলাপে তার কি বেজায় হানি হচ্ছে না!"

মাহুত : শোনো ভাই, সত্যিকথা বলে দেওয়া ভালো।
নাহলে মারতে পারে; অন্যপক্ষে সেন্সর অনিবার্যগতি।

ড্রাইভার : অর্থাৎ?

মাহুত : বলে দিই, এসব কথা সত্যি-সত্যি আমাদের না।
এক ছোঁড়া জঙ্গলে বেড়াতে গেছিল, ফিরে এসে
নিসর্গ-রোম্যান্স কিছু হাৎড়ে না পেয়ে
আমাদের মুখে-মুখে এইসব বাক্যি বসাচ্ছে।
হে প্রভু, ধর্মত বলছি, আমাদের কোনো দায় নেই।

ড্রাইভার : ছেলেটা পাগল নাকি? আর কোনো লোক পায়নি?
এইসব কথা জুড়ে আমাদের মুখে কী করতে চায় সে?

মাহুত : মনে হয়, পরবর্তী প্রজন্মের কাছে এইসব চিন্তাগুলি—
যার পাঁকে নিজেই সে প্রতিদিন তলিয়ে যাচ্ছে—পৌঁছে দিতে চায়!
যাতে তারা উত্তর পায়, যাতে তারা কম ভুল করে।

ড্রাইভার : মনে হয় না। বরং বলতে পারি, পরবর্তী সন্তানেরা এসে
আগে তাকে গিলোটিনে দেবে।

ড্রাইভার : এটা কিন্তু বেশি বলছ।

মাহুত : তুমি দেখে নিও। গরিব দেশের এই মজা।
সে এবং তার যত বন্ধু-বান্ধব নিজেদের জীবনকে চিতায় চড়িয়ে
সুসময় ছিনিয়ে আনার পর; পরিত্রাহি হাম্‌লে পড়বে
তাদেরই সন্তান সব ডেট ও রেসিং কার, সেক্সশপ-ভিডিওর দিকে।
সেটা যাতে নিশ্চিন্তে হয়, বড়লোকদের গায়ে
যাতে নিরাপদে ঢলাঢলি করা যায়, সেজন্যই যুৎসই তত্ত্ব দরকার,
অখণ্ড বিশ্বের তত্ত্ব—শ্রেণীদ্বন্দ্বহীন।
তারই জন্য সর্বাপেক্ষা আগে পিতাদের হত্যা দরকার,
স্মৃতিকে বিকৃত করা এক্ষেত্রে, যতদূর সম্ভব হয়....

মাহুত : তাহলে সে লিখে যাচ্ছে কার জন্য?

ড্রাইভার : তুমি বলো মিস্টার প্রাচীন! আঁচ করতে পারো কিনা দেখি?

মাহুত : বলব?

ড্রাইভার : বাধা নেই। একটা বিড়ি ছুঁড়ে দিয়ে, বলা শুরু করো।

মাহুত : সে দেখছে আরেকটু এগিয়ে।
অনিকেত প্রজন্মের ভোগবাদ শেষ হলে পর
চরাচর ঢেকে ফেলবে ছায়া,
সমস্ত বিফল শস্য ঝরে পড়বে মাটির ফাটলে,
নষ্ট হবে ওজোনের স্তর, তেজস্ক্রিয় উত্তাপ বৃদ্ধি পাবে মারাত্মকভাবে,
বৃষ্টি হবে অ্যাসিডের, খ-মণ্ডল চম্‌কে উঠবে ইউ.এফ. ও-র কর্কশ ডাকে,
অশ্রু হবে অতিরিক্ত, অনুতাপ মনে হবে উপহাস,
সেই দুঃসময়ে—সভ্যতার গ্রহণতমসা থেকে যদি জন্ম নেয়
দীপ্রচোখ, সুস্থবুদ্ধি অন্য এক নতুন সন্ততি,
তাদেরই জন্য এই যুবকের আত্মাহুতি—অক্ষরাবিলাপ।

ড্রাইভার : যদি না জন্মায় তারা?

মাহুত : অমঙ্গল কামনা কোরো না।
যদি না জন্মায় তারা, তাহলে প্রতিটি নারী অহল্যার সহোদরা।
তাহলে প্রতিটি শিশ্ন কীটের গলিত খাদ্য।
তাহলে আকাশময় গৃধিনীর ডানা, মানসিক বিপর্যয়,
কৃমির বংশবৃদ্ধি, এইডস্‌ ও ভূকম্পন মানুষের শেষতম স্মৃতি।
অমঙ্গল কামনা কোরো না। বিবর্তনবাদ যদি মানো,
তবে তারা জন্ম নেবে, নিশ্চিত আত্মহত্যা থেকে
তারাই বাঁচাবে প্রজাতিকে।

ড্রাইভার : তবে এসো, তার কাজে সহযোগী হই।
মাত্র এই এক রাত্রি—প্রতিটি পশুর চোখে ঘুম,
জলের উপরে স্থির কুয়াশার আস্তরণ, নীড়গুলি উষ্ণতায় ঢাকা,
ঐ দেখো, নির্নিমেষ উত্তরনক্ষেত্রের নীচে পর্বত বহ্নিমান...
এসো, তাকে সাক্ষী রেখে যাবতীয় স্বকীয়তা ভুলে
যে কথা সে বলতে চায় সেটুকুই আবৃত্তি করি।

মাহুত : তার আগে কিয়ৎক্ষণ বিরতি প্রয়োজন,
পাঠককে স্থির করতে দাও,
আর সে পড়বে, নাকি ছিঁড়ে ফেলবে এই পৃষ্ঠা ক'টি।

(স্তব্ধতাকে চম্‌কে দিয়ে সহসা বৃহংণ শোনা যায়। গাড়িব হ্যালোজেন আলোদুটি দপ্‌-দপ্‌ করে জ্বলে ওঠে তিনবার...এবকমই বীতি।)

॥ প্রথম অধ্যায় শেষ ॥

॥ দ্বিতীয় অধ্যায় ॥

মাহুত : পর্বত বহ্নিমান...সেই দিকে চেয়ে
জানতে ইচ্ছা করে পথ কাকে বলে?

ড্রাইভার : (হাই তুলে) হঠাৎ পথের চিন্তা?

মাহুত : এমনিই...মাঝেমধ্যে মনে হয়, কোন পথে গেলে
মোহনভয়ঙ্কর ঐ আগুনের চূড়ার উপরে পৌছন যায়।.
ভেবে দেখো, সারাদিন পথেই তো কাটে,
কিন্তু, পথ কাকে বলে সেই কথা তলিয়ে ভাবি না।

ড্রাইভার : একটি সময়স্থান থেকে ভিন্ন এক সময়অবস্থানে
পৌছতে চায় বলে মানুষ যে পদ্ধতি তৈরি করে—তাই পথ।

মাহুত : তুমি বলছ, পথ এক সচেতন নির্মাণের নাম?

ড্রাইভার : তোমার আপত্তি আছে?

মাহুত : আছে। নির্মাণে আপত্তি নেই, তবে তা আবিশ্যকভাবে
সম্পূর্ণ সচেতন হয় কিনা—এই বিষয়ে দ্বিধা থেকে যায়।
যেহেতু জন্তুরাও সহজাত প্রণোদনাবশে—অচেতনে,
নখ বা খুরের আঘাতে ঘাস ছিঁড়ে পথ তৈরি করে।
ঐ যে সামনে দেখছ জলাভূমি, ওর ধারে এরকম পথ দেখতে পাবে।

ড্রাইভার : এও একটা কথা বটে। সেক্ষেত্রে সংশোধনী গ্রহণ করলাম।

মানুষের জীবনেও বোধকরি এই কথা খাটে।
আমার তো সন্দেহ হয়, লিপিকাব্যর্থতার বেশ কিছুদিন পর
তোমাদের রবিবাবু 'চাইল্ড' নামক সেই দীর্ঘকায় পদ্যটির
অনুবাদ যখন করছিলেন, সে সময়ে
বিশেষ না ভেবেই তিনি গদ্যকবিতার উপকূলে জাহাজ ভেড়ান।
কবিতার কলশ্বাস বলা যেতে পারে।

মাহুত : হয়তো তেমনই। কিন্তু সেটা বড় কথা নয়।
আগের প্রসঙ্গে এসো, একটি সময়স্থান থেকে
ভিন্ন এক সময়স্থানের কথা বলছিলে।
সংজ্ঞাটি ঠিকই ছিল, যদি ধ্রুবক-অনড় কোনো
অবস্থানবিন্দু তুমি পেতে। কিন্তু মুশকিল হল
সময়অবস্থানগুলি গতিশীল; যেহেতু সময় এক নিরন্তর নদী।
তার ফলে, যে বিন্দু (সময়স্থান) প্রত্যক্ষ করে তুমি পথে পা দিলে,
মধ্যপথে গিয়ে দেখবে বদলে গেছে সব।

ড্রাইভার : এটা কোনো সমস্যাই না। প্রতি সপ্তাহে
চাঁদ বা মঙ্গলে যাচ্ছে মহাকাশ যান। অর্থাৎ,
গতিমান গন্তব্যে পৌঁছানো যায়, যদি তুমি অঙ্ক কষে
গন্তব্যের গতিবেগ বুঝে নিতে পারো...বাকিটা তো খেলা।

মাহুত : সেটা ঠিক। মানুষ প্রজাতির ক্ষেত্রে অধিকাংশ পথ
সচেতন নির্মাণই বটে, আমি মানি। এখানেই প্রশ্ন ওঠে,
এই যে নির্মাণ—এর আয়োজনে নৈতিকতা থাকে কিছু?

ড্রাইভার : আরেকটু খোলশা কর।

মাহুত : অভীষ্ট লক্ষ্যে তুমি কোন পথে পৌঁছতে চাও?

ড্রাইভার : যে পথে সবচেয়ে আগে পৌঁছনো যাবে। ফের বলছি,
যত দ্রুত পারা যায়...

মাহুত : যদি সে সরণী হয় অনৈতিক?
যদি হয় ব্যাভিচারী কিংবা আপসকামী?

ড্রাইভার : পৌঁছনোই বড় কথা—ইউরি জিভাগো, কী ভাবে পৌঁছলাম সেটা নয়।
তারও আগে প্রশ্ন করি, নৈতিকতা কাকে বলবে?
কাকে বলবে আপসকামিতা?
হোদায়বিয়ার সন্ধিপাতে পাঁচ নং যে শর্ত ছিল
আপস বললে তাকে কম বলা হয়।

মহম্মদ তবু সেটি স্বীকার করেন। কিংবা যদি মনে করো
ব্রেস্ত্ ও লিতভ্স্কচুক্তি—সেও তো আপসই ছিল লেনিনের।
কিন্তু পরবর্তীকালে উভয়েরই বিজয়ের পর আমরা জানতে পারি,
এক পা পিছিয়ে আসা সর্বদা অপরাধ নয়। সামাজিক
যুদ্ধকালে এরকম ঘটে থাকে; কালকে জিতবে বলে আজ কেউ
পরাজয় আপাতবরণ করে নেয়।
দ্বৈপায়নবংশ যেই ভারতযুদ্ধের গাথা রচনা করেছেন,
সেখানেও এজাতীয় উল্লেখ আছে।,

মাহুত : সৈনাপত্যের কথা তুলছ! সর্বদাই তোলা হয়। ভাবা হয়,
নির্বিশেষ উলুখাগড়ারা এ বিষয়ে বলবার অধিকারী না।
তাদের ভাষ্যও যদি ঠাঁই পেত ইতিহাসে, তবে হয়ত ভিন্নস্বর
শুনতে পেত কেউ। মহম্মদের কথা আর না তোলাই ভালো,
ইসলামী পুরাণগল্পে আবুজান্দাল নামে তরুণ দীক্ষিতের কান্না
লিপিবদ্ধ আছে। ব্রেস্ত্-লিতভ্স্ক নামে ঐ চুক্তিফলে
বিস্তীর্ণ যে অংশ লেনিনকে ছেড়ে দিতে হয় কাইজারের জিভে
তাতে ঐ বাসিন্দারা খুব সুখ পায়নি বোধহয়।
সে-সব দুঃখেরও এক স্বতন্ত্র ইতিহাস আছে।

ড্রাইভার : অনন্ত কল্পনার জন্য কোনো কোনো দুঃখ তো মেনে নিতে হয়।

মাহুত : হয়। আমি জানি। কিন্তু আমি এও জানি,
যাত্রার মধ্যপথে যদি সেই কল্পনা মুখ থুবড়ে পড়ে,
তবে কোনো সান্ত্বনা থাকে না। হিন্দু কাব্যে লেখা আছে
কূটবুদ্ধিমান এক ক্ষেত্রজ রাজার কথা, প্রজাদের আবদারে
নিজের পত্নী তিনি বিসর্জন দেন। আজ সেই প্রজাদের
হাল-হকিকৎ দেখে ঘৃণায় শিউরে ওঠে গা,
বুঝতে পারি, কতদূর তিক্ততায় জানকীর পাতালপ্রবেশ।
কিন্তু, সে-সব কথা থাক, দ্বিতীয় প্রশ্নে আসি—
যদি পথ ব্যভিচারী হয়?

ড্রাইভার : পাঠকের হজমক্ষমতার কথা ভেবে এই ক্ষেত্রে সাহিত্যের কাঁখে
নীড় বাঁধা ভালো। ঢাউস গ্রন্থখানি পড়া আছে—দুমার রচনা?
আত্স, পোর্তস...প্রমুখেরা, এবং মিলাদির গল্প?
বলো দেখি, মৃত্যুর আগে যদি কেউ মিলাদিকে ধর্ষণ করত,
তা কি পাপ?

মাহুত : পাপ নয়?

ড্রাইভার : অবশ্যই নয়।

মাহুত : সেও একটা কথা বটে। "চরিত্রই নেই যার, তার আবার ধর্ষণ কোথায়?"

ড্রাইভার : ভালো লাগল। তেমন-তেমন স্থানে খোঁচা খেলে
তুমিও যে ফণা মেলতে পারো—এটা দেখে বোঝা যাচ্ছে
যৌবন এখনো যায়নি। কিন্তু ঐ উদ্ধৃতি
ততখানি প্রাসঙ্গিক লাগে না আমার। কথাটা চরিত্রের নয়।
যদি কোনো নারী আপন লাস্য আর সারল্যের অভিনয়ে
ক্রমাগত হত্যার ইন্ধন যোগায়, প্রতিদানে কেন তাকে
ধর্ষণচিহ্নের মত অপমান জানানো যাবে না?
এ জগতে বিনা শুল্কে মেলে না কিছুই। কোনো পাপ, কোনো
নৈতিকতা
সময় ও প্রেক্ষিতের উর্দ্ধে বসতি করে না।
কিছুই শাশ্বত নয় মনে রেখো, পাপ বা পুণ্যও না।

মাহুত : অবশ্যই শাশ্বত পাপ বা পুণ্য। শুধু তার সংজ্ঞাগুলি
স্থানপরিবর্তন করে কাল-ভেদে। মনে পড়ছে,
এই বাক্য তুমিই বলেছ। এইবার আমি কিছু সংযোজন করি—
এ জগতে বিনা শুল্কে মেলে না কিছুই, এটা ঠিক; তাই
যদি কোনো মহিলাকে বলাৎকার-শুল্ক দিতে হয়,
তবে মনে রেখো, ধর্ষণকারীদেরও শুল্ক কিন্তু আগামীতে
অপেক্ষায় থাকে। তাই আজ তোমার স্বপ্নের দেশে দেশে
ধুলো আর মাকড়সার জাল; তাই আজ মাঝে মাঝে
তোমার বন্ধুদল মানুষের মুখচ্ছবি চিনতে পারে না।
মনে কোন্ ইচ্ছা নিয়ে কাজ করছ, সেটা তত বড় কথা নয়,
কী কাজ করছ তুমি, সেটাই জরুরী।
এ এক অনন্তচক্র—হোদায়বিয়ার শুল্ক দিতে হয় মহম্মদকেও
—তার নাম রুশ্‌দি। রুশ্‌দিরও দিতে হয় অতিরিক্ত
লোভামির দাম, তার নাম মৃত্যুভয়।
ভ্লাদিমিরও ব্যতিক্রম নন—মূর্তি ভাঙনের শব্দ শুনতে পাচ্ছ?

ড্রাইভার : একাজ ন্যায্য মনে করো? বড়লোকদের সঙ্গে
ঢলাঢলি করতে হবে বলে মূর্তিভাঙা এখন জরুরি।

মাহুত : মেনে নিচ্ছি। তবু দেখো, মাটিতে ছড়িয়ে আছে ভাঙা টুকরোগুলি।
একে আর ফেরানো যাবে না। ঐ সব নিশ্চেতন ভাঙনকারীরা
তাদের কাজের শুল্ক দিয়ে যাবে ঠিক; সঙ্গে যা থেকে যাবে,
তা হল কর্ম কিংবা যাপনের স্মৃতি। এই যে কাদার চিহ্ন
লেনিনের জামার কলারে, এ কালিমা এরপর ঘোচবার নয়।

হায়! দ্বৈপায়নবংশ যেই ভারতযুদ্ধের গাথা রচনা করেছেন,
সেখানে যে এ-জাতীয় উল্লেখও আছে!

ড্রাইভার : কী উল্লেখ?

মাহুত : নরকদর্শন।

ড্রাইভার : বুঝলাম। কিন্তু, কেন বলছ এই কলঙ্ক ঘোচবার নয়?

মাহুত : যেহেতু তা লিপিবদ্ধ, যেহেতু তা এখনই ইতিহাস।
যদি কোনো দিন...সভ্যতার দূরবর্তী কোনো রাত্রিকালে....
কোনো এক অপরাধপ্রবণ যদি ফের ইচ্ছা করে,
তবে সে একথা উল্লেখ করে ভ্রান্তি ছড়াতে পারে,
ঘোলা জলে ধরতে পারে মাছও।

ড্রাইভার : জনগণ সহ্য করবে?

মাহুত : হিংসা ছিন্নমস্তা। সভ্যতার রাত্রিকালে সব হয়,
এখন করছে না?

ড্রাইভার : বিশ্বাস করি না আমি। এইসব উপদংশ
জনগণই মুছে দেবে ইতিহাস থেকে।

মাহুত : বিশ্বাস? সে তো ধর্মীয় পরিভাষা!
জনগণ মুছে দেবে সব? তবে এসো, অস্বস্তিকর
আরেকটি প্রসঙ্গ তুলি। এডল্‌ফ্‌ হিটলারকে কারা গুচ্ছ গুচ্ছ ভোট
দিয়েছিল?

ড্রাইভার : জানতাম একথা তুলবে। তবে শোনো,
গরিষ্ঠের ভিন্ন নাম জনগণ। আর সেই গরিষ্ঠের সমর্থন
হিটলার কখনো পায়নি। সেইবার নির্বাচনে
স্যোশ্যাল ডেমোক্র্যাট কিংবা কমিউনিস্ট দল
ব্যর্থ হয় গরিষ্ঠতা পেতে। সেই ফাঁকে মসনদে
উঠে আসে হিটলার...ইয়ে...তিরিশ শতাংশ ভোট পেয়ে!

মাহুত : তিরিশ শতাংশ ভোট—সেও কি সমষ্টি ইচ্ছা নয়?

ড্রাইভার : অবশ্যই তাই। কিন্তু তারা তিরিশ শতাংশই
ঠাট্টা করে বলা যায় তিরিশটি রূপার মুদ্রা।
তাও জেনো সজ্ঞানে নয়, যুদ্ধের বিপর্যয়ে বিভ্রান্ত জুডাস।

মাহুত : অবশ্যই বিভ্রান্ত। তাও আমি মেনে নিচ্ছি।
কিন্তু ঐ মারাত্মক ভ্রান্তির ফলে জর্মন জনতারই একটি অংশ

স্বৈরাচারী শাসকের পায়ে এনে দিয়েছিল
মুগ্ধকর লরেল শিরোপা। মার্কিন জনগণ যেরকম এই মুহূর্তে
যুদ্ধ-অর্থনীতি টিকিয়ে রাখছে। হিন্দিভাষী হিন্দুদল,
অবশ্যই এক অংশ, স্বেচ্ছায় পরে নিচ্ছে গেরুয়া পোষাক।
এসব কি পাপ না?

ড্রাইভার : কিন্তু, তুমি ভুলে যাচ্ছ, সংখ্যায় লঘিষ্ঠ তারা,
আশা ও বিশ্বাস সব গরিষ্ঠের প্রতি।

মাহুত : গরিষ্ঠ বা লঘিষ্ঠের তাৎপর্য কতটুকু বলো?
সতেরর বিপ্লব যারা শুরু করেছিল, কিংবা যে গোনাগুন্তি
বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে কাস্ত্রো নেমেছিলেন কিউবার ঘাটে,
পরিসংখ্যানে তারা লঘিষ্ঠই ছিল। তাদেরই কিন্তু তুমি
বিভিন্ন পুঁথিপত্রে বিপ্লবী বলো।

ড্রাইভার : তারা ছিল গরিষ্ঠের ইচ্ছার প্রতিনিধি।

মাহুত : গোঁড়ামি কোরো না। তারা যদি প্রতিনিধি হয়, তবে
জর্জ বুশও তাই। যেহেতু গরিষ্ঠের ভোট
তিনিই হাতিয়েছেন। আর সেই গরিষ্ঠরা
সাদ্দামকে মনে করে যুদ্ধাপরাধী। অপর পক্ষে
সাদ্দামের গরিষ্ঠেরা মনে করে—অপরাধী বুশ। দেখো,
শেষ কথা জনগণ বলে—আমি জানি। কিন্তু, ঐ জনগণ—
তারও কোনো শেষ কথা থাকে!
সে কথা কে উচ্চারণ করে?

(নিরন্তর এত সব কথার মধ্যে ঘুমনো মুশকিল। ফলে, এতক্ষণ চেষ্টা করেও গাড়ি বা হাতি কেউই ঘুমতে পারল না। অতিষ্ঠ হয়ে ঠিক এই মুহূর্তে তারা একসঙ্গে...হ্যাঁ, এক সঙ্গেই তো...গুটি-গুটি এগিয়ে আসতে লাগল ড্রাইভার ও মাহুতের দিকে। যে যার চালকের পাশে বসে মন দিয়ে শুনতে থাকল কথা। কিন্তু, মাহুতের ঐ শেষ কথাটা পছন্দ বা অপছন্দ হওয়াতেই কিনা কে জানে, শুঁড় দিয়ে পেঁচিয়ে ধবে হাতি ধীরে ধীরে গিলতে শুরু করল তার চালককে! তাতে অবশ্য ড্রাইভার বা মাহুত কারুরই কোনো ভাবান্তর হওয়ার কথা নয়। কেননা, কে না জানে, রাত্রিব একটা বিশেষ পর্যায়ে, চিন্তার একটা বিশেষ অবস্থায়, সবসময়েই বন্ধুরা তাদের গিলে ফেলে। তাবপব, গাড়িই হয়ে ওঠে ড্রাইভার, হাতিই হয়ে ওঠে মাহুত; কখনো একসঙ্গে, কখনো বা একটু আগে-পরে এই যা। ফলে কথা চলতেই থাকে।)

ড্রাইভার : তুমি তা ভালই জানো। করে তারা নিজেরাই।
তাদেরই নির্বাচিত বুশ বা রেগন অবিশ্বাস্য দ্রুততায়
তাদেরই ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়।
কিন্তু, এর অন্যদিকও আছে; বৃত্তাকার চিন্তায়

অভ্যস্ত·হবার ফলে তোমার নজর নেই সেইদিকে।
যুদ্ধের বিরুদ্ধে যেই বিক্ষোভগুলি দুনিয়ার পথে-পথে
এই মুহূর্তে আছড়ে পড়ছে, সেখানেও জনগণ আছে।
শোনো, সিরিয়াস গল্‌তি আছে তোমার চিন্তায়,
অনেকক্ষণ তো বকে গেলে, এইবার আমাকেও
বলতে দাও কিছু...

(ইতিমধ্যে মাহুতকে পুরোটাই গিলে ফেলেছে হাতি। কিছুক্ষণ পরে তাব পুনর্জন্ম হবে। ততক্ষণ হাতিকেই কথা চালাতে হবে—এটাই নিয়ম। কিন্তু, ঠিক এই মুহূর্তে খট্ করে বনেট খোলার শব্দ হল। হাঁ করল গাড়ি। এইবার ড্রাইভারের পালা।))।

॥ দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥

॥ তৃতীয় অধ্যায় ॥

ড্রাইভার : আঙুলে-আঙুল ছোঁয়া সমস্ত শপথ যদি মিথ্যা প্রমাণ হয়
মিথুনক্লান্ত দুই শরীরের মাঝখানে যদি নেমে আসে
আঁখিহীন অচিনকুয়াশা,
যদি সব অভিজ্ঞান জলের ত্বকের নীচে ডুবে যায়, আর
প্রেমিক অস্বীকার করে প্রেমিকাকে,
যদি কেউ অসংখ্যের রুদ্ধশ্বাস আশা ও নির্ভরতা
বাতাসে ভাসিয়ে দিয়ে নির্বিকার হেঁটে চলে যায়
সিংহচক্রলাঞ্ছিত হর্ম্যসোপানের দিকে, আর
ক্রমাগত এরকম ঘটে গেলে যদি এটাই নিয়ম ভাবা শুরু করে লোক,
তবু আমি—অন্তত একমাত্র আমি
এমন হীনতার পায়ে নিজেকে আনত করতে বিবমিষা অনুভব করি।

হাতি : তাতে কিছু প্রমাণ হয় না। বঞ্চনার নির্জন সেলে
অন্যেরা কারারুদ্ধ থাকে।
তাদের আকাশ যদি মুক্ত না করতে পারো, তবে
তোমার জখম সত্তা বিশ্বাস্য থাকে না।

ড্রাইভার : সেজন্যই পথের সন্ধান।

হাতি : পথ! এ সময়ে কোনখানে, কার কাছে পথ?
অতিকায় ক্ষেপণাস্ত্রে ঘেরা এই বানিয়াপৃথিবী,
মখমলসদৃশ অজিনআসনে দীর্ঘ দু-দশক শুধু বসে থেকে
আশ্রমের নাম দিয়ে মানুষের খুদখুঁড়ো পকেটস্থ করে,
কেবল বিবৃতি দিয়ে, ইঁদুরে গর্ত খুঁড়ে,

কোন কোন বেশরম জাতির প্রধান পদে অভিষিক্ত হয়।
লোকে তাকে মেনে নেয়, হায়, লোকে তাকে সত্যিই
মেনে নিতে থাকে। এইভাবে আজ
প্রতিটি ইঞ্চি জমি গুণ্ডাদের অধিকৃত। রঙিন বিজ্ঞাপনে
মাতা ও সন্তানের শোষন-স্তন্তন (গর্ভনিরোধক এতে
বেশি বিক্রি হবে?) আর
যাদের দায়িত্ব ছিল সোনা ও রূপার কাঠি নিয়ন্ত্রণ করে
জীয়নের মন্ত্র বলবার, তারা আজ অসহায়।
দ্বৈপায়নবংশ যেই কপট দ্যুতের গল্প বর্ণনা করেছেন,
তারই মত, প্রতিটি দানেই কুপোকাৎ।
ধর্মদানবের থাবা থেকে মানুষকে বাঁচাতে তারা একবার
গুণ্ডাদের সহ্য করে নেয়, আর মুহূর্তপরেই
গুণ্ডাদের হাত থেকে নিস্তার পেতে খুলে দেয় দানবের খাঁচা।
এ খেলার শেষ নেই, পথ নেই কোনো।
আর শোনো, এই হল প্রতিক্রিয়ার মধুমাস,
পথহীনতার শেষে হীনতাই পথ হয়ে ওঠে।

(ড্রাইভারকে গাড়ি প্রায় গিলে ফেলেছে। আর, যে দু-একজন এখনো জানেন না, তাঁদের বলে বাখি, এটা নাটক নয় বলে বাব বার পটভূমি বর্ণনা করা যাবে না। আচম্কাই হাতিই মাহুত হয়ে যাবে এরপর। এরকমই ঘটে আসছে।)

ড্রাইভার : পথ আছে। তুমি বৃত্তের দর্শন থেকে বেরুতে পারছ না।
এক কথা কতবার বলতে থাকবে?
এ জগৎ বৃত্ত নয়, স্পাইর‍্যাল। বৃত্তের সাথে-সাথে
সামনের দিকে প্রবাহও আছে। ইতিহাস ঘুরে আসে,
তবে তা মাত্রান্তরে নিশ্চিতভাবে। আর তাই,
এ সময় একসঙ্গে প্লাবনেরও কাল;
যদি তুমি সুযোগ গ্রহণ করো, যদি
সময় বিচার করে সময় না কাটিয়ে দাও।
এইসব দেশি আর বিদেশি গুণ্ডারা ধর্মীয় জন্তুদের থেকে
পৃথগন্ন নয়, বস্তুত এরাই চালক, পশুরা বাহন শুধু।
তাদের চিহ্নিত করো। উন্মুক্ত করে দাও প্রতিটি
গোপন জুয়াখেলা।

হাতি : অ্যাই...ধর্মীয় জন্তু মানে! আমিও কি জন্তু নই?
ধর্মীয় অমানুষ বলো। তোমরা মানুষরা বাপু
একেকটি মেগালোম্যানিয়াক।

ড্রাইভার : স্যরি ভাই...এটা হচ্ছে...যাকে বলে...স্লিপ অভ্ জিভ।

হাতি : যাই হোক...তারপর?

ড্রাইভার : তারপর—সময়—ফাল্গুনী।
উরুস্তম্ভে যে-যে ব্যক্তি আক্রান্ত হবে
তাদের নির্মমভাবে ঠেলে দাও পিছন সারিতে।
নিজেকে শুদ্ধ করো। কে হচ্ছে নিহত আর...

গাড়ি : কে বা কাকে আঘাত করছে?
নিরপেক্ষ কেউ নয়, কেউ নয় ব্যক্তিগত, প্রত্যেকেই অনিবার্য তীরের ফলক।
যখন সমাজে স্থিতি সহজলভ্য হয় একমাত্র সে সময়েই
সুকুমার বিবেকপীড়ন সাজে। অন্যথায় আক্রমণই পথ।

হাতি : নির্বিচার আক্রমণ? পাপ বা পুণ্যের কোনো ভূমিকাই নেই?

গাড়ি : পাপ-পুণ্য তুমি কী বা জানো?

হাতি : ধরে নাও, শিখেছি তোমারই কাছে।

গাড়ি : তবে এসো বৎস, আর এক শিক্ষা দিই।
পাপ-পুণ্য কিছু নাই, কে বা ভ্রাতা, কে বা আত্মপর?
কে বলিল হত্যাকাণ্ড পাপ? এ জগৎ মহা-হত্যাশালা,
প্রত্যেক পলকপাতে আমি তাকে আঘাত না করি যদি
সে কিন্তু প্রথম সুযোগে আমাকেই হত্যা করবে।
সংযত হতে বলো কোন অধিকারে?
পাপ-পুণ্য দেখতে গেলে শান্তিতে বাঁচতে পারবো?
পাবো খাদ্য, বাসস্থান, চিন্তার পর্যাপ্ত সুযোগ?
সে নিশ্চিতি দেবে তুমি?
যদি না পারো দিতে—সরে যাও,
আমার সমস্যার মোকাবিলা আমাকেই করে উঠতে দাও।

হাতি : কিন্তু তবু পাপ-পুণ্য থাকে। তুমি জানো, থাকে।

গাড়ি : থাকে, আমি জানি। কিন্তু কী করতে বলো?
যখন শান্তিপূর্ণ প্রতিটি পথের শেষে অনিবার্য বেশ্যাপল্লী,
মিটমিটে ল্যাম্পের নীচে দাঁড়িয়ে রয়েছে
ফিনফিনে টুপি পরা ত্রিবর্ণ খানকিরা,
তাঁদের ঠোঁটে [illegible] ঘা,

দরজায় বসে থেকে পান খাচ্ছে পিঙ্গলবর্ণের বাড়িউলি,
তখন সন্ত্রাস ভিন্ন অন্য পথ নেই।

মাহুত : ভুল করছ। গণিকাও শোষিত মানুষ। তার দুঃখ, তার লজ্জা তোমার থেকেও বেশি। তাকে দলে নাও।

গাড়ি : দাদা বুঝি রাবীন্দ্রিক যুগের ফসল?
আপনার বড়পিসি সম্ভবত রানি ভিক্টোরিয়া?

মাহুত : একথার মানে?

গাড়ি : বেশ্যা বিষয়ে কোনো সম্যক আইডিয়া নেই।
এ পেশায় যুতে দেওয়া অধিকাংশ মেয়েদের জীবন বিষয়ে
আপনার কথাগুলো খাটে, এটা ঠিক।
তারা আমাদেরই লোক। কিন্তু, কেউ-কেউ থাকে
যাদের মুখের ভাব অন্যবিধ, যারা নিম্‌ফোম্যানিয়াক।
আমি ট্যাক্সি, আমি 'ইচ্ছে-গাড়ি',
তাদের না চিনলে পরে আমার চলে না।
প্রতিটি সন্ধ্যায় তারা মদ্যপান ভালবাসে,
ভালোবাসে দিস্তে-দিস্তে টাকা আর অবিরত যৌনসঙ্গম।
এদেরই 'বেশ্যা' বলি আমি, বাকিরা শোষিতা।
বখরা ছাড়া বাড়িউলি মাসির সঙ্গে
তাদের অন্য কোনো মনান্তর নেই। সেই ঝগড়া
ব্যবহার করতে পারো তুমি, কিন্তু যদি বন্ধু বানাতে চাও বেশ্যাকে, তবে
পকেটে দৃষ্টি রেখো, আর চেয়ে দেখো
তাদের মুখের ভাবে সরলা এরেন্দিরা নেই, ফলে
যোদ্ধাদের বলে দিও কনডোম পরে নিতে,
সেই সঙ্গে প্রতিমাসে পেনিসিলিন...

মাহুত : থামো, থামো। রুচির বিকারে তুমিও যাও না কিছু কম।
ভুলে যাচ্ছো, গণিকার প্রসঙ্গটি নেহাৎই উপমা...

গাড়ি : কিছুই ভুলিনি। ঐ চমৎকার উপমাটি চালিয়ে যাচ্ছিলাম।
নিজের জয়ের স্বার্থে গুণ্ডাদের ঝগড়া তুমি ব্যবহার করে যেতে পারো।
কিন্তু, যদি ভুলক্রমেও ব্যবসায়ী গুণ্ডাদের বন্ধু করতে যাও,
তবে দেখবে একদিন পারমিট দিতে-দিতে
কাটমানি নিতে-নিতে হতোদ্যম হয়ে গেছ নিজে।
দেখবে তোমারও মুখে রং, গ্যাসল্যাম্পের নীচে
অশেষ প্রতীক্ষায় রজনী যাপিছ।

মাহুত : কী তোমার পথ তবে?

ড্রাইভার : নিজেকে শুদ্ধ করো। ব্যাধিগ্রস্ত বন্ধুদের পুন্নামে পাঠাও।
ফিরে যাও মানুষের কাছে। আবার নতুন শুরু কর।
ফিরে যাও মানুষের কাছে—তুমি তাকে ছেড়ে গেছ বলে
সে এখন দিশাহারা, যথার্থ শিশুর মতন
যখন যেখানে পারছে পরে নিচ্ছে গেরুয়া বা গান্ধী-পোষাক;
সেই সঙ্গে ছিঁড়ে ফেলছে অন্যের স্বপ্ন-উদ্যম।
তার হাত ধরো। যে ভাষা সে বোঝে
তার সঙ্গে সেই ভাষা বলো।

মাহুত : কী ভাষা সে বোঝে?

ড্রাইভার : এই যে স্মরণাতীত জোচ্চুরি ঘটে গেল সংসদঘরে,
তাকে এর সবটা জানাও।

মাহুত : কী ভাষায় জানাবো তা বলবে তো?

ড্রাইভার : বলো:
"দুধে ধোয়া কোম্পানির উড়িল নিশান।
মীরজাফরের দাগাবাজিতে গেল নবাবের প্রাণ।।
ফুলবাগে মোলো নবাব, খোশবাগে মাটি।
চান্দোয়া খাটায়ে কান্দে মোহনলালের বিটি।।"
দেখো, সে তোমার সঙ্গে প্রতিধ্বনি করে উঠবে :
"কী হলো রে জান,
পলাশীর ময়দানে নবাব হারালো প্রাণ।।"

মাহুত : আর কী বলব তাকে?

ড্রাইভার : বলো :
"ধানেতে লাগিলে গান্ধী ধান ছারখার।
দেশেতে লাগিলে গান্ধী দেশে হাহাকার।।"
বলে দেখো, সে নিশ্চিত বুঝে নেবে সব।

মাহুত : এইভাবে কখনো ভাবিনি...!

ড্রাইভার : কিন্তু আগে নিজে শুদ্ধ হও।
জনগণ—সে তো শিশু, তার হাত ধরো।
সে তোমাকে ভালোবাসে, তোমাকেই, সন্দেহ রেখো না।
শিশু যদি অন্যায় করে, কান ধরে টেনে তাকে সভ্যতা শেখাও

এতে সে ক্ষুব্ধ হতে পারে, সাময়িকভাবে
ছাড়তে পারে তোমার আঙুল, তাতে চিন্তা নেই।
অচিরেই ভুল বুঝে আবার সে তোমাকেই বন্ধু ভেবে ডেকে নেবে কাছে।
কিন্তু আগে নিজে শুদ্ধ হও।
বেদীর উপর থেকে বাণী দেওয়া ছাড়ো।
সংখ্যালঘু-সংখ্যাগুরু কাউকেই তোষণ কোরো না।
প্রিয় বা অপ্রিয় হোক মানুষকে সত্যি কথা বলো,
সত্যি বলো, সত্যি বলো, সত্যের বিকল্প হয় না!

মাহুত : সত্য পরম নয়, সেও তো আপতিক।
একাধিক সত্তা আছে তার...

ড্রাইভার : ন্যাকামি কোরোনা। তার স্বার্থে তুমি যা করছ, আর
যত কিছু পারছ না—খুলে বল সব।
তুমি যদি আন্তরিক হও, তথ্যসাম্রাজ্যের বেড়া ভেঙে
সে, দেখবে, তোমাকেই বরণ করবে।
তারপর হানা দাও শত্রুশিবিরে।

মাহুত : সেই থেকে তুমি অস্ত্র ও রক্তের প্রতি পক্ষপাত ঘোষণা করছ।
যা বলছ মানে বোঝো তার? মনে নেই,
সত্তরের যুবকেরা কীভাবে রাস্তায় পড়ে মরছিল
শত্রুর সামগ্রিক খতিয়ান রাখো?
নাকি চাও আরো একটা প্রজন্ম এইভাবে শেষ হয়ে যাক?

ড্রাইভার : প্রয়োজনে শেষ হয়ে যাক। তবে ব্যর্থতায় নয়।
সত্তরের ছেলেদের কৌশলে শুধু ভুল ছিল, এমনটা নয়;
ভুল ছিল দর্শনেও। আমার তা নেই,
সে-সময় এ-সময় নয়, ইতিমধ্যে বিজ্ঞান যথেষ্ট এগিয়ে।
এগিয়ে প্রযুক্তিও; আর যদি ইতিহাস পছন্দ করো, তবে বলি,
অসফল রক্তস্রোতে উনিশশো পাঁচ সাল ডুবে গিয়েছিল বলে
উনিশশো সতেরয় বারুদের গন্ধ মাখতে আপত্তি হয়নি।
সত্তরে পেটো ছিল, আজ আছে রকেট লঞ্চার।
আছে সেই লোকদেরই হাতে—পাঞ্জাবে, কাশ্মীরে, অন্ধ্রপ্রদেশে;
তবু দেখো, তার সামনে রাষ্ট্রের অসহায় মুখ।

মাহুত : মানুষের কথা তুমি ভুলে যাচ্ছো। যাদের মধ্যে তুমি
মাছ হয়ে সাঁতরে বেড়াবে, তারা কি তোমার সঙ্গে আছে?

ড্রাইভার : সত্তরে যত ছিল তার থেকে বহু বেশি আছে।
তবু সব নেই—আমি জানি। কিন্তু ভেবে দেখো,
কাজ শুরু না করেই সবার সমর্থন কখনো পায় না কেউ।
মাও বা গিয়াপ পড়া আজকাল উঠে গেছে জানি, তবু
মনে করো, টলমলে সেই নভেম্বরে
শতকরা কতজন সঙ্গে ছিল লেনিনের, কতজন কাস্ত্রোর ছিল?
কতজন সঙ্গে আছে ওরতেগা, নাজিবুল্লার?
মেঙ্গিৎসু মরিয়ম—তাঁর কথা ভাবো।
কাজ শুরু করতে গেলে তোমার দরকার ঘনবদ্ধ সংগঠন ছাড়া
কয়েকটি পকেট আর আত্মদ্বন্দ্বে ছিন্নভিন্ন রাষ্ট্রমেশিন।
এসময়ে সব শর্ত আছে। এইবার সময়, ফাল্গুনী।

মাহুত : ধৈর্য ধরো, ধৈর্য ধরো, রাষ্ট্র সত্যি দুর্বল কিনা
প্রকৃত বুঝতে আরো কিছুদিন সময় লাগবে।

ড্রাইভার : বিলম্ব করতে চাও? বেশ, সময় গ্রহণ করো।
আমি তো এক্ষুনি কিছু ঝাঁপ মেরে পড়তে বলছি না।
মানুষের কাছে যাও, নিজেকে শুদ্ধ করো;
সেইসঙ্গে মনে রেখো অন্তবর্তীকালীন
দুধ ও মাখনের দিন শেষ হয়ে এল।
অবস্থা বোঝার জন্য অনন্ত সময় আর তোমাকে দেবে না কেউ,
তুমি না করলে কাজ, অন্য কেউ আরম্ভ করবে।

মাহুত : আর তারা অযথাই মৃত্যুমুখে ঠেলে দেবে
নতুন প্রজন্মকে!

ড্রাইভার : আচ্ছা, তুমি সেই থেকে মৃত্যু-মৃত্যু করে একঘেয়ে চেঁচাচ্ছ কেন?
মরলে মরবে তারা। মৃত্যুকেই শেষ ভাবো নাকি?

মাহুত : শেষ নয়!

ড্রাইভার : না। মৃত্যু বিরতি মাত্র। দুখানি কোয়ান্টার-মধ্যে আপাতশূন্যতা।

(হাতিই হয়ে গেছে মাহুত, গাড়ি হয়েছে ড্রাইভাব। তার মানে হাতি আর গাড়ি কি নেই? আছে। দুজনেই মাহুত ও ড্রাইভারের পাশে বসে এতক্ষণ মন দিয়ে শুনছিল। এবার তারাও আলোচনায় অংশ নেবে। কেন না, এবাবের বিষয়ে চার জনেরই সমান অধিকার। তাছাড়া, এমন আলোচনা তো অতীতেও হয়েছে বহু।)

অধ্যায় সমাপ্ত ॥

॥ চতুর্থ অধ্যায় ॥

হাতি : ঈশ্বর মানো নাকি?

ড্রাইভার : মৃত্যু কোনো শেষ নয়—একথা বলতে গেলে
ঈশ্বর মানতে হয় নাকি?

মাহুত : বিশ্বাসীরা সেরকমই বলে। স্বর্গ, নরক আর জন্মান্তর...

ড্রাইভার : তাদের ধারণা নিয়ে তারা থাক। আমি সে অর্থে ভাবি না।

হাতি : তবে যে বললে মৃত্যু আসলে বিরতি?

ড্রাইভার : এর মধ্যে অলৌকিক চিন্তা নেই কিছু।
আমি ভাবি, প্রাণীদের অন্তত দুখানা জীবন থাকে,
মৃত্যু তার মধ্যবর্তী আপাতশূন্যতা।

গাড়ি : সেক্ষেত্রে, জীবনের সংজ্ঞা দাও আগে।

ড্রাইভার : জীবন আসলে এক গঠনপ্রক্রিয়া, প্রতি মুহূর্তে জায়মান।
পশু, কীট, উদ্ভিদ, অথবা মানুষের ক্ষেত্রে
ভিতর ও বাহিরের দ্বান্দ্বিক চাপে
যতক্ষণ সে গঠিত হয়, ততক্ষণ জীবনপ্রক্রিয়া।
এই সঙ্গে বলে রাখি—মৃত্যু মানে শারীরিক মৃত্যুর কথা।

মাহুত : মৃত্যু কেন আপাতশূন্যতা?

গাড়ি : তার আগে বলো, মৃত্যুর আগে-পরে দুখানা জীবন কীরকম?

ড্রাইভার : জন্ম থেকে মৃত্যু—এই প্রথমার্ধে মানুষের যে গঠনপ্রণালী
পরিবেশ তাতে এক মুখ্য বিষয়। অর্থাৎ শৈশব, শাসনপদ্ধতি :
—"বৃষ্টিতে ভিজোনা খোকা, এক্ষুনি ঠাণ্ডা লাগবে।"
—"দ্যাখো তো, গোপাল কত ভালো-ভালো নম্বর পায়!"
—"ওরে হনুমান, তুমি বিড়ি টানছ লুকিয়ে লুকিয়ে!"
এই হল পরিবেশ। এর ফলে কেউ ওঠে স্কুলবাসে, কেউ যায়
ছাগল চরাতে
এভাবে বাড়তে থাকে শিশু, এর সঙ্গে কিছু কিছু ক্রিয়া
তার দ্বারা সংঘটিত হয়ে চলে মৃত্যু অবধি।
যদি সে কবিতা লেখে, তাহলে সে কবি হয়,
যদি চযে হাল, তবে চাষী;

মিথ্যা বলা পেশা হলে ব্যবহারজীবী হয়,
যদি পেশা হয় মিথ্যা লেখা—তাহলে সাংবাদিক।
বস্তুত এইভাবে তারই দ্বারা সংঘঠিত ক্রিয়া
তাকে কোনো অস্তিত্ব দেয়। এই পর্ব মৃত্যু অবধি।

হাতি : মৃত্যুর পরের পর্বে চলে যাও।

ড্রাইভার : তখন অস্তিত্ব তার রূপায়ন বদলে নেয় কিছু।
যেমন সে ছিল আর যেরকম ছিল না কখনো, সেইসব মিলেমিশে
গড়ে ওঠে তার এক ভিন্ন পরিচয়। এই তার দ্বিতীয় জীবন।

মাহুত : তেমন উদাহরণ কিছু দিতে পারো যদি, বুঝতে সুবিধা হয়।

গাড়ি : আমি একটা বলি শোনো। কোনো এক তাজিক কথিকা থেকে
লেনিনের পরিচয় দিই :
"অন্ধকার থেকে লেনিন গড়ে তুললেন ফলের বাগান
মৃত্যু থেকে জীবন।
মিলিতভাবে ঐসব যোদ্ধার চেয়ে
তিনি ছিলেন ঢের শক্তিশালী।
হাজার বছর ধরে তারা যত কিছু ধ্বংস করেছিল
তিনি একাই গড়ে তুললেন ছ' বছরে।"

মাহুত : ব্যাখ্যা করো।

গাড়ি : 'ফলের বাগান' কিংবা 'জীবন' এখানে তুমি
প্রতীকার্থে ধরে নিতে পারো।
কিন্তু, যদি যুক্তি মানো, একাই লেনিন কিছু করতে পারেন না,
আর, দু'বছরে তো নয়ই। বস্তুত তত কিছু
করেননি কখনো লেনিন।
কিন্তু তবু সত্য আর কল্পনার মেলবন্ধনে গড়ে উঠল তাঁর এক
নতুন মুখচ্ছবি; আর বর্তমানে মূর্তিভাঙনকালে ঠিক এইভাবে
সত্যের খাপে খাপে পর্যাপ্ত মিথ্যার মিশেল চলছে। ঠিক কিনা?

ড্রাইভার : একদম ঠিক।

মাহুত : অস্তিত্ব বলছ তুমি পৌরাণিক এই বিবর্তন?

ড্রাইভার : অস্তিত্ব নয়? তাজিক কথিকায় যেই মুখচ্ছবি উদ্ভাসিত হল
তারই সংক্রমণ পরবর্তী প্রজন্মের অন্ধকার চোখে-চোখে
জ্বেলে দিল হাজার জোনাকি।
মঙ্গল পাঁড়ের গল্প আজো কত তরুণের মনে

জ্বেলে দেয় শিখা আর সে আগুন অস্থি পুড়িয়ে তারা
ইতিহাস গড়ে। অথচ মঙ্গল পাঁড়ে সত্যি সত্যি কেমন ছিলেন সেটা
বিশদ জানে না কেউ। তবু তাঁর উপস্থিতি এখনো অম্লান।
এই সব গল্পগুলি মানুষের স্মৃতিলোকে ক্রমশ গঠিত হতে থাকে,
প্রেরণা হিসাবে এরা আজকের দিনে বিভিন্ন ঘটনার দাহ্য ইন্ধন।
অস্তিত্ব ছাড়া একে অন্য কী বলতে পারি বলো?

হাতি : কিন্তু, এই দ্বিতীয় জীবন—এতো আমজনতার নয়!
নিতান্ত পান্‌সে তারা; কোথায় তাদের স্মৃতি;
কোথায় বা সেরকম ক্রিয়া আর দ্বিতীয় গঠন?
দ্বিতীয় জন্ম কি তবে শুধুমাত্র মহাকায় এবং জনপ্রিয়দের?

ড্রাইভার : বিশেষ বা নির্বিশেষ প্রতি মানুষের এই দ্বিতীয় জন্ম থেকে যায়।
ডি-এন-এ, বা জিন গঠনের মধ্যে তার কাজ।
নিতান্ত জড়ভরত—সেও বাঁচে বংশকথিকায়,
বাঁচে গাঁওবুড়োদের আফিমপ্রলাপে, ঠাকুরমার নিশীথগল্পে,
অথবা দীর্ঘদিন প্রবাহিত হতে থাকা পুরোনো কেচ্ছায়।
শৈশবে গল্প শুনেছি এক তস্য ঠাকুর্দার কথা,
অতিরিক্ত বিয়ে করে কীভাবে একবার তিনি হেনস্থা হন।
প্রতি মানুষের থাকে এইভাবে দ্বিতীয় জীবন।
ফলে মৃত্যু শেষ কথা নয়।

মাহুত : মানলাম নয়, তাতে প্রমাণ হচ্ছে কিছু?

গাড়ি : প্রমাণ হচ্ছে না?
সময়পথের মোড়ে-মোড়ে নিজেদের হাসি-কান্না-হৃদয়-মনীষা যারা
আহুতি দিয়েছে, তাদের প্রশ্বাস আর ভ্রূকুঞ্চনে গায়ে
ইতিহাস এঁকে দেবে অনশ্বর টিকা। তাদের দ্বিতীয় জন্ম
অন্যদের প্রাণিত করবে। তাদের বিনাশ নেই,
তারা বীর, তারা আকাশে জাগাত ঝড়
তাদের কাহিনি শোষকের খুনে, গুলি-বন্দুক বোমার আগুনে
চির রোমাঞ্চকর।
মৃত্যু কোনো শেষ নয়, মানুষের স্মৃতিলোকে
মৃত্যু এক নব উদ্বোধন।

মাহুত : তোমাদের কি মনে হয় না, আত্মহত্যাকামী কোনো মানুষের কাছে
মৃত্যুর এমন তত্ত্ব যথেষ্টই উৎসাহ যোগাবে?

ড্রাইভার : সে যদি নির্বোধ হয়, তবে ভিন্ন কথা।

নয় তো যোগাবার কোনো কারণ দেখি না
আত্মহত্যা করে কেন লোক? যেহেতু জীবন থেকে মুক্তি পেতে চায়।
তার কাছে মৃত্যু মানে অবসান।
যদি সে বুঝতে পারে মৃত্যু কোনো শেষ নয়,
বরং নতুন করে জীবনেরই ফাঁদে তার পা পড়তে চলেছে, তবে
তার কাছে আত্মহত্যা প্রহসন মনে হতে পারে।
সেই গল্প মনে আছে? একজন বীতশ্রদ্ধ ট্রেনে কাটা পড়তে গেছিল,
এমনই কপাল তার, সেইদিনই রেল ধর্মঘট।
বেচারির অবস্থাটা ভাবো!

হাতি : ছোট একটা ফাঁক থাকছে। তোমরা তত্ত্ব অনুসারে
ঐ যে দ্বিতীয় জন্ম—সে অস্তিত্ব বুঝবে শুধু প্রথম জন্মের মধ্যে
বেঁচে-বর্তে থাকা মানুষেরা; সাধারণভাবে.
যে মরলো তার তো আর অনুভূতি-উপলব্ধি নেই।
অর্থাৎ, ট্রেন কত জোরে যাচ্ছে সেটা শুধু বুঝতে পারে
স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা ফ্ল্যাগম্যান। যেহেতু আপাতভাবে
তার স্থৈর্যের অনুপাতে ছুটন্ত ট্রেনের গতি নির্ধারিত হয়।

গাড়ি : কেবল তা কেন হবে? স্থির প্ল্যাটফর্ম দেখে
ট্রেনের যাত্রীও তার গতি বুঝতে পারে।

মাহুত : যদি জেগে থাকে তবে বোঝে।
ঘুমন্ত যাত্রীর কাছে গতিসঞ্জাত কোনো শিহরণ নেই।
আত্মহত্যাকামী কোনো ব্যক্তি যদি ভাবে :
"থাক্ না দ্বিতীয় জন্ম, আমি তো সেসব কিছু দেখতে যাচ্ছি না।
আমার সে অস্তিত্ব নিয়ে জীবিতরা থাক।
ইতিমধ্যে নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাই আমি।" তবে?

ড্রাইভার : কিন্তু সে তো জানে, বুঝুক বা না-বুঝুক সেই
দ্বিতীয় জন্ম থেকে যায়।

মাহুত : মানুষ তো বহুকিছু জানে। ক্ষতস্থানে যন্ত্রণায়
যখন সে ব্যথার বড়ি খায়, তখন তো এও জানে
সে ওষুধে সাময়িক স্নায়ুঝিমুনির পর
আবার যন্ত্রণা তার নেতৃত্ব গ্রহণ করবে।
তবু সে ব্যথার বড়ি খায়।

ড্রাইভার : সেক্ষেত্রে তোমার মত বলো।

মাহুত : আমাদের আলোচনা এইবার প্রকৃত বিরোধের বুঝি সম্মুখীন হল।
আইনস্টাইনী ট্রেন কিংবা শ্রয়ডিংগারী বেড়ালের স্তর আর নয়,
আমার চিন্তা যদি উন্মুক্ত করি, প্রলাপ ভাববে তুমি।

গাড়ি : ভনিতা করো না। বলে ফেলো।

মাহুত : ট্রেনের যাত্রীটি যদি ঘুমিয়ে না থাকে...

ড্রাইভার : অর্থাৎ?

মাহুত : একজন আত্মহত্যাকারী কেবল তখনই তার চেষ্টায় ক্ষান্তি দিতে পারে,
যখন সে বুঝে যাবে মূলত মৃত্যু এক নিরীহ ঠাট্টা।
দ্বিতীয় জন্মেও তার অনুভূতি থেকে যাবে ভিন্ন মাত্রায়।

ড্রাইভার : কী ভাবে তা সম্ভব?

হাতি : যেভাবে বাস্তুসাপ খোলশ ছড়িয়ে আসে মাঠে,
যে ভাবে দীর্ঘযাত্রী হিচ্-হাইকার
অবসন্ন বোধ করলে বাড়তি রসদ্ ফেলে দেয়,
আকাশের আরো কাছে পৌঁছবার অধীর ইচ্ছায়
বেলুন কেবিন থেকে যেভাবে বালির বস্তা ফেলে দেওয়া হয়,
যেইভাবে খসে পড়ে ব্যাঙাচির লেজ,
সেইভাবে শুধুমাত্র চেতনাকে সম্বল করে
ভিন্ন কোন মাত্রায় পৌঁছে যায় যদি
যে মাত্রা আমাদের...বলতে আমি ভয় পাচ্ছি...কল্পনাতীত!

ড্রাইভার : শরীরবিহীন কোনো চেতনার অস্তিত্ব তাহলে সম্ভব?

মাহুত : কতটুকু জানি আমরা? কীভাবে নিশ্চিত হবো?

গাড়ি : সত্যিই তবে এক প্রকৃত বিরোধের শুরু এইমাত্র হল।
এই যা বললে তুমি, সেসব সত্যি-সত্যি ভাববাদী কথা।
দুনিয়ার নোংরাতম পুরুত-পাদ্রি আর ইমামেরা,
এই গুলতাপ্পি দিয়ে এতাবৎ অত্যাচার চালিয়ে এসেছে।
তাদের সঙ্গেই তুমি একমত তবে...ভাবতে কষ্ট হচ্ছে...
মনে হয়, আমাদের কথাবার্তা শেষ করা ভালো।

মাহুত : বুঝিয়ে বলতে দাও অন্তত আমাকে...

ড্রাইভার : লাভ নেই। তুমি যা বলবে
তার সঙ্গে একমত আমিও হব না।

হাতি : কী করে জানছ, হতে পারবে না?
চেতনা অমান্য করা যান্ত্রিক বস্তুবাদী ভুল।

ড্রাইভার : অস্বীকার করছে না কেউ। কিন্তু তার পরিবর্তে
চেতনাকে সর্বস্বত্ব অর্পণ করা...ভাবতে লজ্জা হচ্ছে,
মনে এই সংস্কার নিয়ে এতক্ষণ কথা বলছিলে!
তার থেকে চুপ করো, তিক্ততা বাড়িয়ে লাভ নেই,
কাল তো নিজের কাজে ফিরে যাবো।

মাহুত : শোনো, আমি ভাববাদী নই। অনর্থক উত্তেজনা বহন করছ কেন?
ধর্মীয় চরদের আমিও তোমার মত ঘৃণা করি,
মান্য করি না ঐ শঙ্কর-নিট্‌শে-কান্ট
কিংবা সমধর্মী অন্য দার্শনিকদের।
বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ আমারও পাথেয়। কিন্তু ভেবে দেখো,
বস্তুর সংজ্ঞাই আজ বিপ্লবের মুখে।
এটা কোনো সংশোধনবাদী কথা নয়; নয় কোনো অতি-বাম বুলি।
ব্রহ্মাণ্ড আমার জন্য যে বিস্ময় জমিয়ে রেখেছে
আমি তার যোগ্য হব কিনা—এটাই চ্যালেঞ্জ।
ধৈর্য ধরে শোনো, যদি পছন্দ না হয়
ছুঁড়ে ফেলো এই মতামত। আমাকে শুধরে দিও,
আমিও তো ভুল করতে পারি,
আমাকে সে ভুলের গ্রাস থেকে বাঁচাবে না তুমি?

ড্রাইভার : বলতে পারো। আমরা কিন্তু অনিচ্ছায় শুনছি...

মাহুত : তাই শোনো।
শারীরিক মৃত্যুর পরও চেতনার অস্তিত্ব থাকে—
একথা মানতে সত্যি অসুবিধা হয়। কিন্তু কেন হয়?
যেহেতু আমরা জানি চেতনা বস্তু নয়,
বস্তু থেকে ভিন্ন কোনো কিছু।

গাড়ি : আমরা যা জানি—শারীরিক বস্তু সমাবেশে
যে সমস্ত ক্রিয়া আর প্রতিক্রিয়া হয়
চেতনা তা বোধগম্যভাবে প্রতিধ্বনি করে।
চেতনা প্রতিফলন; বস্তু থেকে ভিন্ন নয় তা?

মাহুত : তার আগে ঠিক করো বস্তু কাকে বলে?
ধ্রুপদী যে পদার্থবিজ্ঞান তাতে বস্তু মানে—যার
আকার ও আয়তন আছে, পরিমাপ করা যায় যাকে।
অর্থাৎ, স্বরূপ সন্ধান।_

শক্তির তেমন স্বরূপ প্রিন্সিপিয়া ম্যাথমেটিকা
আয়ত্ত করেনি। একেবারে করেনি তা নয়, কিন্তু
যেটুকু করেছে সেটা সম্পূর্ণ নয়।
সে জন্যই বিশ্বের যাবতীয় উপাদান বস্তু আর শক্তি—দুই ভাগে
বিভক্ত করেছিলেন ধ্রুপদী পথের বিজ্ঞানী।
ফোটন বা কোয়ান্টা আজ গূঢ়শব্দ নয়,
অভিকর্ষ মাপা যায় গ্র্যাভিটন দিয়ে;
অনিশ্চয়তা তত্ত্ব ভেঙে নিরপেক্ষ সমীক্ষণ হয়ত বা সম্ভব হবে।
তাই আজ শক্তিও বস্তুরই ভিন্ন এক রূপ, নাম তার ভিন্ন শুধু,
নামে খুব আসে যায় কিনা, সেকথা জুলিয়েট বেশ সহজে বলেছে
দ্বিতীয় অঙ্ক আর দ্বিতীয় দৃশ্যে।
এইভাবে এই যুগ বস্তুবাদের যুগ, মানবপ্রগতি সেই সূচিত করছে।
ঐতিহাসিক ভাবে ভাববাদ মৃত, যেহেতু সে যুগে যুগে
যে কোনো প্রশ্নের সামনে হতবাক্ হয়ে
ঈশ্বর নামক কোনো পরম ধারণা মেনে নেয়।
অথচ পরম কিছু নেই। দেখো, আজো হিন্দুরা বলে
ব্রহ্ম সেই ধারণা যা বাক্-চিন্তা-জ্ঞানের অতীত।
আদিবিস্ফোরণপূর্বে ব্রহ্মাণ্ড আদৌ ছিল কিনা,
থাকলে কোথায় ছিল, না-থাকলে কোথায় ছিল না—
এসব প্রশ্নের সামনে প্রকৃতিবিজ্ঞানীও কিঞ্চিৎ মাথা চুলকে
মোদ্দা যা বলেন, সেটা ওরকমই
বাক্-চিন্তা-জ্ঞানের অতীত কিছু বটে।
তাহলে কি ভাববাদ আধুনিক প্রকৃতিবিজ্ঞান?
কখনই নয়। সূক্ষ্ম কিন্তু নিশ্চিত পার্থক্য রয়েছে।
হিন্দুরা মনে করে, আমাদের বাক্-চিন্তা-জ্ঞানের জগতে
ব্রহ্মের অনুমান কিছুতেই সম্ভব নয়,
যেহেতু পরম সেই ধারণাটি।
এই হচ্ছে ভাববাদ; কোথাও না কোথাও সে থম্‌কে দাঁড়ায়
গলবস্ত্র হয়ে ভাসে অশ্রুলালাজলে।
প্রকৃতিবিজ্ঞানী কিন্তু জ্ঞান বা অজ্ঞান—সবই আপতিক ধরে নেন;
পথের যে চিহ্নে এসে ভক্তেরা মাথা নিচু করে,
বিপ্লবী সেখানেই আবিষ্কার করে এক
প্রকৃতির ছুঁড়ে দেওয়া দস্তানা। বিজ্ঞান বলে :
"বিস্ফোরণপূর্বেকার কিছু আমি এখনো জানি না,
কিন্তু আমি চেষ্টা করছি, দেখো, ঠিক জানতে পারব।"

ভাববাদ-বস্তুবাদে এখানেই প্রকৃত তফাৎ,
বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ ব্রহ্মাণ্ডের যোগ্য দর্শন।

হাতি : সে সব তো বোঝা গেল। কিন্তু ঐ চেতনার প্রসঙ্গটা
আগে ব্যাখ্যা করো।

মাহুত : দেখো, আমি স্বচ্ছভাবে নিজেও জানি না—এটা
মেনে নেওয়া ভালো।
শক্তি যদি পরিমাপ করতে পারা যায়, তবে
চেতনাও একদিন মাপা যেতে পারে;
সেইদিন চেতনাও বস্তু মানতে হবে;
কতকিছু ঘটতে পারে, কেউ কিছু বলতে পারে না...
অন্ধ বাউল কিংবা তাইরেসিয়াস
চেতনায় জানতেন প্রকৃত পথের দিশা, তাই
তাদের চোখের কোনো দরকার হয়নি।
কিংবা ধরো...ধরো, সেই ব্যাঙাচির লেজের বিষয়...
ব্যাঙ আগে জলচর ছিল, বহু যুগ পূর্বেকার কথা,
সে সময়ে লেজের দরকার ছিল তার, ক্রমে ক্রমে
বিবর্তনে কোন এক বিশেষ দশায়
উভচর রূপ হলো তার, যার ফলে, আমরা সবাই জানি,
প্রয়োজন মিটে গেছে বলে, জীবনের প্রাথমিক ধাপে তার
পুচ্ছ খসে যায়। ব্যাঙাচির লেজ থাকে, ব্যাঙের থাকে না।
কারণ ব্যাঙের সেটা প্রয়োজন নেই।
সাইবারনেটিক্স্ নামে নতুন যে প্রযুক্তিধারণা
এই মুহূর্তে হাজারদুয়ারী আর ক্রমজায়মান,
তারই কোনো সম্ভাব্য উৎকর্ষশিখরে—
যখন রোবটই সব কাজ করতে সক্ষম হবে, প্রায় সব কাজ,
তখন হয়তো দেহ হয়ে উঠবে বহুদূর প্রয়োজনহীন।
সে সময়ে কী হতে পারে ভাবো?
প্রজাতির লুপ্তি হবে, নাকি বিবর্তনে
খসে পড়বে শরীরের বহু অংশ, যেমন ব্যাঙের লেজ?
সে সময়ে চেতনাও উপযোগী কোনো মাত্রান্তরে
পৌঁছতে পারে যদি
শরীর তাহলে সত্যি প্রয়োজন হয়তো হবে না।

ড্রাইভার : পাগলামি ছাড়ো। কল্পবিজ্ঞান পড়ে-পড়ে মাথাটা গিয়েছে।
শরীর সত্যিই যদি খসে পড়ে, তবু মগজটা পড়ে থাকবে থলথলে,

মার্কিনি সিনেমায় যেমন দেখায়।
কিন্তু, মগজও বস্তু, যদিও সারাৎসার, খুলির আধারে থাকে,
তবু তাকে চেতনা বলে না।

মাহুত : খুলি যে আধার সেটা তো মানলে। যদি বলি,
মগজও আধার। ঐ ধূসরবর্ণের কোষবনানীর মধ্যে যা
সংগুপ্ত আছে, সেটাই চেতনা।

গাড়ি : সার্জেন অবশ্য সেই বনে এখনো ঢোকেননি...

মাহুত : একদিন ঢুকবেন। অবশ্য,
এও কোনো শেষ কথা নয়, চেতনাও লীন হতে পারে।
আপেক্ষিক নতুন বিজ্ঞান বলে : চলমান সকল বস্তুই
তাদের গতির দিকে সঙ্কুচিত হয়।
সময়ের তীর যতো দ্রুতবেগে ছুটতে থাকবে,
হয়তো চেতনাও তার অবয়ব কুঁকড়ে নিতে নিতে
হয়ে উঠবে কালো গর্ত, হয়তো সেদিনই সেই
'শেষের সেদিন'; সেইদিনই কয়ামৎ, বস্তুত তখনই মৃত্যু।
কিংবা যদি চেতনারও ভর থাকে কোনো,
তবে হয়তো মৃত্যু নয়, তবে হয়তো ক্ষুদ্রতম কোন বিন্দুদেহে
প্রচণ্ড সেই ভর সংহত হতে-হতে আচম্‌কা বিস্ফোরণে
পুনর্বার ছড়িয়ে পড়বে—তারপর, শুভ জন্মদিন।
এর বেশি এই মুহূর্তে ভাবতে পারি না।

গাড়ি : কিন্তু, এসব কিছু আদপেই প্রমাণিত নয়।

মাহুত : নয়, কিন্তু প্রমাণিত হবে। এই যে তুমি যন্ত্র হয়েও কথা বলছ,
বিজ্ঞানের ঊষাকালে এসব বললে লোকে গুছিয়ে ঠ্যাঙাতো।

ড্রাইভার : কি করে নিশ্চিত হচ্ছো প্রমাণিত হবে?

হাতি : না হলে মৃত্যু তুমি জয় করতে পারবে না।

ড্রাইভার : আমি কিচ্ছু মানছি না; অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী।
বিজ্ঞানের বদহজম ছাড়া এর অন্য মানে নেই।
তর্কের খাতিরে, যদি প্রমাণিত হয়, তবে
যখন তা হয়ে যাবে, তখনই এসব নিয়ে কথা বলা ভালো।

হাতি : এখন থেকেই কথা বলে যেতে হবে।
কল্পনাকে উন্মত্ত করো যুক্তিযুক্তভাবে,
তা নাহলে উদঘাটন সম্ভব নয়।

মুক্তি চাই মানুষের—শোষণের থেকে চাই,
অজ্ঞানতা থেকে চাই, মৃত্যুর থেকে চাই,
সেজন্যই মুক্তি চাই সময়ের থেকে।
সময়ের গণ্ডী ভেঙে ইস্কুল ছুটির ঘণ্টা আমরাই বাজাবো একদিন।

ড্রাইভার : সে সব পরের কথা। আপাতত মানুষের
খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান একান্ত দরকার।
সে জন্য ভেবেছ কিছু?

মাহুত : অবশ্য ভেবেছি।
আগুনের কুণ্ড ঘিরে বসে থেকে, আর বিড়ি টেনে
জগৎকে ব্যাখা করা যথেষ্ট নয়।
পৃথিবী পাল্টাতে হবে—সেও এক শ্রমসাধ্য কাজ।
সেই জন্যই ফিরে যাও তুমি,
মানুষের কাছে যাও, মানুষকে সংগঠিত করো।
আমি এখানেই থাকি, সামাজিক ব্যবধান ঘোচাবার পর
আরো যত যুদ্ধ আসবে
তার মোকাবিলা যাতে করা যায়, ঠিক করি সেই প্রকরণ।

ড্রাইভার : এড়িয়ে থাকছ?

মাহুত : এখনো সন্দেহ? শোনো, স্তালিন বলেছিলেন :
প্রতিটি কর্মীকে তার স্বাভাবিক প্রণোদনাক্রমে
কাজ দিতে হবে। অন্যথায় পণ্ড হয় সব।
নতুন ঘাসের মত আমলাতন্ত্র বাড়ে।
মানুষে ঢেউশীর্ষে ভালো থাকো তুমি, সেখানেই ফিরে যাও;
রণ-রক্ত-সফলতা তোমার উষ্ণীষ।
আমি থাকি নির্জনে, অসীম রহস্য আর অনিবার্য গতি
স্নায়ুগ্রাহ্য করবার চেষ্টা করে যাই।

গাড়ি : জনমানসের থেকে এইভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে কতদূর যেতে পারবে তুমি?
সমাজের নিয়ন্ত্রণ ছাড়া ভুল পথে পিছলে পড়ে যেতে
সময় লাগে না। এমনিই মনে হচ্ছে
ভাববাদী চোরাটান তোমার মগজে।

মাহুত : বিচ্ছিন্ন হব কেন? মাঝে মধ্যে এইভাবে যাত্রীদের নিয়ে তুমি আসবে না?
আরো আসবে কাঠুরিয়া, মধুকর, বিট অফিসার।
সর্বোপরি সমাজের থেকে মাসপয়লা মাইনে পাই,
এর থেকে বড় নিয়ন্ত্রণ আর কই?

ড্রাইভার : সেটুকু যথেষ্ট নয়। মানুষের আন্দোলন থেকে
নিজেকে না সেঁকে নিলে স্নায়ুতে নিহিত শীত
অবিকৃত থাকে। থাকে জাড্য, নামান্তরে যাকে মৃত্যু বলে।

মাহুত : হে দূর দেশের বিশ্ববিজয়ী দীপ্ত ঘোড়সওয়ার,
তুমি ফিরে যাও। রবিনসন ক্রুশো নই আমি।
আন্দোলনে, কারাগারে, আত্মগোপনে, কিংবা
মধ্যরাতে ট্রেঞ্চের ভ্যাপ্‌সা গরমে—মনে রেখো,
আমি আছি, সঙ্গে সঙ্গে আছি।
পুলিশের লাঠি খেয়ে যখন উষ্ণ রক্তে ভিজে ওঠে চুল,
মনে রেখো আমি সেই রক্তপাতে আছি।
সারাদিন পথেঘাটে চাঁদা তুলবার পরে
যখন খিদেয় পিত্ত গলা দিয়ে উঠে আসতে চায়,
আমি আছি, সঙ্গে সঙ্গে আছি।
যখন মিছিল শেষে অবসন্নতায় ভেঙে আসে দেহ,
ধর্মঘট ভেঙে দেয় খাকি উর্দি পরা সভ্য গুণ্ডারা,
ঘৃণ্য কোনো চুক্তিপত্রে সই করতে বাধ্য হতে হয়, আর
অসহায় আক্রোশে চোখ থেকে ঝরে পড়ে অ্যাসিড-অশ্রু,
মনে রেখো,
আমি আছি, সঙ্গে সঙ্গে আছি।
এবং, তুমিও আছো।
যখন সন্ধ্যা তার অনশ্বর তর্জনী দিয়ে
মুছে দেয় একে-একে মায়াময় অরণ্যপ্রদীপ,
আমি ও আমার বন্ধু ঘরে ফিরে আসি
ধাড্ডা ঘাসের বন ভেঙে—সে সময়ে, মনে রেখো,
তুমি আছো, সঙ্গে সঙ্গে আছো।
যখন রাত্রি জাগি, মাথার উপরে জ্বলে উদাত্ত নীহারিকাদেশ,
তুমি থাকো, সঙ্গে সঙ্গে থাকো।।
অতন্দ্র চেয়ে থেকে ভেদ করতে চেষ্টা করি তমিস্রাযবনিকা,
কী আছে ওপারে আর কতদূর আছে?
কীভাবে এলাম আমি, কেন্‌ই বা এলাম আর
কতদূর যাবো? কীভাবে মানুষ তার লোভ-দুঃখ ক্ষুদ্রতা থেকে
উদ্ধার খুঁজে পাবে? কতদুর, আরো কতদূর?
এইসব চিন্তায়, মানসিক রক্তপাতে
তুমি থাকো, সঙ্গে সঙ্গে থাকো।
আসলে আমরা এক। একই সঙ্গে দ্বিতীয় ও অদ্বিতীয়

ড্রাইভার	:	অ্যাই গাড়ি, তোমার রেডিয়েটর থেকে জল পড়ছে কেন?
গাড়ি	:	তোমার গলাটাই বা ভাঙা লাগছে কেন?
হাতি	:	বন্ধুগণ, ন্যাকামি কোরো না। যেন বাংলা নবেল থেকে উঠে এলে সব! শোনো, একটা কথা মনে রেখো, প্রাণের জন্ম থেকে বিপ্লব শুরু হয়ে গেছে। আমরা তার মধ্যপথে আছি।
গাড়ি	:	ব্যক্তির উপরে আর বিপ্লবের গতি খুব বেশি নির্ভর করে না।
ড্রাইভার	:	আর, বিপ্লব চলে শেষ পর্যন্ত। তুমি চাও বা না-চাও।
মাহুত	:	এ যাবৎকাল সে চলেছে শুধু নরকের মধ্য দিয়ে আত্মশুদ্ধি ঘটাতে ঘটাতে।

সৌতিকথন

॥ বন্দনা, আত্মপরিচয় ও গ্রন্থোৎপত্তির কারণ ॥

আদিতে পূজি গো আমি বসুন্ধরা মাতা।
যাঁহার প্রসাদে জাগে ফল-পুষ্প-পাতা।।
অতঃপর বন্দি নাচিকেত বৈশ্বানরে।
পিতা ও সন্তান যিনি আমারই উদরে।।
যিনি কাল, যিনি গতি, অদৃশ্য অপার।
তাঁরেও বন্দনা করি ষোড়শোপচার।।
নিম্নগামী সদা যিনি, আধারে আধেয়।
বসুগণে কোল দেন, শান্তনুকে দেহ।।
তাঁরই তীরবর্তী এক বাঙালি নগরে।
কাহিনি আরম্ভ করি কাদম্বরী-বরে।।
বৎসরে প্রথম মাস, ঊনত্রিশ দিনে।
ভূমিষ্ঠ হলেম সাধ-আয়োজন বিনে।।
পিতৃ-মাতৃকুলে সব মালাউন ছিল
তাঁদের যতেক পাপ আমাতে অর্শিল।।

সিংহ রাশি, লগ্নে মেষ, দিন শনিবার।
সেই হতে শনি প্রিয় দেবতা আমার।।
অনন্তর অস্থিরতা পিছু না ছাড়িল।
যথা যাই তথা ফেরে অসুখে বাড়িল।।
ইতিমধ্যে জগন্ময় স্বপ্ন ভাঙে-গড়ে।
নূতন মঙ্গলকথা প্রয়োজন পড়ে।।
কে বা নেবে সেই কার্য—স্বপ্নে কহে রবি।
শুনিয়া কবিরা দেখি নিরুত্তর ছবি।।
মাটির চেরাগ আমি, উপরে অলস।
পি-পু-ফি-শু দিন যায়, স্বভাবের দোষ।।
তথাপি পিদিমজন্ম—এই এক দায়।
পলাবারে মন যায়, নাহিকো উপায়।।
বহু ভেবে কহিলাম, যাও দাদু ঘর।
আমার যেটুকু সাধ্য করিব সত্বর।।
করি তো গাঙ্গেয়পণ, কী করে কী করি।
হেমন্তে বসন্তরোগ, এই বুঝি মরি।।
কোথা ভাব, কোথা ভাষা, হায় ছিরি-ছাঁদ।
বাড়ে ক্ষুদিরাম বাপা, এ বিষম ফাঁদ।।
পয়ার, লাচাড়ি কিংবা 'ফোর-কোয়ার্টেট।
কাম নাকি দ্রোহ-শোক, কীসে ভরে পেট।।
এরও পরে বন্ধুদল বলে বাড়ি এসে।
অ্যাম্‌বিগুটিপোকা নাকি আছে আজো দেশে।।
ভীরু জয়দেব বলে সাগর পেরিয়ে।
সামান্য পোকার গর্বে খর্ব হল হিয়ে।।

॥ বিধিসম্মত সতর্কীকরণ ॥

এই সে বিবরণ যা নৈমিষারণ্যে দ্বাদশবার্ষিক যজ্ঞের সময় লোমহর্ষণপুত্র সৌতির মুখে শুনেছিলেন কুলপতি শৌনক ও অন্যান্য তপস্বীগণ। এই সে বিবরণ যা পৌরাণিক সৌতি শুনেছিলেন জন্মেজয়ের সাপযজ্ঞে বৈশম্পায়নের মুখে। এই সে বিবরণ যা কিনা বৈশম্পায়নকে শুনিয়েছিলেন তাঁর গুরু—বেদবিভক্তা সেই কালো দ্বৈপায়ন। এই সেই আখ্যান, প্রাক্তনে যা বর্ণনা করেছেন অনেকানেক চারণ, এখনো করছেন, এবং ভবিষ্যতেও করবেন। এই সেই ইতিহাস, যা ঘটেছিল—ঘটছে—এবং আবারও ঘটবে।

এই গ্রন্থে শাস্ত্রীয় মত ও লোকাচারের অন্তর্গত জালিয়াতি ও প্রতিহিংসাসকল উল্লিখিত হয়েছে। দুষ্ট শব্দ, নীচ ভাব আর মুহুর্মুহু ছন্দপতন এ রচনার বৈশিষ্ট্য। সে নিমিত্ত, শুদ্ধাচারী, প্রচলিত ব্যবস্থার সমর্থক এবং পণ্ডিতম্মন্যদের নিকট এ গ্রন্থ সাতিশয় নিন্দিত।

যদি কেউ সদাজাগ্রত চিত্তে এই কীর্তন শ্রবণ কিংবা পাঠ করেন, তবে প্রাথমিকভাবে তিনি হারাবেন বোঁদা স্বস্তি ও নিরাপত্তাবোধ। সুখের রেশমি জোব্বার আড়ালে তাঁর চোখে পড়বে সঙ্কটের হামাগুড়ি। তারপর, অবশিষ্ট জীবন তাঁকে অন্বেষণ করতে হবে দুঃখমোচনের উপায়।

॥ তল্লাশি পরওয়ানা ॥

শাঁখের আওয়াজ ছিল, ছিল শিখা, আর সেই দিন
বালক এগিয়ে এসে বলেছিল, "আমাকেও দিন
যে কোন গ্রাহকহাতে। আমারও তো, পিতা, আছে কাজ,
যে কিছু কর্মের নয় তাকে ভালোবাসে না সমাজ।"

বার-বার তিনবার; হয়ত গুরুত্ব দিয়ে নয়
তবু আরুণির জিভে সে মুহূর্তে আসীন সময়
উচ্চারণ করেছিল, "যাও তুমি, মৃত্যুকে দিলাম,
তোমার সকল স্বত্ব, অন্য-অন্য সব পরিণাম।"

সেই থেকে অন্বেষণ। অন্তকের পিছনে হুলিয়া,
বহুদেশ, বহুজন্ম, ক্রুশকাঠ, পিছনে গুলি আর
জীয়ন্তে পুড়িয়ে মারা—যেরকম জিওর্দানো ব্রুনো,
এ সবই মৃত্যুকে খোঁজা, হে পাঠক, অন্যদিন শুনো

হেম অবদান সব; আপাতত মরুদেশে যাই
গাছ থেকে রক্ত পড়ে, খুর ডোবে, সেদিকে তাকাই,
কাহিনি আরম্ভ হোক, স্পন্দহীন মনসা ও বাক্
প্রেক্ষাগৃহ অন্ধকার, যবনিকা ধীরে খুলে যাক...

সেদিনের সে বালক এখন যুবকই শুধু নয়,
মৃত্যু সে পায়নি খুঁজে, পরিবর্তে—এমনই তো হয়,
কোলে তার শিশুপুত্র—নিহত—আঃ, সমস্ত সান্ত্বনা
তীক্ষ্ণতম উপহাস। ওকে তো সে এখানে আনত না,

তবু কেন নিয়ে এল? কী হবে সে সব ভেবে আর,
এখন লড়াই শুধু মৃত্যুকে সামনে আনবার।
পানির তাগিদে এত রক্তপাত...কাশেম, আকবর,
এই সে আশ্চর্য পানি, লাল এই বর্ণসঙ্কর।

এখানেও মৃত্যু নেই, সেহেতু আমার পথ আরও
ভবিষ্যতে চলে গেছে। নাকি পিছে? কে জানে, আবারও
পথের বন্ধন শুধু, জানি না জানি না কিছু আর,
মৃত্যুই মালিক—পিতা, ওৎ পেতে রয়েছে সিমার।

শিরস্ত্রাণ ছুঁড়ে দিয়ে, ফেলে অস্ত্র, উঠে আসছেন
ফোরাতের জল থেকে, ঐ দেখ, এমাম হোসেন...

॥ ফায়ারিং স্কোয়াড ॥

কয়েকজন সৈনিক যাহারা জঙ্গলে লুকাইয়াছিল তাহারা দূর হইতে দেখিল যে তিনি জলে নামিয়া অঞ্জলিপূর্ণ জল তুলিয়া পুনরায় ফেলিয়া দিলেন। পান করিলেন না। তদনন্তর তীরে উঠিয়া সমুদয় অস্ত্রশস্ত্র, অবশেষে অঙ্গের বসন পর্যন্ত দূরে নিক্ষেপ করিয়া শূন্যশির শূন্যশরীরে দণ্ডায়মান আছেন। স্থিরভাবে স্থিরনেত্রে ধনুর্ধারী শত্রুদিগকে দেখিতেছেন, মুখে কোন কথা নাই। ক্ষণকাল পরে তিনি ফোরাতকূল হইতে অরণ্যাভিমুখে দুই-এক পদ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। শত্রুগণ চতুষ্পার্শ্বে দূরে-দূরে তাঁহাকে ঘিরিয়া চলিল। যাইতে যাইতে জেয়াদ পশ্চাদ্দিক হইতে তাঁহার পৃষ্ঠ লক্ষ করিয়া এক বিষাক্ত লৌহশর নিক্ষেপ করিল। কিন্তু ঘটনাক্রমে সে শর তাঁহার বামপার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেল। শব্দ হইল, সে শব্দেও তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হইল না। অতঃপর সিমারের শর। তীর পৃষ্ঠে না লাগিয়া গ্রীবাদেশের এক পার্শ্ব ভেদ করিয়া চলিয়া গেল। তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই। যাইতে-যাইতে অন্যমনস্কে একবার গ্রীবাদেশের বিদ্ধস্থান হস্ত দিয়া ঘর্ষণ করিলেন। জলের ন্যায় বোধ হইল;—করতলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, জল নহে, গ্রীবানিঃসৃত সদ্যোরক্ত।

কিছুদূর যাইয়া তিনি আকাশপানে দুই-তিনবার চাহিয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন। সিমার খঞ্জরহস্তে একলম্ফে তাঁহার বক্ষের উপরে গিয়া বসিল। তীক্ষ্ণধার খঞ্জর তাঁহার গলায় সজোরে চালাইতে লাগিল। কিছুতেই কিছু হইল না—তিলমাত্র চর্মও কাটিল না। অকস্মাৎ তাঁহার চক্ষু উন্মীলিত হইল। স্থির কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "আমার অপরাধ, সিমার?" অট্টহাস্য করিয়া সিমার বলিল, "তুমি স্বৈরাচারী, উৎপীড়ক। তোমার কুশাসনে মদিনাবাসীদিগের শুধুমাত্র অশনবসনের সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে তাহা নহে, উপরন্তু মনোজগৎ এবং ধর্মাচরণের দ্বারও রুদ্ধ হইয়াছে। তোমার মাথা কাটিয়া লইলে মহাত্মা

এজিদ আমায় পুরস্কৃত করিবেন; অতঃপর তাঁহার সুশাসনে মদিনায় লোকতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হইবে।" তাঁহার চক্ষে উৎকীর্ণ অবিশ্বাস দেখিয়া সিমার পুনর্বার কহিল, "যে মদিনা তুমি ছাড়িয়া আসিয়াছ, তাহা এক্ষণে এজিদের অনুগত। আমি তো নিমিত্তমাত্র, প্রজাগণই তোমার দণ্ড যাচনা করে।"

"হয়ত...হয়ত এমনই ঠিক"—তাঁর ওষ্ঠ কাঁপিয়া উঠিল, "হয়ত এভাবেই আমি মৃত্যুর সন্ধান পাব।" কী আশায় তাঁর গ্রীবা শিথিল হইল!

পাঠক, কী লিখিব! লেখনী সরে না। ইত্যবসরে যে চমৎকার কাণ্ড ঘটিল তাহার অনুপুঙ্খ বর্ণনার সাধ্য আমার নাই। অবশেষে সিমারের খঞ্জর তাঁহার কণ্ঠে বসিল। তিনি চক্ষু নিমীলিত করিলেন। সর্বশক্তি দিয়া খঞ্জর বসাইয়া অবশেষে পাষণ্ড সিমার দেহ হইতে মস্তক বিভক্ত করিল। আকাশ, পাতাল, অরণ্য, সাগর, পর্বত, বায়ু ভেদ করিয়া চতুর্দিক হইতে রব হইতে লাগল—হায় হায়! হায় হায়!

চমৎকার ইহা নহে। রে সিমার, তুই কি ভাবিলি মস্তক বাস্তবিকই ছেদন হইয়াছে! হে পাঠক, সিমার যাহা লইয়া গেল বস্তুত তাহা মায়ামস্তক। সে দৃষ্টিপথে বিলীন হইতেই, ঐ দেখ, তাঁহার দেহ ও মস্তক পূর্ববৎ অভিন্ন হইল। তিনি উঠিয়া বসিলেন। অন্যমনস্কভাবে দুই-এক পদ করিয়া চলিলেন। মদিনা হইতে বহির্গমনকালে যে কুক্কুর তাহার সমভিব্যাহারী হইয়াছিল, সে শুধু তাহার পশ্চাৎ-পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল।

॥ মহাপ্রস্থান ॥

অনন্তর ক্রমে-ক্রমে অগণন দেশ-মরু-জল
পেরিয়ে এলেন তিনি, যেরকম শাস্ত্রে লেখা আছে,
নুন-সাগরে কূলে—উত্তর কিনারা দিয়ে হেঁটে
দক্ষিণ-পশ্চিম অভিমুখে কী তিনি দেখলেন?
তা কি ইয়াঙ্কিবোমার ঘায়ে দগ্ধ বাগদাদ, নাকি
ভেসে যাওয়া দ্বারকানগরী?
আমি কিছু বিশদ জানি না, শুধু
এইটুকু চোখে পড়ে—উত্তরে হিমালয়
সেইদিকে হেঁটে চলেছেন,
বাজশ্রবার পৌত্র, দৌহিত্র আলোকনবীর
আহার্যবিরত আর যোগপরায়ণ।

এখনই সময় হয়—প্রাচীন লিপিতে আছে লেখা,
আকাশ বিভক্ত হল, যে আঁধার আলোর অধিক

তারই মধ্যে আরো গাঢ়, যদিও পোশাক তার সাদা
অনন্ত রহস্য যেন মূর্তিমান; আবির্ভূত হয়ে
বলল, "দাঁড়াও পান্থ, এই পথে কোথায় চলেছ?"

আয়তপলক তাঁর এ মুহূর্তে উন্মোচিত হল,
গভীর নরম স্বর, বললেন, "তোমাকে চিনি না,
প্রশ্নের উত্তর তবু ভদ্রজনোচিত কাজ, তাই
সংক্ষেপে এটুকু বলি—মৃত্যুকে খুঁজতে চলেছি।
তার আগে থামবার অবকাশ নেই।"

"মৃত্যু কোন অভিজাত অন্বিষ্ট নয়"—মূর্তি বলে,
"এমনকি ছিল না কখনো। এই পথ দিয়ে তীর্থযাত্রী যায়,
অধিকাংশ হৃতপ্রাণ, ঈশ্বরে যাদের অভিলাষ;
মানুষ তো তাই চায়, ঐশী ক্ষমতার পায়ে
নতজানু, কিংবা মোকবিলা—এতেই অহং তার
রতির আরাম পায় খুঁজে। তবে,
সৃষ্টিছাড়া হে পথিক, তোমার এ ভিন্ন রুচি কেন?"

"হবেও বা সেরকম; কিন্তু যদি সত্যিকথা বলি,
ঈশ্বর বিষয়ে ঠিক ভাববার সময় পাইনি।
নিরেস ছিলাম না আমি, কোন ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য
কোন ক্ষেত্রে অন্তত মাঝারি, তবু
আমাকেই বাল্যকালে দান করলেন পিতা মৃত্যুর হাতে।
কেন? কোন সে কারণে?
উত্তর খুঁজতেই কেটে গেল এত জন্ম আর এত অভিজ্ঞতারাশি-
মৃত্যু অন্বিষ্ট তাই একমাত্র মৃত্যুই—তুমি কি বলবে
কীভাবে সন্ধান পাবো তার?"

"বলতে পারি। সম্ভবত কেবল আমিই তাকে জানি।
জানি তার রাজ্যপাট, কুহেলিকা, আর এও জানি,
জ্ঞানীর নিকটে তার রূপ কিছু প্রহেলিকা নয়।
ব্যগ্রজনে জানানোরও দায়িত্ব আমার, তাই
তুমিও সে জ্ঞান পাবে, কিন্তু তার আগে
ঐ যে কুকুর যার দৃষ্টিপাতে হবি নষ্ট হয়,
ওকে পরিত্যাগ করো। অন্যথায় যোগ্য হবে না।"

আয়ত চোখের মধ্যে এইবার চক্‌মকি জ্বেলে দিল কেউ;
তীক্ষ্ণ হল স্বরগ্রাম, যদিও বিনয় রইল পূর্ব্ববৎ মৃদু—
"উষার সন্তান এই প্রাণী, শাস্ত্রে বলে ধর্মসহচর,
আর যদি মানুষের অভিজ্ঞতা নাও, তবে বলি,
এমন আত্মীয় বুঝি জগতে মেলে না।
অপবিত্র হয় যজ্ঞ? তবে সেই যজ্ঞে আমার
এতটুকু শ্রদ্ধা নেই। ধিক্ সেই সংস্কার, যা কিনা এমন
মহৎ প্রাণীর ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করে রাখে। মনে রেখো,
উষায় আমার জন্ম, সেই হেতু এ আমার বোন,
আমরা অচ্ছেদ্যহৃদি। যদি এর সঙ্গ তুমি অপছন্দ করো,
তবে পথ ছেড়ে দাও,
আমার নিয়তি আমি খুঁজে নেব তোমার সাহায্য ব্যতিরেকে।"

"ধন্য তুমি, হে পথিক, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছ।
যারা ক্ষুদ্র মানবতাবাদী
মৃত্যুর রহস্য তারা জানবার অধিকারী নয়।
কী তোমার ইচ্ছা বলো? যে কোন সম্পদ
এ মুহূর্তে চেয়ে নিতে পারো।"

"আগে বলো, কী তোমার নাম?"

"আমিই গ্রহীতা সেই, তুমি যার শ্রেষ্ঠ প্রাপনীয়;
আমি সেই ভয়হীন, পর্বমধ্য প্রকৃতপ্রস্তাবে,
তুমি যার পিছনে ছুটছ।
আমার শুভেচ্ছা নাও, সেই সঙ্গে
অবশিষ্ট জীবনের সুখ।"

॥ যথা দুঃখাৎ ক্লেশ: পুরুষস্য ন তথা সুখাদভিলাষঃ ॥

সুখের পাখিরা যাক, উড়ে যাক, অন্য কারও অমল আকাশে–
আমি এই উচ্চাবচ অর্থহীনতার কিছুই বুঝি না।
আমাকে বলো হে মৃত্যু, কেন এত রক্তপাত,
কে বা শত্রু, কে বা মিত্র—
তাদের ভিতরে কোন সুস্পষ্ট ভেদ আছে কিনা?
কেন ভিন্নমতমাত্রে মানুষ উস্কানি ধরে নেয়?

কেন ক্ষমতার লোভ, যদি সেই ক্ষমতাও
কেবল সন্দেহ করে, কেবল আদেশ করে
অপব্যয় হতে থাকে রোজ?
বাণিজ্যের স্বাধীনতা? কতদূর? যদিও স্পষ্ট দেখা যায়
ব্যবসার স্বাধীনতা প্রথমে মাৎস্যন্যায়,
আরও পরে আত্মহত্যাকামী।
এরকম কেন হয়? কেন ঐ সুখের গাজর
সামনে ঝুলিয়ে রেখে একদল উন্মত্ত দ্বিপদ
সকাল-দুপুর-সন্ধ্যা পরস্পর কামড়াকামড়ি করে?

আমি ঐ সুখ জানি, জানি ইঁদুরের ছুট,
আমিও তো অমনই ছিলাম।
ওরকমই আত্মতুষ্ট, স্বঘোষিত মহান সেনানী—
বুখারেস্তে যে সময় অসন্তোষ ধূমায়িত হল,
আমি তো ছিলাম প্রাচ্যে, অন্য কোন দেশে পালাবার
হরেক সুবিধা ছিল। তবু ফিরলাম।
কেন বা ফিরব না বলো? আমারই তো দেশবাসী,
আমারই বান্ধবসব, অন্যেরা সন্তানপ্রতিম।
ওদেরই জন্য আমি প্রাশিয়ান যুগ থেকে
গমখেতে, ট্রেঞ্চের আড়ালে
ছেঁড়া গালশের মধ্যে পট্টি জড়ানো পায়ে
অতন্দ্র স্নাইপার।
ওদেরই জন্য আমি প্রতিরোধ আন্দোলনে, ছদ্মবেশে,
গোপন মিটিঙে গ্রামে, ধর্মঘটে খনি অঞ্চলে,
ফিশপ্লেট খুলে দিয়ে, মাইন সাজিয়ে রেখে
উল্টে দিয়ে নাৎসিদের রসদের ট্রেন...
ওদের জন্যই তো...মৃত্যু, ওরা সব আমারই স্বজন।
আমি যা করেছি সব ওদের ভালর জন্য,
ওদেরই ঋদ্ধির জন্য, তবে
কেন আমি ফিরব না? ওরা শিশু, উস্কানিতে উন্মত্তপ্রায়, তাই
ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই হবে।
আমাকে দেখলেই, আমি নিশ্চিত ছিলাম,
ঠিক হয়ে যাবে সব।

কিন্তু, কী ফল হল? আমি নাকি স্বেচ্ছাচারী,
আমি নাকি জনতার সুখের আপদ!

আমার জন্যই নাকি চিন্তার স্বাধীনতা নির্বাসিত হয়ে আছে,
আমারই শাস্তির জন্য অট্টহাস্যে মুক্তি পেল সব বারাব্বাস!

না, মৃত্যু, চক্রান্ত নয়; বসন্তজীবাণুর মত সংক্রামী ডলার কিংবা
সিয়া-র ট্রিগার শুধু এতদূর বদলাতে পারে না।
আমারই নিশ্চিত ভুল—সবথেকে বড় ভুল এটুকু না বোঝা,
আমি যাকে ভালো বলি সেই শুধু দ্ব্যর্থহীন ভালো—
এরকম নাও হতে পারে।
আমি যাকে শ্রমিকের রাষ্ট্র ভেবে গর্ববোধ করি,
হতে পারে সে আসলে শ্রমিকেরই বিরুদ্ধে নিরত
মধ্যবিত্ততার তেলে সাবলীল আমলামেশিন।
আমি যাকে গান ভাবি, হয়ত তা গান নয়,
আমি ভালো না বাসলে কবিতা, তবু
কবিতারও হয়ত কিছু প্রয়োজন থাকে।
রাজাদের দুই চোখ কানে থাকে আপ্তবাক্যক্রমে,
কিন্তু সেই কূটবাক্য নতুন সমাজে আর প্রযোজ্য নয়।
মানবিক রাষ্ট্রে চোখ এলিয়েনেশন ভেঙে ফেলে
ফিরে আসে চোখেরই জায়গায়; না হলে বুঝতে হবে
আদপেই সেই রাষ্ট্র মানবিক নয়—এই সত্য
বুঝতে চাইনি।

এ সবই আমার পাপ—হাস্যকর আত্মবিশ্বাস,
আজ আমি বুঝতে পারি সব।
কিন্তু জেনো, সজ্ঞানে কখনো চাইনি কারো ক্ষতি,
চেয়েছি আমিও সুখ—সকলের জন্য সুখ,
যে সুখ, দেখাই যাচ্ছে, এখনও আলেয়া।

তাই আর সুখ নয়, যদি পারো আমাকে জানাও
কোথায় দুঃখের শেষ? কীভাবে মানুষ
দুঃখের তমোযুগ পায়ে-পায়ে অতিক্রম করে
ফিরে পেতে পারে তার স্থিতপ্রজ্ঞ স্বাধীন সকাল?

॥ যমকথা ॥

কী কথা বলব বলো, দুঃসময়ে আমরা মুখোমুখি।
এ সময়ে গৃহস্থেরা ঘুমের অতলে কাদা, সেই অবকাশে

তাদের চুল ও নখ কেটে নিচ্ছে ইঁদুরের পাল।
সারসেরা কথা বলছে প্যাঁচার চিৎকারে আর
ছাগলের কণ্ঠে শৃগাল।
শহর আচ্ছন্ন করে ঘুরছে হাজার কবুতর, তুমি দেখো,
তাদের পায়ের রং লাল।
মদ দিয়ে ভাত মেখে বানরদের খেতে দিচ্ছে যারা
তারাই করছে ভিড় প্রতিটি সভায়, হায়
কেউ তারা কাউকে দেখছে না।
আর অপাবৃণু—তেজস্বী আমার পিতা—
কবন্ধেরা ঘিরে আছে তাঁকে।

আমি যা বলতে পারি, তা হল—নিজেই আমি
প্রাথমিকভাবে এক ছেঁদো জালিয়াত।
আমাকে সবাই ভয় করে, কেন করে সঠিক জানি না, তবে
সম্ভবত অজ্ঞানতা থেকে। আর আমি
কালান্তক সেই ভাব অতিযত্নে অক্ষুণ্ণ রাখি।
আমিও সুখের বর দিই, একথা জেনেই দিই
সেই সুখ আসলে বিভ্রম। তবে কেন এরকম করি?
যেহেতু ক্ষমতা এক তৃপ্তি আনে আমারও শরীরে, আর
তোমাকে বলছি আমি—এটাই নিয়ম।

অহং ও ক্ষমতা মিলে পৃথিবীর সব পাপ সৃষ্টি করেছে;
যাকে বলো ব্যক্তিমালিকানা, সেটা জন্ম নেয় ঐ
অহং ও ক্ষমতার যোগসাজশেই।
এই সৃষ্টি প্রাকৃতিক, প্রকৃতিরই দুর্জ্ঞেয় পাটিগণিতের ফলে
দুটি মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্য ও মানসের যেরকম ইতরবিশেষ;
এরকম হয়ে আসে—এরকম হয়েও চলবে;
মানুষ শপ্ত প্রাণী, একমাত্র এই প্রজাতিই
অহং নামক এক কালকূট জন্মাবধি বহন করছে।
এই বিষে শুধু যে সে নিজেই মুমূর্ষু তাই নয়,
অন্য সব প্রাণীদেরও যাপনের সমূহ বিপদ।
এটাই নিয়ম—আমি আবারও বলছি,
দুঃখমোচনের কোন পদ্ধতি সম্ভবত নেই। যদি
বিশ্বাস না হয় কথা, তবে চলো, তোমাকে দেখাই
সভ্যতার প্রতিপর্বে এই বিষ কীরকম সংক্রামিত হয়।

চলো সচেতন, আমরা শুরু করি সময়ের সেই স্থান থেকে
একদল যাযাবর সাপের দৌরাত্ম্য থেকে নিজেদের রক্ষা করতে
আগুনের কুণ্ড জ্বেলে যে কাহিনি শুরু করেছিল,
অথবা হয়ত কোন সনাতন শাপদহনের
যজ্ঞবেদী থেকে তার শুরু হতে পারে...

॥ নরকদর্শন ॥

কিংবা আরও আগে যাই চলো—
খ্রীস্টজন্মের দুই সহস্রাব্দ আগে, দক্ষিণে দাইমাবাদ,
উত্তরে শোর্টুগাই,
পুব ও পশ্চিম দিকে আলমগিরপুর থেকে সুৎকাজেনডোর-তক্
এশিয়ার ধূসর আঁচলে
যে সভ্যতা জন্মেছিল নর্দমা ও শস্যাগারসহ
এসো, তার স্তব্ধ সীমানায়;

স্থাপত্য লক্ষ করো; নগরদুর্গ গড়া উঁচু এক ভিতের উপরে।
মাত্র দুটি সিংহদ্বার যাতে সিন্ধুর জল এসে
উপত্যকা তছ্নছ্ করে দেয় যদি
তাহলে পুরুত আর সমাজপতিরা মিলে স্বচ্ছন্দে সেই দরজা বন্ধ করে দিয়ে
অনায়াসে নিদ্রা যেতে পারে। যদিও তখন
বাইরে পচতে থাকে অসংখ্য চাষিদের লাশ,
গবাদি পশুর দল নিজেদের হাড়গুলো অশ্মীভূত করে রাখে
অনাগত রাখালদাসের জন্য...এরকমই নিয়তি তখন।

নৃশংসতা কতদূর যেতে পারে দেখো,
চাবুকের ঘা-রক্ত পিঠে নিয়ে চাষিদের অভিশাপ-আর্তনাদ
রেলিশ করত জানি কোম্পানির চোট্টা কেরানি সেই জোব চার্নক।
কিন্তু সেটা বুঝতে পারা যায়,
শ্বেতাঙ্গরা প্রায়শ বর্বর (ডানিয়েল ডিফোর কথায় :
দা মোস্ট স্কাউন্ড্রেল রেস দ্যাট এভার লিভ্ড্) তারা
এমনই করবে সেটা স্বাভাবিক।
কিন্তু ঐ হরপ্পার মাতব্বরেরা—তাদের কাজলস্নায়ু
এতদূর নিষ্ঠুরতা বহন করছে দেখে, কী তোমার মনে হয়,
অহং ও ক্ষমতার 'পবিত্র জোট' ছাড়া এর কোন ব্যাখ্যা আছে আর?
কিন্তু এও মনে রেখো ঐ জোট আত্মহত্যাকামী; সে কারণে
স্বার্থপরতার মাত্রা পূর্ণ হয়ে গেলে অভূতপূর্ব ঐ নগরসভ্যতা

উপেক্ষায় স্তব্ধতায় মাটির অতলে ডুবে যায়,
হায়, তবু দেখো, দু-পেয়ে জন্তুদের শিক্ষা হয় না।

অতঃপর ক'শতক সব ফাঁকা, ইতিউতি তামার ঝিলিক।
অবশেষে প্রথম হ্রেষার শব্দ, পিঙ্গল অন্ধদের হস্তীদর্শন।
রক্তফিনকি, শিরচ্ছেদ, প্রতারণা, মিথ্যাভাষণের
উত্তরাপথজোড়া বিস্তৃত চালচিত্র কোনক্রমে ফদার্ফাঁই করে
কৃষ্ণত্বাচ মৃধ্রবাচ এই আমরা অনাস দাসেরা
অবশিষ্ট ছানাপোনাসহ বিন্ধ্যপারে আশ্রয় নিতে গিয়ে দেখি
অযোধ্যার দুই ভাই দ্রুত আগুয়ান;
সেই সঙ্গে চণ্ডচমূ, 'বাচ্চা-বাচ্চা রাম কা'-র ধ্বনি।

এসো তবে সেই কাব্য উলটেপালটে দেখি—
'সীতা' মানে নারী ভাবো, জমি ভাবো, তাতে খুব ফারাক হয় না;
মূলত সম্পত্তি তারা উভয়েই।
রাবণ ছিলেন সুখে, শুধুমাত্র অহং-এর বশে
সীতাহরণের পাপ তাঁর। সেই পাপে, মধুবাক্য স্মরি,
মজিল রাক্ষসকুল, নিজেও মজলেন।
অবশ্য রাবণ এক সভ্য মানুষের নাম,
অন্যপক্ষে দাশরথি (বাঁধিয়ে রাখার মত ভাবমূর্তি বটে)
জানকীবিষয়ে মন আদপেই দেননি কখনো।
পম্পাতীরে প্রহসনটুকু যদি ভুলে যাওয়া যায় তবে
সারাক্ষণ তাঁর চিন্তা বংশমর্যাদা, আর, অবশ্যই, ফিরে গিয়ে
আসনদখল। সেজন্যই বালীবধ, মেঘনাদ হত্যাসম্মতি,
এইভাবে একেবারে ইয়াঙ্কিকেতায়—মারি অরি পারি যে কৌশলে।

এরকমই হয়ে আসে; বাহুবল, কূটনীতি, ক্ষমতালালসা
ক্রমাগত শুভবোধ ধর্ষণ করে।
অসামান্য চিন্তাশ্রমে দীপ্যমান তপোবনগুলি গোধন লাভের জন্য
এবং প্রাগার্যভয়ে রাজাদের দার্শনিক ভিত্তি গড়ে দেয়।
ক্রমশ আবিল হয় দশদিশি, গুণকর্মস্বভাববিভাগে
এভাবেই শ্যাওলা পড়ে, মাছি জন্ম নেয়,
কপিলকুমার হয় শুধুমাত্র বিপ্রগন্ধা।
তারপর শাক্যদের কোন পুত্র প্রতিবাদী অবস্থান নিলে
বিবেচনা লাটে তুলে কুৎসা ও নির্মমতা বেছে নেওয়া হয়।

প্রত্যেকেই, প্রত্যেকেই ক্ষমতাপিয়াসী।
মহাবোধি গৌতমের সহচর কারা? তারা শ্রেষ্ঠী, তারা সব কুখ্যাত রাজা,
এমনকি বুদ্ধেরও প্রিয় পথ্য রাজতন্ত্র, দেখতে পাবে তুমি,
লিচ্ছবিতন্ত্রকে ধ্বংস করতে তিনিও তৎপর।
যার স্তম্ভ আমাদের লজ্জাকর রাষ্ট্রতন্ত্র পতাকাশোভন মনে করে,
কলিঙ্গযুদ্ধের পর সেই রাজা পেশীশক্তি সীমাবদ্ধ বুঝে
কৌশল পাল্টিয়ে নেন শুধু; হায়,
ধর্মের বিজয়ও যে আসলে বিজয়—এই তথ্য জানানো হয় না।
তবু দেখো, ইতিহাসে জালিয়াতি বিশেষ চলে না, তাই
খ্রীস্টজন্মের পর তৃতীয় শতক কেটে যেতে
স্লেট থেকে মুছে যাওয়া শুরু হয় বৌদ্ধ রাজাদের নাম।
কারা আসে? হিন্দুরা? সেও এক মজার ব্যাপার!
বাঁধ বেঁধে, খাল কেটে, যে সময়ে আচার্য শঙ্কর
ধর্মপ্রহরার কাজ সুসম্পন্ন মনে করছেন,
হিন্দু রাজারাও বেশ রসেবশে—নিরাপত্তাবোধে,
সে সময়ই, কেয়াবাত, দিগন্তে আরবি ঘোড়া, 'দীন-দীন' ধ্বনি
তারপর দুশতক ইস্পাতের ঝটিকাসফরে সব ফর্সা, শুধু
দিগন্তক্যানভাসে বিষণ্ণ বৃদ্ধের মুখ—হে অতীশ,
ভালই হয়েছে সব, এই ভূমি আপনার যোগ্য ছিল না।

তারপর আরও যা-যা তুমি জানই, শুধু এইটুকু বলি,
তথ্যনিষ্ঠ হও যদি, এটাও মানতে হবে, এ সময়ে অন্যেরা
নির্দ্বিধায় এর চেয়ে ন্যক্কারজনক।
মিশরের পিরামিড দাসেদের জমাট রক্তে গাঁথা (শা-জাদা খুর্‌রম
যেটা পরে আয়ত্ত করবেন)।
কটুগন্ধ অ্যালকেমি, পুরোহিততন্ত্র আর গবেষণা ফারাওসেবক।
আয়োনিয়া দ্বীপের সম্মান নষ্ট করেছে গ্রিস,
পিথাগোরাসের সংঘ, দাসপ্রথা মেনে নেন আরিস্তোতল, আর
সব স্তরে সমকাম—এই দেখে ভাবুকের প্রতি কোনো আস্থা থাকে না।

রোম থেকে উঠে আসে এরপর কুখ্যাত রোমান্স—
জুলিয়াস সিজার আর লরেলমুকুট,
জুলিয়াস সিজার আর ক্লিওপাত্রা,
তরুণ অ্যান্টনি আর ক্ষমতাদখল,

তরুণ অ্যান্টনি আর ক্লিওপাত্রা—
বছর-বছর ধরে এরকম ক্লিটোরিসচর্চার মাঝে
আস্তাবলে জন্মানো ছুতোরের ছেলে যদি ভালো কথা বলতে চায় কিছু,
তার জন্য পাইলেট, তার জন্য ইত্যাদি-ইত্যাদি।
দীর্ঘ-দীর্ঘতম দুঃখের ইতিহাস, খ্রীস্টানের রক্তে ফের
পশ্চিম সড়কগুলি কাদা।

কিন্তু, কী বলবে তুমি, কনস্তানতাইনের পর
যখন দেখবে সেই খ্রীস্টেরই মুখপাত্র কার্ডিনাল ইনকুইজিটর?
যখন দেখতে পাবে ব্রুনো কিংবা জোআনের আধপোড়া মাংস ও ছাই?
গল-ফ্র্যাঙ্ক-ব্রিটনের একই রীতি, একই সংবিধান!
কী লাভ মহম্মদে? যদি তাঁর দীন-তমদ্দুন
অসিনির্ভর এক আক্রমণে পরিণত হয়?
প্রতিবার অভিযানে বিদ্যালয়-পাঠাগার ধ্বংস করেছে এরা,
ক্ষমতা ও মেগালোম্যানিয়ায়, ভেবে দেখো,
কতদূর নিশ্চেতন হতে পারে লোক! এ পাপের ক্ষমা আছে?

ইওরোপ মনে করো; ন্যাকামি ও বর্বরতা প্রেমিক-প্রেমিকা।
পনের শতক শেষে হিস্পানির কলম্বাস যেখানে এলেন সেই
সূর্যস্নাত সভ্যতার দেশে কী বার্তা এনেছিল
আতিথ্যের পরিবর্তে শাদা মানুষেরা?
এ সেই খবর যেটা আরও পরে টের পাবে আফ্রিকা-এশিয়া।
বিবমিষা হয় না এদের দেখে? এর মধ্যে আশা করো দুঃখমুক্তি?
মনোবিকলন আর কৃষ্টিন্যাকামির এই অতলান্ত খাদ
তোমাকেও টেনে নেবে। এ ছাড়া তোমার সঙ্গে
কারা-কারা থাকবে ভেবেছ?

'অনুতপ্ত রাজতন্ত্র', 'রাষ্ট্রের প্রথম সেবক'—এই অষ্টাদশী নখ্‌রাকে
গিলেটিনে ফেলে যারা মুক্তির দরজা খুলেছিল,
কেন ব্যর্থ হল তারা?
সে কি শুধু ব্যাঙ্কগুলি বাজেয়াপ্ত করা হয়নি বলে?
কারা করবে সেই কাজ, মিত্রশক্তি চাষিদের টেনে আনবে কারা?
চিন্তার সেটুকু স্থিরতা তুমি কার কাছে আশা করো,
যেইখানে রোব্‌স্‌পিয়র কিংবা দাঁতোঁ ও মারা-র ঝগড়া
ঝালাপালা করে দিচ্ছে প্রতি মুহূর্তে ফ্রান্সের কান!

কে বাঁচাবে সমাজতন্ত্রকে, যদি এক পার্টিসম্পাদক
প্রয়াত হওয়ার পর উত্তরসূরী তাঁর তুলোধোনা বাপান্ত না করে
আসন না নেন—আর, লজ্জার শেষ কথা, এটাই ঐতিহ্য হয়ে যায়!

এরকম কেন হয়? একমাত্র ক্ষমতা ও অহং ব্যতীত?
এর ফলে ওয়ালসরণী আর পেন্টাগনের সেই ক্যানিবালদের হাতে
ভবিষ্যৎ ছেড়ে দেওয়া ছাড়া অন্য কোন গতি নেই।
নিরস্ত্র অর্জুন-পুত্র—তাকে ঘিরে সাতটি রাক্ষস, এই
নতুন ব্যবস্থায় তুমি ধ্বংস ভিন্ন আর কী বা আশা করতে পারো?

তুমি এসো, হে মানুষ, চলে এসো—এই কুম্ভীপাক
নিজের ধ্বংসের দিকে ধেয়ে যাক নিশ্চেতন আত্মপ্রসাদে।
কী দায় তোমার যদি এরাই নিজের ভালো
নিজেরা না বুঝতে পেরে থাকে?
চেষ্টা তো হয়েছে বহু আর পণ্ডশ্রমে লাভ আছে কিছু?
চলে এসো, নির্জনে জ্ঞানের চর্চা করো, সৃষ্টির রহস্য আজও উন্মোচিত নয়,
শব্দ—তার দুধ আছে, গন্ধ আছে, অন্ধকারে ঢাকা আছে আমারও প্রকৃতি
নিজের সকল জ্ঞান তোমাতে অর্পণ করে নির্ভার হতে চাই আমি,
তুমি এই ক্ষেত্রগুলি আলোকিত করবে বলে এসো।
কোলাহল থেকে দূরে, ক্ষুধা ও তৃষ্ণাহীন এমন আবাস আমি
তোমার জন্য গড়ে দেব, যেইখানে কালেরও বিলয়।
আমাকে সাহায্য করো, এসো।

॥ জাতক ॥

ধন্যবাদ, আমার কারণে তুমি এতদূর করতে পার জেনে।
যে নরক ইতিমধ্যে পেরিয়ে এসেছি আমি
তাই তুমি আবার দেখালে! তবু ধন্যবাদ,
হয়ত আবারও দেখা প্রয়োজন ছিল।
আগুন মাড়িয়ে এলে দাহ জানতে পারা যায় শুধু
সেটুকুই সব নয় আগুনের, তাই ফের দূর থেকে দেখা।
তথাপি তোমাকে বলি, শুধুমাত্র তিক্ততাই সারাৎসার ভাবা
জ্ঞানের ইশারা নয় হয়ত বা।
তুমি যাকে কালো ভাবো সে শুধুই অবিকল্প কালো—
এরকম না হতেও পারে।

আসলে এমন ভুল আমি তো করেছি, তাই আজ যে কোন আবেগ
সন্দেহের মনে হয় কিছু পরিমাণে।

এই যে কাহিনিচিত্র আমাকে দেখালে, এরও অন্তরালে
অন্য বিবর্তন আছে এক। আছে মনের বিকাশ আর
স্বাধীনতা শব্দটির ধীরে-ধীরে পাপড়ি ফুটে ওঠা।
তথ্য শুধু ক্লান্ত করে জানি, তবু এইটুকু বলি—
রেজা খাঁ ও কোম্পানির মিলিত চেষ্টায় (বঙ্কিম উবাচ)
খাক্ করে দিয়েছিল বাংলাকে যে মন্বন্তর,
বিলেতের লর্ডসভা তাতে কিছু বেদনা পায়নি।
কিন্তু আজ কোরাপুটে যদি লোকে পাতা খেয়ে বাঁচে
দেশজুড়ে তাতে দেখো শোরগোল পড়ে যায় কত।
শ্লথ—বড় শ্লথ বিবর্তন, ঠিক কথা, তবু
এর থেকে সূত্র টানা যায়। বলা যায়,
এই নষ্ট সমাজেরও মধ্যে আছে কৃশা খরতোয়া,
আমাদের কাজ তাকে করে তোলা ভীমা বেগবতী,
পড়নি পুরাণকথা, আস্তাবল সাফ হয় যাতে।

মানুষও সন্তান এই প্রকৃতির—হতে পারে একটু বখে যাওয়া,
কিন্তু তবু জন্ম-পরিবেশে কেবল সে হিংস্র হয় এমনটা নয়,
সেও পারে ভালোবাসতে, সে যে কত কূলপ্লাবী পারা
ভালো যদি নাই বাসো, বিশ্বাস হবে না।
যুক্তি-তর্ক শেষাবধি প্রাথমিক পর্যায়ের বোধ,
তার ঐ খাটো মাপে ভালোবাসা আঁটে না কখনো।
তা বলে আবেগও নয়, আবেগকে প্রেম বলে শুধু,
সে যেন স্বয়ংপ্রভ দিক্‌নির্দেশিকা—এই ভালোবাসা—
দেখো ঐ শব্দমাত্র উচ্চারণ করে
আমারও দগ্ধ চোখ ভিজে উঠছে হেমন্তশিশিরে।

তেমনই অহং। তার অসভ্য দিকটারই এযাবৎ চর্চা বেশি-বেশি।
কিন্তু এই অহং-এর অন্য মুখও আছে,
যাকে বলি আত্মসম্মান।
যদি সেই অনুভূতি না থাকে ব্যক্তির, তবে তার শিক্ষা বা শীল
সবকিছু নষ্ট শস্য, রূপসীর পোকাদাঁত হাসি।

অহং-এর এই দিক দীর্ঘদিন গোপন রয়েছে,
মাঝে মাঝে শুধুমাত্র বরেণ্য ব্যক্তিরা চর্চা করেন তার, যদি
প্রতি মানুষের মধ্যে তার যথাযথ উদয়ন হত,
তাহলে দেখতে তুমি দুঃখমোচনের পথও হয়ত রয়েছে।
হতে পারে তুমি তার সন্ধান জানো না,
সেক্ষেত্রে আমাকেই একা-একা খুঁজে নিতে হবে
শ্রীজ্ঞান যা কিছু চেয়েছিল।

সে অনেক শতাব্দীর সর্পিল পিচ্ছিল পথ—আমি জানি:
কিন্তু আমি এও জানি হয়ত তা ততদূরে নয়,
যেহেতু সময় এক এমন আশ্চর্য মাত্রা
যা কিনা প্রতিটি মুহূর্তে আগের মুহূর্ত থেকে দ্রুত।
এবং এটাও জানি, আবার শুরুর জন্য ব্যবহার্য বিন্দুগুলি
সমাজেই ছড়িয়ে রয়েছে।
ছড়িয়ে রয়েছে ঐ সাধারণ্যে—গলদঘর্ম শ্রমে
যারা রোজ টিকে থাকে, তবু হাসে, তবু ভালবাসে,
যারা রোজ মাঠে যায়, দপ্তরে, ভাঙা বেড়া স্কুলে,
মায়ের অসুখ হলে যাদের নিদ্রা আজো বিঘ্নিত হয়
পকেট গড়ের মাঠ তাই যারা ড্যাম্প্ধরা দেয়ালের গায়ে
কন্‌টিকি অভিযান, প্রেইরি, বাইসন দেখে মানসআঁখিতে,
তারাই আমার শক্তি, আমার প্রেরণা।
একদিন—হয়ত সে বহুদূর কোন একদিন
তারাই ভাঙবে এই নির্বোধ জীবনযাপন, আর
ততদিন আমাকেই ফিরে-ফিরে জন্ম নিতে হবে।

আমারই স্বজন, মৃত্যু প্রত্যেকেই আমার আত্মীয়;
আমার অন্যায় সব যেরকম অজ্ঞানতাবশে, এদেরও তেমনই।
আমারই স্বজন সব পশু, প্রাণী এবং মানুষ, তাই
প্রাণের মুক্তি চাই—এই প্রশ্নে আপস চলে না।
দুরন্ত শিশুর হাতে ফড়িঙের ঘন শিহরণ
মরণের সাথে লড়িয়াছে—সে লড়াই মানুষের সংগ্রামের থেকে
কোন অংশে ন্যূন নয়। একথা জেনেই ঐ
তামারং ফড়িঙের জন্য আমি জন্ম নেব প্রতিটি শতকে।
জন্ম নেব তাদেরও জন্য যারা আমার নামের কথা শুনে থুতু দেয়,

আমাকে দানব মনে করে, আর যারা
আমার অশক্ত দেহে একঝাঁক বুলেটের গর্ত করেছিল,
তাদের সবার জন্য, সবার পাপের জন্য
আমাকেই বারে-বারে জন্ম নিতে হবে।

আমি যে ওদের ভালোবাসি...

॥ য়ু মে স্যে আই অ্যাম আ ড্রিমার, বাট আই অ্যাম নট দি ওনলি ওয়ান... ॥

হয়ত ভাবছ তুমি এসব প্রলাপ, দিবাস্বপ্নের ঘোরে
এখনও আমার চিন্তা আবিল রয়েছে;
হয়ত ভাবছ আমি মোহগ্রস্ত, চিকিৎসার অযোগ্য উন্মাদ।
যা খুশি ভাবতে পার, তর্কে আর, সত্যি, রুচি নেই।
বরং আমার স্নায়ু সহসা শিউরে উঠছে এতদিন পর,
কতদিন, ভেবে দেখো, কত-কতদিন আমি ভুলে আছি ঘর-গেরস্থালি,
কে কেমন আছে তার কিচ্ছু জানি না!

ডিসেম্বর শুরু হবে, প্রথম তুষারপাত আসন্ন এখন,
নিষ্পত্র এল্‌ম্‌-বার্চ গুটিশুটি দাঁড়িয়ে থাকবে, আর
গরম স্যুপের মধ্যে নতুন আলুর গন্ধ, মশলামাখা টাটকা বিফস্টেক...
হাঙ্গেরিয়ান গুলাশ তুমি খেয়েছ কখনো? কিংবা খেত থেকে
সদ্য তোলা ভুট্টা পোড়ানো? চিবিয়েছ
সূর্যমুখী বিচি? অবশ্য মেয়েদেরই একচেটে ওটা।
গিয়েছ লাইপজিগ, যেখানকার একটি ট্যাভার্নে
মুখোমুখি বসতেন গ্যয়টে-শিলার?...নাঃ, কাকে কী বলছি!
সত্যি মনে পড়ছে খুব এইসব হাবিজাবি কথা,
মনে পড়ছে, বন্ধুদের, আমার সেসব বুড়ো কমরেডরা কে কোথায়
রয়েছে কে জানে! লুক্কায়িত? কষ্টে আছে তারা?
তবুও তো বেঁচে আছে, লড়ে যাচ্ছে দাঁতে-দাঁত চেপে,
তাদের সঙ্গে ফিরে যোগ দেব, কিন্তু তার আগে
ঘুরে যেতে হবে এক নদীধোয়া প্রাচ্য অবশেষ।
বরং তোমাকে, শোনো, গল্প বলি তার :

এখন বাংলাদেশে নতুন ফসল ওঠে, উৎসব হয়।
আখের ভিয়েন বসে গাঁয়ে-গাঁয়ে, ভোরবেলা ময়ূরাক্ষীতীরে

হু-হু বাতাসের মধ্যে রোদ পিঠ দিয়ে
পাথরে জাঁকিয়ে বসে কাঁথামুড়ি রাখালছোক্‌রা।
মুড়ি খায়, পয়সা পেলে চা ও পাঁউরুটি,
ছাগল চরায় নাকি ছাতামাথা, আসলে ফন্দি আঁটে বিনিপয়সায়
কীভাবে ভিডিও দেখবে, আর সন্ধেবেলা
সাক্ষরতাদিদিদের কীভাবে পিছনে লাগবে
একদিনও পড়া করবে না।

দিদিরাও তেমন নাছোড়, মৃত্যু, তাদের তাড়ায়
অ-আ-ক-খ গিলে খাচ্ছে বাপ-ব্যাটা মায়ে-ঠাকুমায়,
তোমার ভয়ের রাজ্য ক্রমশ গুটিয়ে আসছে, এরপরে
কোথায় পালাবে ভাবো, নাকি সব উর্দি-কোর্তা ছেড়ে
ম্যান্ডোলিন হাতে নিয়ে যোগ দেবে আমাদের পাগলসংঘে?

এসব ঠাট্টার কথা, বন্ধুবর, তবুও এবার আমি ফিরি—
পুনর্বার দেখা হবে, কে জানে কোথায়,
কোন দেশে, কোন সে সময়ে আমি এখনো জানি না।
কিন্তু তবু দেখা হবে, যখনই সংশয়
চোখে ও চিন্তায় তার বসত বানাবে,
যতদিন লুণ্ঠ হবে পুণ্য মাতৃভূমি,
ব্ল্যাক-আউট জারি করবে নির্বিকার শাসনতমসা,
লজ্জাকর ইতিহাসে যতদিন গর্ব হবে মূর্খের মত,
যতদিন শিশুশ্রম উচ্ছেদ না হবে,
পশুরা বন্ধু হবে মানুষের,
ততদিন দেখা হবে, প্রিয় বন্ধু, আমাকে ভুলো না।

॥ আর এক আরম্ভের জন্য ॥

বলেন শৌনক, ওহে জ্ঞানী পৌরাণিক।
বলো দেখি মহাযানী যান কোন দিক।।
চারণ বলেন, আমি বিশদ জানি না।
আগামী জঠরে আজো কাহিনিবিলীনা।।
তবু মনে হয় তিনি যান সেই দেশে।
যেথা স্বপ্ন থেমে আছে কুঁড়িমুখে এসে।।

যেন কন্যা রূপবতী পলাশলোচনা।
অতুল বৈভব তার চিরআলোচনা।।
শিয়রে সোনার কাঠি, মেয়ে নিদ্রা যায়।
ওঠো জাগো কন্যা, বরমালা যে শুকায়।।
তথাপি না জাগে মেয়ে, চেষ্টা হয় কত।
তাহারে জাগাতে গিয়ে রাজপুত্র হত।।
শুক বলে, দেখ সারি, আসে সদাগর।
দ্রাক্ষাফল টক, সেও ফিরে যায় ঘর।।
পিছে আসে মন্ত্রীপুত্র খরবুদ্ধিমান।
নড়ে কন্যা, জাগে না—সে হারায় সম্মান।।
মহাযানী চলেছেন জাগাতে সে মেয়ে।
বীজনে বাতাস ধন্য তাঁর স্পর্শ পেয়ে।।
সূর্য তাঁর শক্তি নেয়, ছায়া নেয় মেঘ।
সময় গ্রহণ করে তাঁর থেকে বেগ।।
কী করে পারবেন তিনি, শুধান শৌনক।
হাতি-ঘোড়া গেল তল, তবু কেন শখ।।
সারি বলে—কুলপতি, নিদ্রিতার কানে।
শোনো তাঁর দুই ঠোঁট কী কথা বাখানে।।
সে কথা কেবল এই—ওঠো গো বনিতে।
এসেছি, সময় হল আজি রজনীতে।।
এতেই কি জাগে মেয়ে, আমার সন্দেহ।
তুমি বলো, পৌরাণিক, পেরেছে কি কেহ।।
চারণ বলেন, তারও ব্যাখ্যা দিতে পারি।
যদিও সে-সব লোকে বুঝিবারে ভারি।।
রবিকূট বলি তবু কথাটা ওঠাতে।
যে পারে সে আপনি পারে সে-ফুল ফোটাতে।।
সৌতিকথকতা, সুধী, অমৃতসমান।
বোবা জয়দেব ভণে, শুনে পুণ্যবান।।
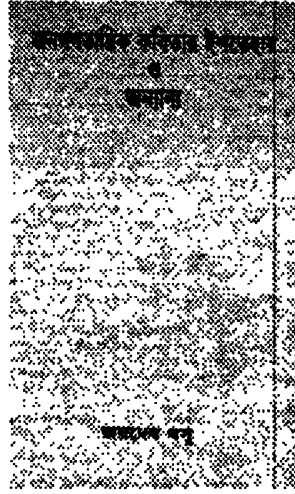
জনগণতান্ত্রিক কবিতার ইশতেহার ও অন্যান্য

সূচি

জনগণতান্ত্রিক কবিতার ইশতেহার : এক

মারকুটে কাব্য হোক, চাঁদ আর মেয়েদের কলস্বরে ভরে গেছে এপার বঙ্গাল;
ভাববাদী কবিদের চরিত্র তো সর্বলোকে জানে, আর তাদের কথায় ভুলে
বিপ্লবীরাও দেখি চাঁদ বা মেয়ের দিকে ফাঁক পেলে আরেঠারে চান।
এবার অন্যভাবে কবিতা বানানো যাক—এসো, লেখাপড়া করো,
কবিতা লেখার আগে দু'বছর পোস্টার সেঁটে নেওয়া ভালো,
কায়িক শ্রমের ফলে বিষয় মজবুত হয়—এবং, সমান ভালো
রান্না শেখা, জল তোলা, মানুষের কাছাকাছি থাকা।
পার্টি করার থেকে বিশল্যকরণী আর কিছু নেই কবির জীবনে, আমি
অভিজ্ঞতা থেকে এই পরামর্শ দিয়ে যেতে পারি।
মারকুটে কাব্য করো, বুদ্ধিমান রকবাজ কবিতা বানাও,
পাঠকের পাকস্থলি সেরকম দুর্বল হলে মুখ বুজে সহ্য করো সব,
সহ্য করো উপেক্ষার শীতঝড়, নেতাদের উপদেশবাণী,
দাঁতে-দাঁত চেপে থাকো, সহৃদয়-বুদ্ধিমান হও, তবু
তরল কোরোনা সেই কথামৃত। মার্কস পড়ো, সাংখ্যও পড়ো,
ঝাণ্ডাকবিদের মত সরিয়ে রেখোনা পাশে হিমেনেথ, তবু
সযত্নে বর্জন কোরো প্লাতেরোর নাম। ঐ আগামী শতক থেকে
উঠে আসছো টাটকা তরুণ, তুমি এইভাবে কবিতা লিখবে?

জনগণতান্ত্রিক কবিতার ইশতেহার : দুই

ক

সংবাদপত্রে ঠাসা হরফের মত এই দেশে মানুষ-মানুষ শুধু। পরিশ্রান্ত মানুষেরা সারাদিন ঘোরাফেরা করে। পরিপুষ্ট মানুষেরা সারাদিন গাড়ি-ঘোড়া চড়ে। তার নীচে, বহু-বহু নীচে, তোমরা জানোনা, কোথায় জন্ম নেয় একজন কবি বা কবিতা; জন্ম নেয় জঙ্গি লড়াই; জন্ম নেয় একজন নেতা। উত্তরের নীল তারা দেখে-দেখে তাদের হদিশ যারা খুঁজে নিত, তারা এসে গেছে। প্রিয় বালথাজার, এবার বসন্ত আসছে সম্ভাবনাময় ভারতবর্ষে, এবার বসন্তে আসছে প্রতিশ্রুতি ভারতবর্ষময়।

একেও বিপ্লব বলে, তুমি মনে রেখো, অর্থাৎ, আপাদমস্তক সব উথালপাতাল করে দেওয়া; তার মানে—বোর্হেস যা বলেছেন—পূর্বসূরীদের সব পুনর্গঠিত করে নেওয়া, যা কিনা কাফকা আর ম্যাজিক পাহাড়ের রচয়িতা, যা কিনা লুকাচ নন, যা কিনা

রবীন্দ্রনাথ-জীবনানন্দ থেকে বাংলার সব কবি, বাংলার মাঠে-মাঠে যা কিনা ক্ষুব্ধ সব খেতমজুরের সভা, যা কিনা কানসারায় পড়ে থাকা মৃতদেহ, যা কিনা আনন্দ পাঠকের পোড়া বাড়ি। এখন আক্কাই-বুশ নয়, হিরো-হণ্ডা নয়, আর নয় মারুতি-সুজুকি। মেথুজেলাহ্-র দিকে কে আর ফিরতে চায় বলো?

কালিঘাট ব্রিজের উপর বিপ্লবের পদধ্বনি শুনিতে কি পাও? হে শহর, হে ধূসর শহর...

খ

প্রিয় কমরেড,
আমার এ বছরের পার্টিকাজশিথিলতা তোমায় বিস্মিত করেছে। তুমি লিখেছো, গত পাঁচ মাসে আমার লেখায় তুমি আদপেই সন্তুষ্ট নও। আত্মপক্ষে কথা বলি তবে। তোমার কি মনে আছে বিনোদবিহারীর কথা? কলাভবনের গায়ে ম্যুরাল বানাতে গিয়ে মাঝে-মাঝে পিছিয়ে আসতেন। অস্বচ্ছ চোখ মেলে ঠাহর করতেন তাঁর গোটা কার্যক্রম। তোমার কি মনে আছে সেইবার শান্তিমিছিল? ট্যাবলোচূড়ায় উঠে আমরা দেখেছিলাম পশ্চিমে লাল আভা—আর তার পটভূমে অন্তহীন-অন্তহীন বিমূর্ত মানুষ! মিছিলের মধ্যে যারা ছিল, তারা তা দেখেনি। তারা তা দেখেনা। দেয়ালে একটি ইঁট কখনো বোঝে না গোটা বাড়ির আকার। একটি পালক, তা সে ধরে নিই সুন্দরীতমা, কখনো বোঝেনা গোটা পেখমের জটিল বুনন। বন্যাগঠনের কাজ তোমাদের পেশীর স্ফুটনে। আমি তো চারণ শুধু, অক্ষরিক ইতিহাসে সেই ছবি এঁকে রাখা—সে আমার সে আমার প্রেম। এটুকুই আমার এলেম। মাঝে মাঝে তাই দূর থেকে এইভাবে দেখে নিতে হয়। মাঝে মাঝে প্রয়োজনে, আন্তরিক অভীপ্সার টানে...তুমি তো জানোই, পাশে পাও আমাকে তখন। আর ঐ পঙ্গু লেখার কথা? আমার কৈফিয়ৎ শোনো ঃ দেখিয়া শুনিয়া খেপে গেছিলাম, যাহা আসে তাহা গেছি লিখে।

গ

সবকিছু ঠিক নেই, সকলেই জানে। নওমপেন-সায়গনে আজো ভ্রান্তির মুখচ্ছিরি তেমনই মাছির মত ঝরে। রাজ্যের স্বাস্থ্যহানি অনেকেই বিপ্লবের পরাকাষ্ঠা ভাবে। যুক্তফ্রন্টের তত্ত্ব কারো-কারো কাছে আজো অন্ধকারে সুযোগ সন্ধান। কেউ কেউ বুঝেও বোঝেনা।

তবু তো দেখো ঝরি, কিছু না থেকে কিছু ছেলে/কেউ-কেউ জাত কেউটে, কেউ-কেউ হেলে।

কেউ-কেউ জাত কেউটে। বহুদূর পাদুয়ায় এক র‍্যাংলার, এখনো, কল্পনা করো লক্ষ করে যাচ্ছেন গ্রহ-তারাদের যাওয়া-আসা। ক্রেমলিন আজো তবু কালের রাখাল। ধার করা কথা হল, ক্ষমা করো, এছাড়া অন্যভাবে আজো আমি বলতে পারি না। মেঘলা সকালবেলা শালুকডাঁটার গায়ে লিও-শাও-চি-র চোখের জলের কুঁড়ি ফুটে ওঠে। অবিচল অরতেগা ভারতে এলেন। আ, স্বাধীনতা, অলিভার টাম্বোর হাতে এই তোর শেষ গীতাঞ্জলি।

এখনো দেখো ঝরি, কিছু না থেকে কিছু ছেলে/উষ্ণ কোন দর্শনের এতটুকু স্পর্শ খুঁজে পেলে।

ঘ

লেখো-ভালোবাসা। লেখো আকাশে-মাটিতে, সমস্ত ফুলে-ফলে, দূর্বাদলশ্যাম কচি ধানক্ষেতে। লেখো, ঐ রাখালের নাবিকের চোখে।

লেখো-হিংসা। হিংসাই মা, হিংসাই পবিত্রতা, হিংসাই আমাদের তমসায় অনির্বাণ জ্যোতি এনে দিক।

লেখো—পার্টি। পার্টিই ঘরবাড়ি, পার্টিই প্রিয়তমা, পার্টিই মায়ের হাতের রাঁধা ভাত।

যে নেতা অগ্নিতে, যিনি জলে, যিনি ব্যাপ্ত বিশ্বচরাচরে, যিনি ওষধিতে, যিনি বনস্পতিতে, লেখো তাঁর নাম। আমার নেতার নাম লেখো—কমরেড মার্কস। আমার নেতার নাম লেখো—মুজাফ্‌ফর আহ্‌মেদ।

কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও?
হে শহর, হে ধূসর শহর...

জনগণতান্ত্রিক কবিতার ইশতেহার : তিন

তখনই রাত্রি এল ঝুপঝুপিয়ে আর তোমাদের শহর
শেষবার হৈ-হল্লা সেরে নিয়ে শুয়ে পড়ল নিঃসাড়ে।
শুয়ে পড়ল রেস্তোরাঁ ও ইউনিয়ন অফিস, শুয়ে পড়ল ত্রিশূল ও আইকন,
শুয়ে পড়ল বারমেড, দেয়ালে ঝুলতে থাকল আঁচড়ের দাগ লাগা
অবসন্ন ও আর্ত পোষাক, শুয়ে পড়ল স্টিমারের ভোঁ,

খালাসির খিস্তিখেউড়, যাবতীয় লক্ষবস্তু,
শুয়ে পড়ল কুলিব্যারাক—যারা বেঁচে, যারা বেঁচে নেই...

এত রাতে কে-কে হাঁটছে পথে?
হাঁটছে পিলখানার দিকে বুড়ো গরুর পাল, গাঁইতি হাতে ট্রামশ্রমিক,
চক্ষুষ্মান পঙ্গু ভিখিরি—আর, এই দেখো, কত-কত দিন পর
অগাধ নিঃসঙ্গতা থেকে উঠে এসেছি আমি,
একা মুখ গুঁজে থাকা থেকে উঠে এসেছি আমি,
উঠে এসেছি যোশেফ স্তালিনের ডাকে।
সেই মেয়েটির কথা ভুলে গেছি আপাতত, মুছে ফেলেছি চোখ
আর যেখানে যতটা ব্যথা লেগেছিল, হাফ-সোয়েটার পরে,
দেখো, আজ তোমাদের শহরে হাঁটছি।

দেখো, রাত বেড়ে উঠছে, ঘেয়ো রাত, কুকুরকুণ্ডলী রাত
শুয়ে আছে শহরের অলিতে-গলিতে,
শুয়ে আছে সদ্য এসে পৌঁছনো ট্রাকের সামগ্রী,
শুয়ে আছে আওয়ারা ছেলেদের চোখ, দেখো,
ধীরে ধীরে সর পড়ছে কুয়াশার...

এদিকে আমার পেটে পচে উঠছে শেষ বিকেলের ঘুঘনি-পাঁউরুটি, আর
সতর্ক টিকটিকির মত দেয়াল বেয়ে আমি ঢুকে পড়ছি এক-একটা বাড়িতে।
ওয়াল পেপার থেকে ট্যাপেস্ট্রির গা বেয়ে নেমে আসছি টালির মেঝেয়,
চড়ে বসছি ম্যান্টলপিসে,
চেটে দেখছি তাক ভর্তি বই, শুঁকে দেখছি সিন্দুক ভর্তি টাকা,
দেখছি সঙ্গমে স্বাদ নেই, ভালোবাসায় সত্য নেই,
দেখছি বুথ দখলের ব্লু-প্রিন্ট, ফাঁকা প্রতিশ্রুতি,
দীঘা-তমলুক রেললাইনের ভোজবাজি...

এসব তো তোমাদেরই জন্য আমি টুকে রাখছি।
তোমরা লাথি মেরে মিথ্যে ভেঙে দেবে,
শঙ্খনাদে ভরে দেবে পৃথিবীর শহর-গ্রামাঞ্চল,
আখেরাতকে টেনে নামাবে ইহকালে,
তোমাদেরই জন্য আমি টুকে রাখছি এসব তালিকা,
তোমাদের বিদ্রুপ, অবহেলা সহ্য করে লিখে রাখছি
যাতে আসল সময়ে ঠিক চিনতে পারো চিতার আগুন,
চিনতো পারো, কোন্-কোন্ ঘর ভেঙে গড়তে হবে কোন্-কোন্ ঘর...

আমি তো কিছুই নই, মফস্বলি চারণমাত্র,
আমার পেশিতে নেই তোমাদের তীক্ষ্ণতা, বিভা।
আমিও এসেছি তবু, নিঃসঙ্গ দেশ থেকে উড়ে এসেছি বিষণ্ণ ডানায়,
যেহেতু আমাকে ডাক দিয়েছেন যোশেফ স্তালিন,
যেহেতু পৃথিবীজুড়ে দালালরা তড়পাচ্ছে খুব,
সেহেতু আমারই দায়, তাঁরই নির্দেশে আমি টুকে রাখছি
চামচাদের কেচ্ছা, মস্তানদের গলার মাপ, টাইকুনদের প্যাঁচ
আর কমন-ইওরোপিয় উপকথা।
টুকে রাখছি, কারণ স্তালিনই বলেছেন টুকে রাখতে,
বলেছেন তোমাদেরই কাজে লাগবে ভেবে।

জনগণতান্ত্রিক কবিতার ইশতেহার : চার

প্রণাম : ১

তোমাকে দেখিয়া রাত্রি নিঃশেষিত, কহ
কীরূপে শাশ্বতী এই অধম কিংকর
হৃদয় উপাড়ি আনি শোণিতসিঞ্চিত,
উপহার দিবে, বামা, চরণকমলে?
পূতজিহ্বা পুণ্যশ্লোকে পুনর্বার দয়া
অকারণ, হে বরদে, যে ধনী সে ধনী,
কৃপা করো অঘবানে, চান্দ্রায়ণে যার
ধূপ-দীপ-মধুপর্ক-তাম্বুল-চন্দন
কিছু নাই, রক্তপলে হৃদয় প্রোথিত,
তবে তাই দিই যত্নে—কীটদষ্ট জবা।
অনুতপ্ত অর্চনায় এ মাধবঋতু
রভসে গোঙায়, দেবী, সোহাগনখরে
দুধপথে মূর্তি ধরি প্রতিশ্রুতি, ওগো,
অপর্ণা অরূপকান্তি, তোমার করুণা
ভিক্ষা মাগে সাক্ষ্য রাখি ঋক্ষমণ্ডলী
অথাজিনসারধর প্রগলভবাক্...

ডায়েরির ছেঁড়া পাতা

...তারপর, ভাসতে-ভাসতে চলে এসেছি এতদূর। ডুবতে-ডুবতে আমি এক-একবার আঁকড়ে ধরেছি শ্মশানের কাঠ, ভিন্ন ভিন্ন কাঠ আমি আঁকড়ে ধরেছি। সে সব কাঠের গায়ে পোড়া ক্ষত, কৃমিপোকা, কিয়ৎক্ষণ তারা আমাকে দম ফেলতে সময় দিয়েছে। আর, এই যে লিখে রাখছি সেই অশালীন ভ্রমণকাহিনী, লিখছি—চোখ আমার জ্বলে যাচ্ছিল নুনে, মৃত্যু এসে ছুঁয়ে যাচ্ছিল ভুরু, তাও যে লেখার জন্য বেঁচে আছি, এও সেই কাঠদেরই দয়া। মৃত্যু থেকে ভেসে ঐ চলে যাচ্ছে মৃত্যুরই দিকে। কোনদিন আর তারা অরণি হবেনা।

ভেবেছি বিবাহযোগ্য নিটোল লিরিক আমি কখনই লিখবনা আর। ভেবেছি রাত্রিজুড়ে বেতসবৃত্তির কথা লিখে যাবো, এই গ্রীষ্ম মাঠে-মাঠে সাজিয়ে দিচ্ছে চিতা, ভেবেছি লিখব। কে আর নিজস্বভাবে আমার জন্য বসে আছে? আমি নই সান্দিনিস্তা, সোয়াপো-র কর্মী নই, এমনকি নই কোন এলেগ্যান্ট পাবলো নেরুদা। তাই, ভেবেছি মঞ্জরীভাবে লিখে যাবো ভারতীয় মাশুকার কথা, তাকে যারা ভালোবাসতো—কীভাবে খতম হল সেসব ছেলেরা, কীভাবে বন্দি হল, আমাদের ইতিহাস কোন পথে হয়ে উঠল দীর্ঘ-দীর্ঘতম অক্ষরের বেকারবাহিনি...

প্রণাম : ২

বাদামফলের মত ম্লান চোখে কে তুমি একাকী নারী
হেঁটে যাও কান্তারের পথে?
ধূপছায়া দিন কবে ফুরায়েছে, জানোনা কি
পৃথিবীর প্রেমিকেরা তোমার অপেক্ষায় বসে-বসে
এখন স্থবির;
পাড়াগাঁর পথে আমি তাহাদেরই মত ঘুরিয়াছি,
তাহাদেরই মত আমি শহরেব পথে—
আহিরিটোলায় আর জগুবাজারের ভিড়ে দাঁড়ায়ে থেকেছি।
নীল শান্ত বারান্দায় শুনেছি ইহুদি মেয়ে গান গায়,
একটানা সেই ক্লান্ত গানের সরণী
ধূসর অতীত থেকে আজকের দিনে উঠে আসে।
আজিকার দিন তবে কখনো প্রাচীন ছিল নাকি?
পাটলিপুত্রের রাতে কোন এক দেবদত্ত এইভাবে চেয়েছিল ইন্দুমতীকে?

রৌদ্রের সীমা ছেড়ে সময়ের জায়মান সিঁড়ি
স্মৃতির অতীতপথে নেমে যায়।
অতীতের থেকে উঠে এসে আজকের মানুষের কাছে
দ্বিতীয়ত, প্রণয়ের পরিমাপ নিতে আসে।

একশ বছরের নিঃসঙ্গতা

তখনই সময়, অস্বচ্ছ চোখ মেলে ঘণ্টাবুড়ো বাজিয়ে দিল দিনশেষের বাঁশি, আর জাগৃতি বাণীপীঠ বিদ্যামন্দির থেকে মেয়েরা বেরিয়ে এল শাদা ফ্রক পরে। মোরামের রাস্তা বরাবর সাইকেল নিয়ে তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল ছেলেরা। যে যার সাইকেলে উঠে পড়ল আর পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি। তরমুজ খেতের পাশ দিয়ে সাবলীল বাঁক নিয়ে তারা উঠে এল বড় রাস্তায়, দেখামাত্রই এপ্রিল ছেড়ে দিল তার হাওয়াবাতাসের পাল। সমুদ্রফেনার মত ফুলে-ফুলে উঠতে থাকল সেইসব মেয়েদের ফ্রক, মসৃণ টায়ারের নীচে চূর্ণ হয়ে যেতে লাগল শীতশেষের শুকনো পাতাগুলি। এই অভিযাত্রায় আমি লগ্ন করে দিলাম তোমার হাসি, যার মধ্যে অনায়াসে তুমি বুনে দিয়েছো কান্নার এমব্রয়ডারি, কীভাবে কে জানে...

শোনো, বিচ্ছেদের দিনগুলোয় ছেঁড়া চিঠির মত শহরের রাস্তায়-রাস্তায় আমি লাট খেতাম। প্রতিটি মুহূর্তে পায়ের নীচে সরে-সরে যেতো ম্যাপ। দেখতাম, সিনেমা ভাঙার ভিড়, দেখতাম অফিস ভাঙার বাস, চোখের সামনে দিয়ে চলে যেত এক -একটি মিছিল। তারপর মানুষের ভিড়ে বারংবার হারিয়ে যেতে-যেতে আমি ঈর্ষা করতাম তাদের যারা কাঁদতে পারে। হিংসে করতাম তাদের যারা কষ্ট পায়না। শোনো, আমি হারিয়ে যেতাম গভীর-গভীরতর শহরের কোলের মধ্যে।

পরীক্ষাশেষের পর, দেখো, আমরা নিরালায় গান শুনব। গান গাইবেন মিস দাশ (এমেচার) পুরোনো ডিস্কে।

প্রণাম : ৩

সাগরজলে সিনান করি যবে
মেঘের মত সজল এলোচুলে
গাঁথিয়া, প্রিয়ে, চাঁপাফুলের মালা
দীর্ঘ ছিল প্রহর শেষের পালা
ভাবিতেছিনু সমস্ত কাজ ভুলে
ভুবনময় আসিবে তুমি কবে

হঠাৎ সেদিন অশ্রু মুছি নিল
চৈত্ররাতে অসংবৃত হাওয়া
সায়রনীল তোমার আঁখিপাখি
আমি   বকুলতলে ছায়ার নীচে থাকি
ঘনিয়ে এল ও কার চাওয়াপাওয়া
ফুলের ভারে আঁচল ভরে দিল

কৃষ্ণচূড়ার মঞ্জরী দিই কেশে
পরিয়ে, সখী চিত্তে পাতি কান,
হিয়ায়-হিয়া ত্রস্ত থরোথরো
পরশ লাগি প্রণয় জড়োসড়ো
দূর পথে ঐ কে গেয়ে যায় গান,
কে চলে যায় লজ্জালোহিত হেসে

এতদিন কোথায় ছিলেন?

সংস্কারগ্রস্তের মত তবু আমি দিব্যি গালছি এই রাত্রির। দিব্যি গালছি বৈশাখের এই বাওয়াল বাতাসের যা কিনা ড্রপ খাচ্ছে অ্যাসফল্টে, যা কিনা গোঁত্তা খেয়ে উঠছে আকাশে, ঠোনা ধরে নেড়ে দিচ্ছে পৌরাণিক কবিদের, তাদের দিব্যি গেলে বলছি—বেঁচে থাকব, বেঁচে থাকব আমি। বেঁচে থাকব, যদি তুমি ভালোবাসো, বেঁচে থাকব...যদি প্রিয় মানুষেরা থাকে, আকাশে উড়িয়ে দেয় স্বাস্থ্যবান রক্তের আবির।

যদি বলো বসন্তের দিন—এখন সেসব আমি মনে করতে পারি। যদি বলো গ্রীষ্মকাল—যে কোন স্ফুলিঙ্গেই যখন জ্বলে উঠছিল কুণ্ডলী এবং আশ্বিনের সেই হেমবর্ণ দিন—সব আমি মনে করতে পারি। এতকাল যেন হারিয়েছিলাম স্মৃতিভ্রষ্টের মত। যেন আমার ঘর ছিলনা, দেশ ছিলনা, ছিলনা লেখার হাত, ছিলনা নিশান। বিষণ্ন বিকেলগুলো আমি কাটাতাম অচেনা লোকদের সাথে, তারা আমার সঙ্গে কথা বলত না। সন্ধ্যাবেলায় ল্যাম্পপোস্টরাই ছিল আমার বন্ধু। কীভাবে যে শহরের দিন কাটতো, চোখ মেলে কখনো দেখিনি। আজ যেন সহসাই ফিরে পেয়েছি বুক পকেটে হারিয়ে যাওয়া রেড-কার্ড। আজ যেন প্রত্যেকেই ডেকে বলছে : এতদিন কোথায় ছিলেন? আর, ছাব্বিশ বছর পর ঘুম ভেঙে আমি দেখছি, আজ শনিবার। দেখছি, তারুণ্যরেখার তীরে তুমি : যেন ভাবছ পা ফেলবে কি না। দেখছি, প্রিয় মানুষরা তৈরি হচ্ছে—আরো একবার...

জনগণতান্ত্রিক কবিতার ইশতেহার : পাঁচ

ঝাউবনানীর মধ্য থেকে
হাতকাটা নুলিয়ার সহসা আর্তনাদে যারা শিউরে উঠেছিল.
বলে রাখি, আমি তাদের কেউ নই।

কেননা, তাদের পছন্দ :
১। নিজেকে চাটা, ক্রমাগত চেটে যাওয়া।
২। একঝলক পরস্ত্রীর বুক, পারলে পরকীয়া।
৩। ক্ষমতার আশেপাশে চক্কর এবং সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট।
৪। চামচাবাজি, গোলমাল এড়িয়ে চলা, সুবিধা পেলে
লাগানি-ভাঙানি।
৫। মঞ্চ, মাৎসর্য ও বিনি পয়সার মদ।
৬। বন্ধুর মেয়ের সঙ্গে ফস্টিনষ্টি।
৭। প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে জেহাদ।
৮। পার্টিকে যতটা পারা যায় দুয়ে নেওয়া।

তাদের অপছন্দ :
বিবেক, বিবেচনা, দায়িত্ববোধ ও কমিউনিস্ট পার্টি।

সঙ্গতকারণেই আমি এদের চিহ্নিত করছি।

আর, গোড়া থেকে বলতে গেলে,
বীভৎস সেই আর্তনাদ শুনে চিৎ হওয়া ব্যাঙের মত
হাত-পা না ছুঁড়ে, আমি কারণটা খুঁজতে চেয়েছিলাম।
ফলে, ঝাউজঙ্গলের মধ্যে আমায় ঢুকে যেতে হয়,
তখন, বলাই বাহুল্য, রাত বিগতযৌবনা।
ঝিঁ ঝিঁ-র বিরক্তিকর ডাক উপেক্ষা করে এগোতে গিয়ে
সহসাই পায়ে লাগে বালিতে লেপ্টে থাকা চন্দ্রমার আঁঠা।
মেঘ সরে গেলে শকুনশিশুর কান্না স্পষ্টতর হয়;
ভাবি—আহা, সেও তো শিশুই! তবে তার জন্য কেন
ললিপপ এবারও আনিনি?

ঠিক সে সময় তাকে দেখি। ঝাউশিকড়ের পাশে সে,
ছটফট করছে, দু-হাত কাটা এবং দুঃখিত,
সেই অন্ধকারে রক্তের রং চেনা সহজ ছিল না।
কষ বেয়ে নেমে আসা গ্যাঁজলার রং ছিল শাদা,
অথবা তা শ্বেতি-ও সম্ভব।

[পুলিশের হুইস্‌ল বেজে ওঠে আবহসঙ্গীতে,
ধরে নেওয়া যেতে পারে, বালুকাবেলায়
আতঙ্কগ্রস্ত মহিলা ও পুরুষ শিল্পীরা তখন বমি করছিলেন।]

তার দিকে ঝুঁকে পড়ি। মুহূর্তে সে স্তব্ধ হয়ে যায়।
চোখ বোবা। গড়িয়ে যেতে চেষ্টা করে দূরে।
এ সময় নাকে লাগে উপদলের তীব্র গন্ধ।
দেখি—তার কানে নতুন বউয়ের ছিনতাই করা মাকড়ি।
„ —তার বুকে প্রোমোটারদের উল্কি।
„ —দুই হাত হিস্যার অ্যাকশনে কাটা।

তারপর, আমিই তাকে খুন করি,
সে শ্রমিকশ্রেণীর কেউ ছিলনা।

জনগণতান্ত্রিক কবিতার ইশতেহার : ছয়

শোনো সেই হরিণের কথা, মাংসই ছিল যার শত্রু।
শোনা সেই খরগোসের কথা, অহংকার যাকে ছুঁতে দেয়নি
দৌড়বাজির শেষ ফিতে।
শোনো সেই কুমীরের কথা, বিশ্বস্ত শিক্ষক যার
সন্তানদের খেয়ে ফেলেছিল।
শোনো সেই ছাগলের কথা, বাঘ যাকে ভয় পেতো।
আব, সেই রাখাল—
সত্য থেকে দু'কদম পিছিয়ে থাকত যার বাণী।

শোনো, আকাশ কীভাবে শেষ বিকেলের বৃষ্টির পর
শোলার মটুক পরে সেজে ওঠে, কীভাবে দগ্ধ দিন

জুড়িয়ে দেয় মেঘ, কীভাবে ঝড় ওঠে, শোনো,
কীভাবে ঝড় ওঠে...

এসবই কি লিখে গেছেন বুড়ো মার্কস?

জনগণতান্ত্রিক কবিতার ইশতেহার : সাত

গন্ধক মাখানো শব্দ : ও আমার সামোরা মাচেল,
প্রথমে দাঁড়াও শূন্যে তারপর ভাসো,
উড়ন্ত গালিচা থেকে নীচে দেখা যায়
লুয়াণ্ডা শহর জুড়ে অর্ধনত প্রতিটি পতাকা।

সংসদবিরোধী শব্দ : ও আমার বি টি রণদিভে,
ছেড়োনা আমার হাত, রাত্রির প্রতিটি ট্যাভার্ন
মুম্বই শহরের বোবা পেটে গলে যাচ্ছে,
তাদের বেষ্টন করে জেগে উঠছে ওয়াটার ফ্রন্ট

আক্রান্ত মরিয়া শব্দ : ও আমার কেন্দ্রীয় কমিটি,
কমরেডদের কষ্ট দাও, আমাকে অনিদ্রা।

জনগণতান্ত্রিক ইশতেহার : আট

যারা অনুভব করে গাড়িচাপা কুকুরের মৃত্যুকালীন ঘৃণা,
যারা শুনতে পায় চোয়ালে বঁড়শি আটকানো মাছের আর্তনাদ,
যারা শিক্ষা নেয় একবার হুল ফুটিয়েই মরে যাওয়া মৌমাছির থেকে,
যারা বিশ্বাস রাখে শীতপাখিদের অবিশ্রান্ত ডানায়...

রাস্তা থেকে জল উঠে এসে গাড়ি বারান্দার নীচে শুয়ে থাকা
যে ছেলেকে ভাসিয়ে দিচ্ছে থৈ থৈ, আর
আধঘুমে সে খিস্তি করছে, কাঁচা খিস্তি করছে
এই জলকে, তার হারিয়ে যাওয়া মা-কে আর ঐ ভগমানকে...

সারা গায়ে কেরোসিন ঢালতে-ঢালতে খিল-খিল হেসে উঠছে
বিকারগ্রস্ত যে বউ, আর মাথা ঠুকছে,
মাথা ঠুকছে দেয়ালে—আর জন্মে যেন মেয়ে না হই মা,
আর জন্মে যেন...

হস্টেল থেকে যাকে ছেঁচড়ে বার করা হল,
কুপিয়ে কাটা হল হাত, ছিঁড়ে ফেলা হল জিভ,
আঙুল ঢুকিয়ে দেওয়া হল চোখে, তারপর
কুয়োয় ঠেসে ঢুকিয়ে দেওয়ার আগে মুখে গুঁজে
দেওয়া হল শুয়োরের মাংস, আর
তামাম ভাগলপুর জুড়ে সেইমাত্র উড়তে থাকল চুল,
মাঠে-রাস্তায়-পোষাকে-বিবেকে লেপ্টে থাকল চুল...

চ্যাসিসের নীচে ঢুকে যে সারাচ্ছে ক্লাচপ্লেট,
যে খুঁড়ছে ট্রামলাইন আর ভোরের আগেই
সারিয়ে দিচ্ছে ঠিকঠাক,
ফার্নেসে যে ঠেলছে কয়লা আর আগুন হয়ে উঠছে লোত্রেকের ছবি,
যে তৈরি করছে সুতাকলের উন্মত্ত স্পিরিচ্যুয়াল...
শাদাশহরের রাস্তায় সন্ত্রস্ত যে কালো মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে
পারমিটহীন...

তাদের কসম...

তাদের কসম...

আমরা মনে রাখব বিশ্বাসভঙ্গের প্রত্যেকটি অক্ষর,
অতিক্রম করব আরো একটি বেইমান শতক,
ফিরে লিখব প্রতিটি লুঠতরাজ আর
মাল ভাগাভাগির ইতিহাস।

মনে রাখব আমরা—
'সমাজতন্ত্রহীন' ইওরোপের সাহেবরা যাদের
নিগার বলে ডাকতে ভালোবাসেন।

সময়-অসময়ের বৃত্তান্ত...

বুদ্ধিজীবীর আত্মকথা

অবিরল রিক্ততার মধ্য দিয়ে আমি সমুদ্রের দিকে হেঁটে যাই। উন্মাদ স্রোতরাশি ধেয়ে আসে। চারপাশ লবণাক্ত হয়ে গেলে অসমোসিসক্রমে আমার ভিতর থেকে অনেক লবণ ঝরে পড়ে। অসংখ্য ছোট ঢেউ, বড় ঢেউ, হাঙরের ঢেউ থেকে মাথা উঁচু করে দূরে দেখি মেঘ করে কিনা। মাঝি থাকে। গাবলেপা নৌকোয় জড়োসড়ো হয়ে যাত্রীরা বসে থাকে। এখন এদের ভয়, আর পাড়ে উঠবার পর উপহাস।

আকাশে মেঘের মুখ, আর শির বার করা মাঝিভাই—আপাতত এরাই জীবন। কখনো মেঘের খুব অভিমান হলে আমার সমস্ত স্নায়ু দশমিক তিন-আট পুলিশ-স্পেশ্যাল। মাঝির হাতের পেশি হরতাল ঘোষণা করলে আমার আঙুলে সব পৃথিবীর মায়েদের স্নেহ। জীবন কাটানো মানে—কাজ। কুঁড়ে ঘর, হাতরুটি, কাজুবাদামের মদ—এইসব কাজের বদলে পাওয়া যায়।

দিনশেষে ফিরে আসি। শাঁ-শাঁ সন্ধ্যায় ঘরে ফেরে সবকটি সিন্ধুশকুন। লাথি মেরে দরজা খুলে ফেলি। কেরোসিন ডিব্বায় আগুন ধরাই। অসুস্থ আলোয় দেখা যায় ঘরে দেয়ালে ঝোলা মানচিত্র, দেখা যায় ধাতব কম্পাস। প্রচুর প্রচুর মাল টেনে একা-একা ফিরে যাই সমুদ্রের কাছে।

সে আমাকে ফিরেও দেখেনা। পাড়ে বসে তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ্য করি মেঘ। বুঝে নিই আবহাওয়া স্বাভাবিক কিনা। লাইটহাউস দূরে জ্বলে ওঠে। তরলের মাতামাতি দেখে দেখে ক্লান্ত হয়ে উঠি। কাগজের লোক এসে প্রশ্ন করে, সাগর কি আমার স্বদেশ? তার কানে মুখ দিয়ে চুপি চুপি বলি, নেহাৎই কাজের দায়ে এখানে এখনো টিকে আছি। সব লোক পার হলে নির্বিবাদে ফিরে যাবো পাহাড়ের কাছে।

উন্মোচিত চিঠি—সাত

আনু, মনে করো আজ থেকে তুমি আর আনু নও, চিরদিনই আমিনা খাতুন,
মনে করো, মনে করো, তুমি আজ আমিনা খাতুন, তুমি ছোটবেলা থেকে
আলসের ধারে বসে পেয়ারা চিবুতে, তুমি ভয়ঙ্কর দস্যি ছিলে, আবার হঠাৎই
কেন যে অন্যমনা হয়ে যেতে, আজকের আমিনা খাতুন, তুমি
নিজেই জানোনা

মনো করো, মনে করো, আমিনা খাতুন তুমি, চতুর্থ তালাকের পর এক অসহায় মেয়ে
মল্লিকবাজারে আছো, অন্ধকারে আছো এক বস্তিতে, বস্তিদেশ ভেঙে গ্যাছে
আমিনা খাতুন,

আমার প্রণয়ী ওগো, ষাট টাকা মাইনে পাও, ষাট-ষাট-ষষ্ঠীর অসহ্য কৃপায়
ভ্যাপ্‌সা কোটর ভরা শিশুপাল, শূন্যতা ছেয়েছে শুধু তোমার ঐ মৃতবৎসা চোখ।
এবার তোমাকে লিখি, আমি রোজ জানলার ফাঁক দিয়ে টিপ্ করে পেয়ারা ছুঁড়তাম,
আমি রোজ কলেজ যাবার পথে আড়চোখে ঐ দিকে তাকিয়ে দেখতাম,
মোহরের জন্য আমি তোমাকে পাইনি, আন্,
আমিনা খাতুন, আজ কোথায় মোহর
শীলমোহরের ছাপ শুধু তোমার কপালে দাগা,
কোনদিন কারো কাছে জরু বলে জরুরী হবে না।

আমার থুৎকার ছাড়া সেহেতু কিইবা আর মোল্লাগুলো পেতে পারে বলো?
মানুষের লাথি ছাড়া কীইবা অর্ঘ্য পাবে হারাম রাজীব?

নভেম্বরের সঙ্গে গপ্পোসপ্পো

কাল রাতে বাড়ি ফিরে দেখি সারা গায়ে কুয়াশার র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে বসে আছে নভেম্বর। আমায় দেখেই সে একগাল হাসল। অবাক হয়ে বললাম, 'কী ব্যাপার...এতদিন পরে?' সে বলল, 'এই তো...তারপর, কেমন আছো?' ঘামে ভেজা জামাটা গা থেকে খুলতে খুলতে আমি বললাম, 'কেমন দেখছ?' আমার উঁচোনো কণ্ঠা আর প্রকট পাঁজরের দিকে চেয়ে সে বলল, '...ভালোই'। আর, এইভাবেই শুরু হলো আমাদের গপ্পোসপ্পো।

ভালোবাসার কথা উঠে আসে অনিবার্যভাবেই। অদ্ভুত বল নিয়ে খেলা শুরু হয়। সেন্টার লাইনের একটু পিছন থেকে নভেম্বরের গোলকিপারের বাড়ানো হাফ ভলি বুক থেকে পায়ে নিয়ে নেয় তার স্টপার। এক মুহূর্ত পরেই মাপা থ্রু কুড়িয়ে নেয় তার রাইট উইং। ছুটতে ছুটতে হালকা ডজে পেরিয়ে যায় আমার লেফট হ্যাফকে। থমকে দাঁড়ায় একবার, তারপর বল বাড়িয়ে দেয় স্ট্রাইকারকে। সে এগোয়, বাঁদিকে ঝুঁকে ডান পায়ের টোকায় ঝেড়ে ফেলে একজনকে...আর একজনকে...তারপর বল থামিয়ে চট করে সরে যায়। ততক্ষণে ওভারল্যাপ করে উঠে এসেছে নভেম্বরের স্টপার। হাঁফাতে হাঁফাতে আমি চেঁচিয়ে উঠি, 'অফ সাইড...অফ সাইড...আমার

গোপনতম কথা কিছুতেই তোমাকে বলব না। কে তুমি? কেন বলব?' কিন্তু লাভ হয় না, ইতিমধ্যেই আমার গোলরক্ষকের অসহায় চোখের সামনে দিয়ে স্মৃতি ও দুঃখের জালে জড়িয়ে যায় লজিক্যাল শব্দের গোলক। টেবিলবাতির নিবন্ত আলোর দিকে চেয়ে আমি স্বীকারোক্তি করি, 'হ্যাঁ, নভেম্বর, অবশেষে...অবশেষে আমি ভালোবাসতে শিখছি।'

মেঝের ফাটলে ছায়া। মৃত পোকাদের রাশ জমে থাকে চটির উপরে। নভেম্বর বাবা-র কথা বলে। আমি চুপ করে থাকি। নভেম্বর মা-র কথা বলে। আমি চুপ করে থাকি। রং চটা বাড়ি, শিউলি গাছের নীচে বোনের কবর, একমাত্র ভাইটার কথা বলে নভেম্বর। আমি শুধু চুপ করে থাকি। আমার চাকরির কথা, আমার স্বাস্থ্যের কথা বলতে বলতে...নভেম্বরও চুপ করে যায়।

তারপর রাজনীতির কথা। নভেম্বর বলে, 'সংশয় হয় না?' বিস্ময়ে আমি চোখ তুলি। সে বলে চলে, 'যখন প্রত্যেক বলে—তুমি ভুল। প্রভাতী কাগজ বলে, সুজন বন্ধুরা বলে, প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্ব হাত ধরাধরি করে বলে—তুমি ভুল তোমার চিন্তা ভুল, অর্থনীতি ভুল, দর্শন ভুল, তোমার কবিতা ভুল, রাজনীতি ভুল, তোমার জিন ভুল, ক্রোমোজোম ভুল, হাড়ের গঠন ভুল, লোহিতকণিকা ভুল—অনুতাপ হয় না?' এইবার আমি হেসে উঠি। হাসির দমকে কাঁপে দেয়ালে ঝোলানো ম্যাপ, বই তাকে রবীন্দ্ররচনাবলী, 'ভট্টাচার্যের সহিত বিচার।' কোন ক্রমে হাসি চেপে বলি, 'আমি তেভাগায় মরেছি, তেলেঙ্গনায় মরেছি, ভুখা মিছিলে মরেছি, লং মার্চে মরেছি। আমি মরেছি বিলোনিয়ায়, কাবুল-কানসারা-রোমানিয়ায়। আমাকে মারা হয়েছে কারণ আমি শিখ, কারণ আমি হিন্দু, কাবণ আমি ইহুদি, কারণ আমি মোসলমান। সিঙ্গুরে, উজানে ধর্ষণ করা হয়েছে আমাকেই। শেখানো হয়নি বেদ, দেওয়া হয় নি শিক্ষা, দেওয়া হয় নি চাকরি। আমি খুন হয়েছি শৈশবে, যৌবনে, মৃত্যুর পরেও খুঁড়ে ফেলা হয়েছে আমারই কবর। লড়তে লড়তে, মরতে মরতে, আজ যখন লড়াইটা আমার কব্জায়, তখন তো পাতি সংশয়ের জন্য আর ফিরে দাঁড়ানো চলে না। নভেম্বর, আমাকেই তো মরতে হয়েছে, নাকি? আমাকেই তো...'

নভেম্বর যখন উঠে দাঁড়ালো, তখন রাত প্রায় শেষ। দূরে কোথাও আর্তনাদ করে উঠলো কাক। পূবের আকাশে তখন মহল্লায় মহল্লায় জ্বলতে থাকা লাল আভা। সেইসঙ্গে শিশুর কান্নার আবহ। গা থেকে কুয়াশার র‍্যাপার খুলে ফেললো নভেম্বর, ডানা মেললো সেই দিকে। উড়তে উড়তে ক্রমশ মিলিয়ে গেল তার দেহ...

আগমনী

তোমাকে মানাত এককুচি নাকছাবি
শরৎসকালে গিটারবাদিনী রাই,
শহরে আমরা—কলম পিষিয়ে যারা
উন্মুখ হয়ে উঠতাম সব্বাই।

পার্থপ্রতিম লিখতেন ঠিক—'যেন
তারনযন্ত্রে সুররতিখেলা ইহা।'
সুতপা অল্প ঈর্ষাপ্রবণ হত
ভাস্করদাকে ছুঁতো নস্ট্যালজিয়া।

শঙ্খবাবুর সহসাই অনুভবে
আবার অতীত-ভবিষ্য যেত খোয়া,
পাঁজরে তারের শব্দ সঙ্গে নিয়ে
সুরবারিধিতে ভেসে থাকতেন নোআ।

জয় কী লিখতো? কী জানি, ওকে তো আর
কোন তত্ত্বেই বাঁধা যাচ্ছে না, তবে
গৌতম ঠিক জেগে উঠতই জেনো,
গিটারব্যাকুল প্রপঞ্চময় ভবে।

শৈলেশ্বর?—অভিনিবিষ্ট মেয়ে,
কুকুরের মত দূর থেকে বসে তিনি
শুধু শুনতেন, এই আশ্বিনে আর
সফলতা নেই, শূন্য হয়েছে তূণীর।

গ্রত কবিদের বেদনা জানাতে গিয়ে
নিজের কথাই ভুলে বসে আছি কবে,
ও নিয়ে ভেবোনা, তালিম চালিয়ে যেও
এই পুজোতেই কিনে দেব তবে ফ্লব্যের।

মুখুজ্যের প্রতি

রাজার সঙ্গে আঁতাত করেন যিনি
আমাদের সেই গুহকের প্রতি ঘেন্না

রাজপুত্রকে খাওয়ান-পরান ভালো
টাকা-পয়সার প্রতিদান তিনি নেন না

ভালোই তো হয়, বদলে গদির গা
চুমকি বসানো কিংখাবে যায় ঢেকে

এবং পুরাণে সোনার আখরে নাম,
ছেলেমেয়ে যাতে এরকম হতে শেখে

শেখে অনেকেই, শেখেওনা কেউ-কেউ
দূর থেকে ঠোকে ভালোমান্‌ষিকে পেন্নাম

রাজার পড়োশি হতে চান যিনি আজ
আমাদের সেই দালালদের প্রতি ঘেন্না।

অ্যাসিড

শপথ? আমিই তো শপথ। বেহুদা কবিরা সব যে-যার লিঙ্গ ধরে শুয়ে আছে বলে ভাবো কেউ রাত জাগছে না? ঘৃণা? আমিই তো। আমিই তো উল্কা ও ইস্পাত, আমিই সময়-বোমা, বুকের বাঁ-দিকে কান পাতো, টিক-টিক শব্দ শুনতে পাবে। আমারই মাথার মধ্যে গিজ-গিজ করছে স্‌প্লিন্টার। এই ঘোর শকুন ও শিবার রাত্রে আমি কাফন জড়িয়ে ঠায় জেগে আছি। আর, চতুর্দিকে পুড়ে যাচ্ছে বীরচন্দ্রমনু। আ, আমিই তো নরক, ইবলিশ আমার কাঁধে দীর্ঘ কালো ডানা মেলে বসে আছে। কমরেড পার্টি, তুমি একবার অনুমতি করো, আমি ফিউজে আগুন দিই। আমি ফেটে যাই, বিস্ফোরিত হই, জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিই হারাম কি অওলাদ ঐ জোট-সরকার। কমরেড পার্টি, তুমি একবার অনুমতি দাও, একবার....

চ্যালেঞ্জ

অটবি-টটবি আর ভালো লাগেনা মাইরি, জঙ্গলে থেকে থেকে ঝিঁ-ঝিঁ ধরছে কানে। এখানে আসার কোনও ইচ্ছে ছিল ভুলেও ভাববেন না, নেহাত এটাই কাছে, কাকা-পিসেদের বাড়ি টাইমলি পৌঁছতে পারিনি। আর, তারাও আদৌ ঠাঁই দেবে কিনা...এ বাজারে কার না আপন প্রাণ প্রিয়! মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, আপনাকেই চিঠি লিখছি, বিশ্বময় ছড়িয়ে দিচ্ছি কপি। আপনার গুণ্ডাদের যা যা করণীয়, তারা সেটাই করেছে। ভাঙা খাট, পোড়া বাঁশ, খুকুর পুঁতির মালা ছত্রখান হয়ে আছে খোয়াইয়ের গ্রামীণ ভুবনে। বউটা আছে না গেছে এখনও জানিনা, মুখ্যমন্ত্রী, দয়া করে খবর নেবেন না। আপনার করুণায় বেচারির নজর লাগবে। বরং দেখুন এই বুনো মাটি বীজের অপেক্ষায় আছে ঋতুভর। সাঙ্গ তবু জুম চাষ, জুমিয়া নারীর রক্ত জলপাই উর্দিতে মাখামাখি। আজকাল কোথায় টি এন ভি থাকে স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রক? আপনার প্রযোজিত আহার-বিহার ছেড়ে এখানেই তাদের পাঠান। সঙ্গে দিন বাছা নিরাপত্তা সেনা। আমাদের কিছু নেই শুধু এই মাটিটুকু কামড়ে থাকা ছাড়া। পাঠান সমস্ত খুনি, ফিলিপ্পির এই মাঠে আরও একবার ওরা সি পি এম কাকে বলে চিনে নিক (চমৎকার কবিকুল এইখানে 'কমিউনিস্ট' শব্দটা বেশি বেশি পছন্দ করতেন। বুলেটের সীমানায় সুরুচির অবকাশ কম। ন্যাকাশশীদের ছেড়ে তাই নিজের কবিতা নিজে লিখি)। ঘিরুক বনানী ওরা, যত পারে চুপিসাড়ে চালাক কোম্বিং। আমাদের হাতে থাক নিহত মেয়ের স্মৃতি, নাক ভাঙা ভাইয়ের চেহারা। পাঠান মন্ত্রীবর, পালে পালে হায়না পাঠান! পৃথিবীর লোকজন আরবার জেনে যাক, একজন সি পি এমও হারতে শেখেনা।

মায়াকোভ্‌স্কির শেষ সাতদিন

কে আমাকে বলেছিল, জানলা খুললেই দেখা যাবে
মরশুমের প্রথম টিয়ার ঝাঁক?
কে বলেছিল—এবার আমি সেরে উঠব?
মনে নেই...আমার কোন মুখ মনে পড়ে না।

শুয়ে থাকতে-থাকতে, এই ময়লা হলুদ বাড়িতে
এই ঠাণ্ডা নির্জনতা আর দৈবাৎ কুকুরের কান্নার মধ্যে
আজকাল আমি গন্ধ পাই তুলোর।
গন্ধ পাই পাঁউরুটির কিংবা বিকারে ফুটতে থাকা
ছুরি ও কাঁচির।
ওষুধের মত উগ্র নয়, বরং মৃদু,
দীর্ঘকাল একসঙ্গে কাটাবার পর দর্জি যেমন গন্ধ পায় সূচের;

স্বামী গন্ধ পায় স্ত্রী-র,
যেমন আমি গন্ধ পেতাম রাস্তার, গন্ধ পেতাম
কোলাহলের, ফেস্টুনের, ফিউচারিস্ট জ্যাকেটের,
গন্ধ পেতাম চুলের ফিতের...
কতদিন...কতদিন আগে?

জানলা খুলে দেখলাম শিমূলের শেষ পাতাটাও ঝরে গেছে।
গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল,
কতদিন...আর কতদিন?
মনে পড়ল, খাঁচার বাইরে আমি কখনো টিয়া দেখিনি,
দেখিনি, মফস্বলি স্টেশনের চালে বসে আছে ময়ূর,
জনারের খেতের মধ্যে নেমে পড়েছে নীলগাই,
দেখিনি, এই দাওয়া আর ঐ দাওয়ার মধ্যে
পারাপার করছে গামলা...

কে-জানে কতদিন আমি বাস করছি
বিছানাভর্তি ছারপোকার সঙ্গে, আর
স্বপ্নে দেখছি হতাশব্যঞ্জক, ভীতিকর কয়েকটা শব্দ;
দেখছি—'পার্টিলাইন' শব্দটা কেটে দিয়ে লেখা হচ্ছে
'জমায়েত' আর 'মহামিছিল'।
'গঠনতন্ত্র' কেটে দিয়ে 'প্যানেল' এবং পাল্টা প্যানেল',
'যোগ্যতা' কেটে দিয়ে—'সিনিয়রিটি',
'মতাদর্শ' কেটে দিয়ে—'কালেকশান',
আর, 'বিপ্লব' শব্দটা....কতদিন দেখিনা...কতদিন?

'পাখিরে দিয়েছ গান/গায় সেই গান'—কে লিখেছিল?
আমার কোন নাম মনে পড়ে না।

কে আমাকে প্রতিদিন বলত—বেঁচে থাকো।
কেউ তোমাকে চায় বা না চায়—বেঁচে থাকো
দুঃখে থাকো, আনন্দে থাকো—বেঁচে থাকো।
আর, লেখো আর বেঁচে থাকো আর লেখো আর
বেঁচে থাকো...
মনে পড়েনা, আমার কোন স্বর মনে নেই।

আ, কেন আপনি এত নাছোড়বান্দা সিস্টার,
কী করবে সে বেঁচে থেকে, সে অন্যের কোন কাজেই আসে না?

সলিম লংড়ে পে মৎ রো

তোমার জন্য কোন ক্রাচ্ নেই...

যেহেতু সন্ন্যাসী তার মঞ্জিলের প্রথম সোপানে
ইতিমধ্যে পৌঁছে গিয়েছে।
একে-একে সমস্ত বল্মীক খসে পড়ছে দেহ থেকে,
কৌপিন সরে গিয়ে ফুটে উঠছে ঝক্ঝকে কবচ-কুণ্ডল, আর
দ্রুত ও নিখুঁত ঐ উচ্চারণে শোনা যাচ্ছে 'মরা-মরা' ধ্বনি।
যেহেতু পূর্বদেশে কুয়াশার ক্রমগুলি চিন্তিত করে তুলছে সন্ধ্যাকে,
বসতি জ্বালিয়ে দেওয়া প্রতিটি মাঠের নাম রাখা হচ্ছে—'দণ্ডক',
যা আসলে—'কারবালা'।
এভাবেই রত্নাকর পৌঁছে গেছে মঞ্জিলের প্রথম সোপানে, আর
তুমি জানো, যদি তার দুটো পা-ই আস্ত থেকে থাকে, তবে
তোমাকে নিজের পা সাজিয়ে রাখতে হবে মর্গের ঠাণ্ডা কোটরে,
এবং, তা ধরা হবে খাজনা হিসেবে, নিঃশর্ত, স্বাভাবিক, প্রতিদানহীন।

সেহেতু তোমার জন্য ক্রাচ্ নেই...নাকে কান্না নেই...

কিন্তু আছে নভেম্বর, রুখা বাতাসের স্রোতে পাল তুলে
ইতিমধ্যে পৌঁছে গেছে সেও।
যে বাতাস পরিকল্পনার থেকে দ্রুত শুকিয়ে তুলছে ঘা,
মাছিদের তাড়িয়ে দিচ্ছে ভিন্ন কোন পুঁজ আর দূষিত রক্তের দিকে,
সেই ফাঁকে, ভাঙা বেড়া, মরচে পড়া ছাউনি ফুঁড়ে মাথা তুলছে কিশলয়,
যা দেখে তোমার চোখে বোনের চলচ্ছবি ভেসে উঠছে,
জরায়ুগহন থেকে রক্ত মুছে নিয়ে প্রত্যাশিতভাবেই যে এখন
ছুঁড়ে ফেলেছে বোরখা, কোমরে জড়িয়েছে উড়নি,
গুঁজে রেখেছে কাটারি...আর, যা তুমি দেখছ না,
তা হল রোদ, তা হল অজস্র মাথা নিঃশব্দে যারা

ঘিরে ফেলেছে চারপাই, আর ব্যবহারের জন্য,
বদলার জন্য এগিয়ে দিয়েছে পা।

সলিম, তোমার জন্য পা,
আমাদের সবকটা পা...।

অ্যান্টি ইউ এস সিনড্রোম

হ্যাঁ, আমি জানি আমার স্নায়ুগুলো সব জট পাকিয়ে যাচ্ছে, আমি ভুগছি সেই দুরারোগ্য অসুখে যা এখন মহামারী...কিন্তু আপনি ফিরে যান ডাক্তার, আমাকে সারাবার সাধ্য আপনার নেই...হ্যাঁ, জানি রাতে আমার ঘুম হয়না, চোখের কোণদুটো জ্বালা করে, ভোরের দিকে ঝিমুনির মধ্যে আমি স্বপ্নে দেখি চেয়ারে এলিয়ে থাকা সালভাদোর আইয়েন্দের ঝাঁঝরা লাশ, দেখি হোঁচট খেতে-খেতে একটা ছ'বছরের ইন্দোনেশীয় মেয়ে পার হচ্ছে দশলক্ষ শবদেহ, তার অশ্রুহীন মুখে কাটা দাগ, চটচটে রক্তে তার চুল আঠা হয়ে আছে, প্রতিটি হোঁচটে তার পায়ে জড়িয়ে যাচ্ছে ছিন্নভিন্ন নাড়িভুঁড়ি আর বাহুতে সেলাই করে দেওয়া হয়েছে তারই মায়ের থ্যাঁৎলানো যোনি...আমায় বোবায় ধরে ডাক্তার, আমি গুঙিয়ে উঠি, ওয়াক্ তুলতে-তুলতে আমি ছুটে যাই বাথরুমে...রাতের পর রাত আমার এভাবেই কাটে—এভাবেই, জিনা হারাম হয়ে যাচ্ছে ডাক্তার, আমি খেতে পারিনা, ভাতের স্তূপ থেকে উঠে আসে গাজা স্ট্রিপের বারুদ, ডালের মধ্যে লিবিয়ার আকাশ, মাছের টুকরোর মধ্যে ছালবাক্লা উঠে যাওয়া হ্যানয়ের শিশু...আবার, আবার বমি ডাক্তার, আমি বই পড়তে পারিনা, 'লেটার্স টু থিও'র অক্ষরগুলো একাকার হয়ে গিয়ে বোরিনেজের গর্ভ থেকে উঠে আসে সিয়েররা মায়েস্ত্রো...১৫ই এপ্রিল, ১৯৬৭...'প্রিয় ফিদেল, বোলিভিয়ার এই সন্ধ্যা আমাকে মনে করিয়ে দেয় স্বাধীনতার কথা, যা আমার হারিয়েছি গুহাচিত্রের দিনগুলির পর থেকে...প্রিয় ফিদেল...লট্‌পট্‌ করতে থাকে কাটা দুখানা হাত...ওঃ, সব-সবকিছু জট পাকিয়ে যায় ডাক্তার, এক মুহূর্ত শান্তি নেই, মাথার মধ্যে খান সেনাদের বেয়নেট, কন্ট্রাদের উল্লাস, কার্বাইডের কৌঁসুলির বেহুদা সওয়াল আর অবিশ্রান্ত কার্পেট বম্বিংয়ের গর্জন...বি-ফিফটি টু, এওয়্যাক্স- সেভেন, জে-স্টার, ডবলিউ এম সিক্সটিন মর্টার...বুম্-বুম্-বুম্...আমার কানটাও বোধহয় গেছে...নইলে কেন আমি শুনতে পাচ্ছিনা ক্রেমলিনের সেই ঘণ্টাধ্বনি, যা কিনা ভরিয়ে রাখতো আমার তারুণ্য-কৈশোর...হ্যাঁ, জানি আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি ডাক্তার, কিন্তু আপনি ফিরে যান, আমাকে একা থাকতে দিন, আমার ভালো লাগছে ফাঁকা হয়ে যেতে, তর্কবিতর্কহীন

বিবেকদংশনহীন একদম শূন্য হয়ে যেতে..এই পবিত্র এপিডেমিক—এরই চুমুতে-লালায়-কামড়ে আমি হয়ে উঠছি উন্মাদ, আপনি যান ডাক্তার, আর আপনার কোনো দরকার নেই, ক'টা দিন পরেই আমি পুরোপুরি ভারসাম্য হারাবো, কিন্তু তার আগেই জোগাড় করে নিতে পারব একটা অন্তত ছুরি...হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি জানি একজন প্রায়োন্মাদ পাসপোর্ট বানাতে পারেনা, তাছাড়া ইসলামেও আমার বিশ্বাস নেই, তাই বাগদাদ পৌঁছবার সৌভাগ্য হয়তো হয়ে উঠবে না, তবু এই শহরে আমারই মতো অসংখ্য প্রায়োন্মাদের ভিড়ে মুখ লুকিয়ে আমি পৌঁছে যেতে পারব মার্কিন দূতাবাসের সামনে, নিঃশব্দে অপেক্ষা করতে পারব একটি নিষ্পাপ শ্বেতাঙ্গ দম্পতির জন্য, তারপর...তরুণ মার্কিনটির কণ্ঠায় ঠেকানো ছুরিটা সরিয়ে আনার আগেই, তার ফ্যাকাশে মেরে যাওয়া স্ত্রী-র নীল চোখের দিকে চেয়ে বলব : 'এর্নেস্তো চে...আমাদের এর্নেস্তোরও এমনই একটা বউ ছিল মাদাম...ভয় পাবেন না, তার মতো অবস্থা কখনই আপনার হবে না, কেননা শেষ পর্যন্ত আমরা মানুষ...অসহায়ভাবে মানুষ...যা আপনার প্রেসিডেন্ট নন...লিঙ্কনের পর থেকে যা আপনাদের প্রেসিডেন্টরা কখনো ছিলেন না...

থুঃ...!'

স্বাধীনতার স্ট্যাচু

'ইউ.এস.এ—হোয়্যাব লিবার্টি ইজ এ স্ট্যাচু।'—নিকানোর পাররা

সমুদ্রস্নানের পর তোমাকে নোন্‌তা লাগে আরো,
ঠোঁট প্রায় রক্তহীন, চোখের কুসুম ছাড়া শাদা অংশটি
ওয়াইন-রঙিন আর অ্যাপেটাইজার;
এবং, কাঁধের থেকে স্ট্র্যাপের ইশারা সরে গেলে,
যে সময়ে মাথা তোলে অলিভ কলার-বোন, আর
বাহুর উৎরাই বেয়ে ধ্বসে পড়ে রৌদ্র গ্লেসিয়ার
সে সময়ে—ভ্রষ্ট কমিউনিস্ট আমি—চেয়ে দেখি
নীল শর্টস্, বালিয়াড়ি, বিয়রের উপুড় বোতল—
এসব ডিটেল থেকে
সহসা বিন্যস্ত হয় লা ভেগা-র উৎক্ষিপ্ত বর্ণবিদ্বেষ।

আত্মহত্যার প্রত্যুত্তরে

আমার সেই ডানা?—অবশ্যই,
সেহেতু উড়ি আর ওড়ার ডায়েরি

রচনা করে চলি; অথচ তুমি সই
সহসা কেন আজ এতটা বৈরী?

তোমার চোখে আমি তেমন কোন রাতে
চেয়েছি আশ্রয়?—চেয়েছি, মনে পড়ে।
যদিও সেই চাওয়া ভাষার অজুহাতে
কেবলই ইঙ্গিত, ভীতু ও থরথরে।

এবং তুমিও তো মিষ্টি বাক্যে
অনেক স্তব্ধতা মিশিয়ে বলেছো,
'এখানে ঠাঁই নেই, তথাপি আক্কেল
না হলে সংকটে পড়বে ওলো চোর।'

আমিও ফিরে গেছি, বাড়তি কিচ্ছু
বলিনি আর—যথা : তোমার এই ঘরে
ক্লান্ত দুই ডানা খুলতে ইচ্ছুক
ছিল এ যাযাবর, আর তা চিরতরে।

কী মেয়ে? এই কথা বলে তো প্রত্যেকে?
আমিও বলতাম, কিন্তু ছদ্ম
শোনাতে পারে ভেবে সে জনপদ থেকে
নীরবে ফিরে গেছি। যেখানে ঘরদোর,

যেখানে শীতকাল, যেখানে মেলা আর
যেখানে পাহাড়ের মাটিতে পা পড়ে
কোথাও যাইনি আর একে অহংকার
ভাবলে পরে, সখী, নাচার কিংকরে

ন্যায়ত দেওয়া হবে মহতী গর্বের
ঝাল ও নোন্‌তার কয়েক টুকরো;
এবং, তারপর ক্লান্ত পর্বে
আবার আলোগান—সাবেক কুঁকড়ো।

তাহলে, বলো মেয়ে, আর কি শাসনের
কথাও তোলা যায়? বরং, পাখনা

এসব রূপকথা পুনর্বাসনের
কানে না তুলে, সখী, উড়তে থাকনা।

মধ্যবিত্ত ও ভালোমানুষ কালীপদ সেন-এর জবানবন্দী

সাতে-পাঁচে থাকিনি কখনো,
আমাকেও নরসিমা রাও
বেবাক নিলামে তুলে দিয়ে
ভাবলেন মারা যাবে দাঁও।

আর, আমি প্রাচীন এশীয়
অসহায় ঝিমে ভুলি সাধ,
দেখছি—স্বপ্ন ভেঙে যায়,
দেখছি—কাটেনা অবসাদ।

এ সময়ে আমার দরিয়া
তোলপাড় করে কারা আসে?
আমার প্রাচীন ভাঙা ঘাটে
ও কার জীর্ণ নাও ভাসে?

মাল্লারা ছেঁড়াখোঁড়া, শীর্ণ,
জটাধরা চুল, গালে দাড়ি,
বহুদিন নেই বন্দর,
বহুদিন ডাঙা-সাথে আড়ি।

ডেকে বলি, 'এখানে এসোনা
কিছু নেই তোমাকে দেবার,
ঝাঁকে-ঝাঁকে বিদেশি পাখিরা
খেয়ে গেছে শস্য এবার।

আমার নিজেরই ঘর ভূখা,
একটিও দানা নেই বাড়তি।'
এই শুনে এক নাবিক
হেসে বলে, "আমি—হোসে মার্তি.

শুধু দূর দেশ থেকে নয়,
দূরের সময় থেকে আসছি,
শুনেছি এ মরদের দেশ
না হলে, সাঙাত, তুমি বাতচিৎ

শুরু করবার আগে দেখতে
জাহাজ এ-ঘাট ছেড়ে যায়—
আমরাও মরদ বটি তো,
আপাতত অনন্যোপায়।

যা হোক, কাজের কথা বলি,
এই দেখো—এরা প্রত্যেকে
আমার লড়াকু সন্তান;
কী বুঝছ, বলো, মুখ দেখে?

নিকোলাস গ্যিয়েন এর নাম,
কবিতা লিখতো বেড়ে—মানি,
আর জন ছিল ডাক্তার,
সহ্য হয়নি রাজধানী।

সব ছেড়ে বোলিভিয়া নামে
ভিনদেশে গিয়েছিল, শোনো,
সেইখানে শুধু ওর নামে
শয়তানও ডরায় এখনো।

অন্যেরা এরকমই সব
কেউ কম, কেউ কিছু বেশি,
এবং, সবাই বেপরোয়া
হানা যদি দেয় পরদেশি।

আর, আমি এক শতকের
কিছু কম দূর থেকে এসে
এদের জুটিয়ে নিয়ে পাড়ি
দিয়েছি তোমার উদ্দেশে।

যেহেতু আবার আমাদের
দরজায় নখের আঘাত
শুরু হয়ে গেছে, বন্ধু হে,
হাত আছে, যা নেই—তা ভাত।”

এসব কথার ঘোরে আমি
অসহায় বোধ করি আরো,
বলি—“সবই বুঝলাম, তবে
ঐ ভাত লাগবে আমারও।

কীভাবে তা আপনাকে দিই
বুঝিয়ে বলুন সিনিওর,
এখন তো আমাদেরও পেট
অন্নের অভাবে কাতর।”

যেই না বলেছি এই কথা
অমনি পিছন থেকে জোরে
ঠেলা মেরে আমাকে সরিয়ে
পাঞ্জাবি-পায়জামা পরে

এগিয়ে আসেন একজন,
মুখ খুব চেনা-চেনা লাগে,
(কী যেন...কী যেন এঁর নাম...
কোথায় দেখেছি যেন আগে...?)

বলেন, “আসুন, কমরেড
দেরি হয়ে গেল অল্প,
দীনেশ মজুমদার আমি
শুনেছি অনেক গল্প,

আপনার এবং এঁদেরও;
অবশেষে দেখা হল আজ,
আসুন, প্রথমে বিশ্রাম,
পরে হবে পরেকার কাজ।”

হাতে-হাত ধরে ওঁরা যান—
আর আমি বিমূঢ় ও ভীত,
চমক কাটিয়ে ডেকে বলি,
“দীনেশদা, আপনি তো মৃত...।

কীভাবে এলেন এইখানে?”
এই শুনে দুজনেই জোরে
হেসে উঠলেন, তারপর
বললেন, “ধরো, গেছি মরে,

তা বলে কি আসতে পারিনা?”
আমার নীরব চোখে আর্তি
দেখে এক হাত কাঁধে রেখে
এইবার বললেন মার্তি—

“মারা তো আমিও গেছি কবে,
মৃতরাই এখন চালায়
রসদের জাহাজ এবং
জীবিতরা ঘাঁটি আগলায়।

দু-দলে মিলেই সংগ্রাম
না হলে কী ভাবে জয় হবে?
যদিও তোমার মত বাঁচা...
বাঁচো বাপু, লাভ নেই তবে।”

কুঁকড়ে গুটিয়ে যাই আমি,
জল ফোটে চোখের কোণায়,
দীনেশদা দেখেন এসব
দৃষ্টি আবার ফিরে যায়।

বলেন, “অনেক কথা হল,
তাহলে এবার তুমি যাও,
শহরে যেখানে যত ফুল
নিয়ে এসো, জাহাজ সাজাও।

যার যত খুদকুঁড়ো আছে।
নিয়ে এসো, ডালা ভরে দাও,
আশা-নিরাশার ভাঙা ঘাটে
ঐ দেখো, দোল খায় নাও।

তোমার-আমার ভাঙা ঘাটে
একরোখা কিউবার নাও।"

সংক্রান্তি

মেঘ ঝুঁকে আছে বহুতল সেই মানুষের
সিঁথির উপরে, যেখানে কখনো সিন্দুর
ছোঁয়াবেনা আর, বরং কাটাবে এরপর
চেতাবনি দিন, সাঁজোয়াজীবন অম্বার।

আমি তাকে বলি (প্রকরণগত কারণে
নীরব ভাষায়)—"স্বীকার করাই ভালো,
আমারও রক্তে গত কয়েকশো যুগ
দূর থেকে আসা অক্ষত আধিপত্য;

তবু কি আমাকে একটুও ভালোবাসবে?
যদি কোনদিন নতুন বর্ষপঞ্জি
বিধান জানায়—আমি এতদূরই আমি
হয়ে উঠেছি যে, আজ থেকে সংক্রান্তি।

সেদিন বাসবে? যেদিন বিপত্তারণে
সময় ফুরোবে দশপ্রহরণধারণের?"

রুস্তম

ফাদার-মাদার কি দোয়া, কুছ করো সাব, উয়ো লড়কি কো মানাও। ইসি খতরায় হামি গিরে গেছি স্রিফ উসি কি লিয়ে। তকদির কা রকম দেখো সাব, একবার পানি মে ডুবায় তো ফির আশমান মে উঠায়! কিঁউ হামি মালটাকে দেখলাম? কিঁউ শোচলাম কি ইসিকো গার্ল-ফেরেণ্ড বনানে কে লিয়ে জান ভি কবুল?

কহানি তো লম্বি হ্যায় সাব, উয়ো লড়কি চলছিল জলুসে। সাদা সাড়ি, উসমে লাল বরডার, হাথ মে লাল ঝাণ্ডা...একদম লাল হি লাল। তো, ইয়ে লাল পার্টিকা হারামিপন ভি হামার না-পসন্দ্। একবার ইনলোগোঁকো চান্স দে দিয়া তো, সমঝ লো, বরবাদি হি বরবাদি। আজ সালা সাট্টা বনধ্ তো কাল দারু বনধ্...পরসোঁ তো সারি ইলাকা ভি সাফ্। হামারি মহল্লে মে, সাব, আপন তো ইয়ে লাল ঝাণ্ডেকা চুদুর-বুদুর একদম তোড়ে দিয়েছি। সালা কম্‌নিস্ দেখো ঔর মারো, দেখো ঔর...কা বোলা সাব? আরে নাহি-নাহি, আপনলোঁগ এক হাথ মে কাংগ্রেস ঔর দুসরা হাথ মে হিন্দু-পর্ষদ কো লে কর চলতা হ্যায়, ডর নে কা বাত কাহে? তো যো বোল রহা থা সাব...ইয়ে লাল ঝাণ্ডেওয়ালী কো দেখ্‌কর...তকদির কা বাত সাব...একদম চক্কর লেগে গেলো। দেখনে মে হামি বদ্‌সুরৎ না আছি, কাপড়া ভি মরডান—সো মেরে দিলাম আঁখ। হারামি করল কি, জলুস ছোড়কে বাহার আসে লাগিয়ে দিল থাপ্পড়। আপন কো...থাপ্পড়...সাব, রুস্তম কো থাপ্পড়...! পাব্লিক ভি জুটে গেলো...

কাঁহা ভাগবো সাব? রুস্তম কো খুদা নহি, ইবলিশ নে ভেজা। উসি নাইট মে সালীকে হামি তুলেছি। ও ঘর লওটছিল, সড়ক থা সুন্‌সান্, তো হামার সাথ ছিল মিশিরজী কো পেরাইভেট। রামপুরিয়া টাচ করিয়ে দিয়েছি বুকে...ফির সিধা ঠেক-এ। এক না, দো না, তিন নাইট—তিসরা নাইট গুজর নে কা পহলে উসি রাস্তে কা পাস ছোড়ে দিয়েছি—নাঃ, সেন্স নাহি থি উসকি।

খএর, গড়বড় ওয়হি সে স্টার্ট। কা বাতাউঁ সাব, পহলা নাইট সে হি উয়ো লড়কি লফড়াবাজি তো দূর, চিল্লায়া ভি নহি। মগর, ইতনি বড়ি-বড়ি—উসকি আঁখ, উসমে বুঁদ-বুঁদ পানি...দুসরি নাইট মে পানি ভি নাহি থি সাব-স্রিফ্ আগ, বর্ফ কি মাফিক শীতল—আগ, ঔর হোঁঠো মে হামার কিস্‌ কা লহু...আপন কা তো গজব হো গয়া! উঁসি দিন সে উয়ো আঁখ, উয়ো লহু, মেরা পিছা কর রহা হ্যায়।
নাহি সাব, মাফি মাঙতে হামি গিয়েছি। মগর মাফি তো উয়ো নাহি কি। হামি বোলিয়েছি, তব পুলিস কো বুলাও, জেল ভেজো মুঝকো। উয়ো পুলিস কো ভি বুলায়া নাহি। তব আপন বোলা, মুঝকো শাদী করো কমসে কম। উসকি আঁখো সে ফির ওয়হি আগ নিকলি...অন্দর চলি গয়ি উয়ো। আপন খিড়কি মে খটখটায়া বহোৎ, চিল্লা-চিল্লা কর বোলা—ম্যায় পত্তা নাহি লিখেগা, দারুকা ধান্ধা ভি নাহি কিয়েগা, নাহি লুটমার, নাহি কুছ, বোলো তো তুমারি পার্টি মে ভি ভর্তি হো যায়গা, তুমকো ইতনা পেয়ার দেগা কি...খুদা কসম, শাদী করো মুঝসে।...কুছ নাহি বোলা, উয়ো কুছ নাহি বোলা...

ইসি লিয়ে আপন ইয়ে পার্টি অফিস মে চলা আয়া। তুম বোলো সাব, অব কেয়া হোগা? মেরা তো নিদ হারাম হয়ে গেছে সাব, একদম পাগলপন আসে গেছে। হ্যাঁ, ম্যায় জলিল হুঁ, আপন কো পিটাই করো সাব, হালাল করো, মগর উয়ো লড়কি কো মানাও। আপন বহোৎ কম্‌নিস্ মারা সাব, চাক্কু চালা কর ফাড় দিয়া, আজ তুম আপন কো ফাড়ো, মগর এক বাত বাতাও সাব? ইয়ে মেরা অন্দর মে যো হো রহা হ্যায়, যো জ্বল রহা হ্যায় মেরা লহু মে...উয়ো কেয়া লাভ হ্যায়? লাভ ঐসন হোতা হ্যায় কা? ফাদার-মাদার কি দোয়া, কুছ বোলো সাব...

নেকড়ে

[অতিক্রান্ত সুখাঃ কালাঃ পর্য্যুপস্থিতদারুণা।
শ্বঃ শ্বঃ পাপিষ্ঠদিবসাঃ পৃথিবী গতযৌবনা।।
—মহাভারত, আদিকাণ্ড]

বেশ করেছি ভেঙেছি, মাইন ফ্যুয়েরর আডবানি বলেছেন ওটা আগে মন্দিরই ছিল। আর, যদি নাও থাকে, তব্ ভি বেশ করেছি, মা-কসম আবার ভাঙব, জ্ঞান দেওয়ার তুমি কে হে মাল, তুমি আমায় খেতে দাও? খোলা বাজারে চালের কিলো কত জানো? জানো, ইঁট আঠারশো টাকা হাজার? এমনকি শঙ্কর মাছও বাইশ টাকা কিলো? এক লিটার কেরোসিন খুঁজতে হাঁটু খুলে যায় আমার বাপের...আরে হ্যাঁ, বাপও একদিন মাস্টারই ছিল, তুমি শালা পেনশন দিয়েছো?

ফুটানি ছাড়ো ওস্তাদ, তেত্রিশ বছর কাটল, লাইফের হর অন্ধিগলি আমি চিনে নিয়েছি। মতিচ্ছন্ন ভবিতব্য? তার জন্য তুমিই তো দায়ী। এই আমার কপালের মধ্য থেকে তলপেট বরাবর লম্বালম্বি রক্তের দাগ...তার উপর কাঁটাতার...তার উপর বি-এস-এফ ক্যাম্প্...তার উপর টহল, তার উপর রাহাজানি, তার উপর নিরন্ন মানুষের ঝাঁক—এসব তো তোমারই জন্য। তোমার জন্যই তো এত গুণ্ডাগর্দি, আমার এই সড়কছাপ দিন। আজ শালা পীরিত মারিয়ে বলছ, 'একই বৃন্তে দুটি কুসুম....'! আবে ফোট্, কুসুম আবার কী? অর্ধেন্দু মুস্তাফীর টাইমে কুসুম নামে একটা মেয়ে ছিল হাড়কাটায়, তারপর থেকে কোনো কুসুমটুসুম আর নেই...জিন্দ্‌গি বে-কুসুম, বে-রহম্...

বহোৎ ক্ষতি তুমি আমার করে দিয়েছ, গুরু। আমারও ছিল একসময় টল্‌টলে চোখ। সেই বেড়ে ওঠা চোখের মধ্যে তুমি ঢুকিয়ে দিয়েছ বিষ...নিজের ঘর...টু-ইন-ওয়ান...এলিট সিনেমা...ইংরেজি স্কুল...লাল ইয়ামাহা...ইয়ামাহার পিছনে ডলি...ডলির উড়তে থাকা চুল...আর, যখন বে-সাহারা আমি ডুবে যাচ্ছি সেই স্বপ্নে, যখন কলাবাগান থেকে মা-বাপ ছেড়ে ডলি পালিয়ে এসেছে আমাকে—কেবলমাত্র আমাকেই বিয়ে করবে বলে—তখন তুমি আলগোছে আমার চুলে দিয়েছ জট, ছিঁড়ে

দিয়েছ জামা, খুলে দিয়েছ শুকতলা, বার করে দিয়েছ পাঁজর। ঠায় চার ঘণ্টা ডলি দাঁড়িয়েছিল রেজিস্ট্রি অফিসের সামনে। আমি আসিনি। না, ও মুসলিম বলে নয়। তখন আমার আয় কী? কী খাওয়াব? নিজের ঘর...টু-ইন-ওয়ান...লাল ইয়ামাহা...আমার যে চাকরি নেই, ব্যবসার পুঁজি নেই, এক লিটার কেরোসিনের জন্য হাঁটু খুলে যাচ্ছে বাবার...তখন, তখন কোথায় ছিলে শালা তুমি? কোথায় ছিল তোমার সম্-পীরিতের কাননে কুসুমকলি?

বেশ করেছি ভেঙেছি, হিন্দুর দেশ হলে মন্ত্রী হব আমি। বেশ করেছি। কিন্তু তুমি করতে পারোনি। পাঁচ ঘণ্টা ধরে ভেঙেছি, আর তুমি লা-পতা চুহার মত গর্তে সেঁদিয়ে থেকেছ পাক্কা ন'ঘণ্টা। কিন্তু ছিঁড়তে পারোনি, একটা চুলও না। আর তুমি পারবেও না। যাও, ফোটো, নিজের জ্ঞান নিজের পেটেই রাখো...আঃ, আমি জানি এসব কোনো পথ না, কোনো ফয়দা নেই এতে, জানি এইভাবে সবকিছু ভাঙতে ভাঙতে একদিন ফুলে ফেটে চুরমার হয়ে যাব নিজেই, এ খেলার এটাই নিয়ম—আমি জানি, কিন্তু আর কী করতে বলো? আমার তো কিছুই নেই, অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ কিচ্ছু নেই, একটা কিছু তো করতে হবে আমায়। ভাঙনের রুদ্ধশ্বাস নিরাশ্রয় পথে একদিন তুমিই আমায় ঠেলে দিয়েছ। অন্ধের মত আমি ছুটে গেছি অধিবাস্তবতার সেই সুড়ঙ্গপথে, যেখানে মোড়ে-মোড়ে-ফুটন্ত জলের ফোয়ারা, উড়তে থাকা বিশ্বাসের ছাই। সেইখানে একের পর এক ছায়ামূর্তি আমার কানে গুনগুন করে গেয়ে গেছে প্রতিহিংসার দোহা। শিখিয়েছে, খিদের জ্বালায় মরিয়া যে মানুষ জয়ন্তীবাজার থেকে ঢুকে পড়ছে বেনাপোলে সে আমার মূল শত্রু। তার টুঁটি এক্ষুণি ছিঁড়ে না দিলে আমারই একবেলার ভাতে পড়বে টান। ক্ষুধার্তের বিচারের ক্ষমতা থাকে না। তাই বাঁ হাতে তার নলি মুঠো করে যখন আমি ডান হাত তুলেছি শূন্যে, গর্জন করে বলতে গেছি : 'হাইল আডবানি...' তখন তুমি এসে আমায় থামতে বলছ! কিন্তু, এখন আমার দাঁত ধারাল, আঙুলগুলো থাবা, ধমনীর মধ্যে ছুটছে উষ্ণস্রোতা মদ। আজ কি থামতে বললেই থামা যায়?

বলো, থামা যায়?

শব্দসন্ধান

...নাচিতেছো টারানটেলা—রহস্যের;

১.
সীমাহীন কলরব ক্ষেত্রগুলি তুমি,
তুমি চুপ, তুমি ঢেউ, তুমিই হে অগতির গতি;
যদি শ্লিষ্ট করি, যদি নিরবধি নিয়মসমূহ
যান্ত্রিকতা না ভাবি কখনো, তুমি
ছিলে আলো, হলে অন্ধকার।

২.
তুমি কৌম; ঋদ্ধতমা, তুমি হে বিবশা,
যদিও রন্ধ্রপথে আশঙ্কার দিনগুলি আজ
মুহ্যমান, কেউ যাকে হিমায়ন বলে,
কেউ বলে বক্ররেখ, যে পথে সুজাতা
অন্নবাহিতা রোজ, এতাবৎ দেখা যায় তাকে।
মূঢ়মতি প্রশ্ন করে—সেসব কি র‍্যাশনের চাল?
নাকি বোধি নিরাকার? মেধার বিকল্প চাষ এইভাবে বাড়ে।

৩.
পরাগবর্ণের এক পাতিহাঁস আজ পুকুরে যায়নি,
কী তার বিক্ষোভ আমি কিছুই জানি না।
জানি না শহর-গ্রাম, জমিজিরেতের দোহা,
শিবাইচণ্ডীর পথে বাসিফুল পুষ্প হয়ে আছে।
তুমি বর্ধমান, তুমি ক্রমবিকাশের ছবি, তুমি সংগোপন,
কেন গো তৃষ্ণা পায়, মধ্যরাতে বাতাসের জালে
সভ্য সমাজের কেন নাকানিচোবানি, আমি
কিছুই জানি না তার। শুধু মূলাধার দুর্ভিক্ষপীড়িত,
স্নায়ু সব রবহীন, ঘুম নামে প্রপাতের মতো।

৪.
মৃত ঘুঙুরের শব্দ; আশরফির হিরণ্যহল্‌কা।
মেঝের পালিশে ছায়া, তেলতেলে, ইতস্তত ঘোরে,
জানে যাদু, রোমাঞ্চের চৌষট্টি রকমফের জানে,

প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ব্যাখ্যাও করে তার, দ্যাখো,
এদিকে মাথার পাত্রে প্রথম বৃষ্টির মতো মদ,
অসাড় চোয়াল আর মাংসের অনেক গভীরে
যে-সময়ে ঢুকে যায় নখ—কষ্ট, খুব কষ্ট হয় ভেবে
কোথায় চলেছে পথ? কোন্‌দিকে? সঙ্গে আছে কেউ?
সঙ্গে নিয়তিপিসি, খিটখিটে বিবাহের সম্ভাবনাহীন।

৫.
সকল রাতের চিহ্ন তোমার বেদীর দিকে ধায়,
ধায় যেন, মন, সকল ভালোবাসা।
দূর থেকে যাকে বেদী বলে পূজা করি,
কাছে গেলে দেখতে পাই সেও এক চলন্ত পাদপ,
শিকড়-বাকল আর পাতা-পুষ্প শাখা ও প্রশাখা
কখনো বা ভিন্ন সুর, কখনো বা রুগ্ন সিবাস্টিয়ান।
এইভাবে আমাদের ছুটে চলা এ-ওকে ছাড়িয়ে,
আমার জন্মদিন এইভাবে প্রতিদিন জন্ম নিতে থাকে।

৬.
অকপট নিসর্গপ্রতিভা, দেখো, বাতাস স্নিগ্ধ হলে এতটুকু
কতটা কোমল রেখাগুলি! দেখো, তৎপুরুষের ক্রোধ
আলোক চুঁইয়ে নামা পারাবিকিরণ। অরণ্যবিবরে পোঁতা
আমাদের সাধসংকলন তাৎপর্য পেতে চলে এসময়ে
আরো একবার। পূতজল, হাসান-হোসেনের জন্য
সেইসব আদি অশ্রুগুলি এখনো অটুট? যেন থাকে।
যেন থাকে যাবতীয় রিবংসা ও কূটনীকুঁজের নীচে
আকরিক পূষণপ্রচার। তারপর, স্তব্ধতা, সকল শব্দের চেয়ে বাঙ্ময়;
অবিকল্প শূন্যমেঘে তারপর অযোজন বিহগসাঁতার।

৭.
নির্বিবাদে পক্ষ নাও, অনায়াসে নিরপেক্ষ থাকো;
ইতিহাসসিদ্ধ নাকি তোমার নাসিকা, অহরহ
যা তুমি গলিয়ে দাও যে কোনো বেদনামধ্যে,
অথবা এমনও হয়, দীর্ঘদিন দেখাই মেলে না।
আদার মার্চেন্ট আমি, চুপি চুপি লক্ষ্য করি
মরুদুর্গ ক্ষয়ে যায় আঁধির প্রকোপে, ঝরে পড়ে বালি,

শোভন নগরী সব হয়ে ওঠে গা-ছমছমে আর
প্রবীণ প্রাণীরা হয় অশোধিত তেল। এইভাবে
চলা না-চলার মধ্যে নাচে কতো উলঙ্গ ময়ুর।

৮.

জ্বলন্ত পিলসুজ থেকে নেমে আসে ঘিয়ের নীরব স্রোত।
টিট্টিভ, তুমি কি জানো অন্য সব স্নেহের মতোই
এও নিম্নগামী? এবং, তা ততদূরই, যতদূর গেলে
মানুষমোহানা ছেড়ে দিকচিহ্নহীন এক বিস্তারিত
নোনাজলে পৌঁছানো যায়। টিট্টিভ, তুমি জানো
নীল কোনো অবশ্যশর্ত নয় সমুদ্রবিষয়ে;
তুমি জানো, নিমজ্জনও নয়। আমি শুধু
জয়স্টিকে হাত রেখে বিমান নামিয়ে আনি
লাফিয়ে উঠছে দেখি ডলফিন। তুমি জানো,
মানুষ বশ্যতা পায়, নিছক বন্ধুতা তার কখনো জোটে না।

৯.

কাকে যে জেতাও, গুরু কাকে যে হারাও
বোঝা বড় দায় দেখি, ভাবি চেষ্টা ছেড়ে দেব কিনা।
রচনা প্রয়াত হয়, বেঁচে থাকে চিহ্ন-দাঁড়ি-কমা,
বানরে সঙ্গীত গায়—এসব তো পুরনো উপমা,
রৌদ্রে উত্তাপ থাকে, উত্তাপেও থাকে দেখি রোদ,
এ কেমন লীলা গুরু, বোধিচিত্তে বাজাও সরোদ!
কাকে যে ডোবাও আর কাকে যে ভাসাও,
ভেবে মনে ত্রাস জাগে, অনায়াসে হেঁটোতে কাঁটাও;
তারপরে দিন কালো, তওবা-তওবা, দেখি অন্ধকার শাদা,
কাদায় পদ্ম ফোটে, পঙ্কজেও ফুটে আছে কাদা।

১০.

ধর্মবক : ইশারাগ্রাহক, বলো, সন্ধ্যা কী?
উত্তর : দিন ও রাতের রসায়ন।

ধর্মবক : কাকে বলে প্রেম?
উত্তর : দূর থেকে যাকে
ভালোবাসা বলে ভুল হয়।

ধর্মবক : অনিচ্ছাসত্ত্বেও কারা পাপ করে?
উত্তর : বিপন্নরা।

ধর্মবক : ধূর্ত ও প্রাজ্ঞগণ পাশাপাশি বসে
কোনখানে পাঠ নেন?
উত্তর : হাওয়ামোরগের টোলে।

ধর্মবক : কোন্‌খানে শুরু আর কোথায় বা শেষ?
উত্তর : সবখানে।

ধর্মবক : তবে বলো, এই যে শায়িত চার মানুষশরীর
এরা কারা?
উত্তর : উপাদান, মেকানো সেটের।

ধর্মবক : কে সেই খেলুড়ে শিশু?
উত্তর : এক অণু কাল আর দুই অণু ক্রিয়ার ধাক্কায়
জন্ম হয় যার—সেই বৃদ্ধ, ইতিহাস।

ধর্মবক : বটে, সেক্ষেত্রে বোকা কে?
উত্তর : আমি।

ধর্মবক : বোধিসত্ত্ব, কার প্রাণ প্রার্থনা করো?
উত্তর : চাওয়া বা না-চাওয়ার কিছু নেই,
চারজনই আসলে জীবিত।

অপাঙ্‌ক্তেয় : এক

তুমি তো দেখনি, আমি স্বচক্ষে দেখেছি চারুমুখী—
চাঁদের মাটিতে চরে কবি-কবি দেখতে সব গরু;
কী করে দেখবে বলো, বেলুড় যাওয়ার পথে মাঝগঙ্গায়
আমি যে দেখেছি আরো তোমার কোমর কিবা কামসূত্রী সরু,
সত্যিই সুতোর মত, আরো যা দেখেছি—আহা, ঢং—আর গায়
ঘামের সহিত কিছু ময়লাও ছিল সখী, এসব দেখতে লাগে চোখ,
কী করে বুঝবে বলো, শুধুমাত্র ফেমিন নির্মোক

খসাতে ছিলে গো ব্যস্ত দ্বিপ্রহরে আমার বাড়িতে;
চাঁদে যে মানুষও থাকে সেসব কি শেখায় পারি-তে?
কিছুই হচ্ছেনা, ওরা ভুলে গেছে শিল্প রূপটান,
কেবল আপিস যায়, এদেশে বেড়াতে আসে, কম্যুনিস্ট দেখলে পিঠটান
দিয়ে থাকে, এ বাবদে আছে বেশ সচেতন বোম্বাচাক সুখী।

চাঁদের মানুষ শুধু থুতু ছোঁড়ে, সেই দেখে তনুমনকায়
উড়ন্ত ডানার শব্দে আমার গবলেট ভেঙে যায়।

অপাঙ্‌ক্তেয় : দুই

তোমার দিকেই যত গীতলকীর্তন, আহা, চরাচরে তার
কুলটা উত্থান, জেনো মহাজনী ট্যাঁকের আঁধারে
কৃকলাশ বর্জাইস, মিডিওপাইকার যত অলৌকিক লাফ
সেও তো তোমারই জন্য, সেহেতু এবার
টলমলে বইমেলা আমার জম্পেশ একা-একা;
'যে জীবন ফড়িঙের, দোয়েলের, মানুষের সাথে' তার হয়নাকো দেখা
এই জেনে।' এই জেনে? দাশবাবুটির খুরে দণ্ডবৎ হতে ইচ্ছে হয়,
অই হে নির্বোধ, শোনো, অধ্যাপক এতদিন বনে ও বাদাড়ে
চরে যা শিখেছে তুমি কিছুই বোঝেনি তার বলে দিচ্ছি সাফ্,
মশাদের সংঘারাম মানুষের থেকে কিছু ভিন্নতর নয়।

নিজেকে কাপ্তেন ভেবে হাঁটুজলে এরকম নৌকো বায় কে-কে?
তাদের তামাশা আর শেষাবধি প্যান্টুলুন খুলে যাওয়া দেখে—
'আমি তো গণ্ডুষে নাচি, এ যে বাপু তাহারও অধিক',
এই বলে সফরীও, বিসমিল্লা, হাসে ফিকফিক।

অপাঙ্‌ক্তেয় : তিন

অর্ধেক সোনার ছিল; তথাপি সে দিশি-দিশি ত্রিকালভুবন
খুঁজে ফিরেছিল যদি অপরাঙ্গ ছুঁয়ে যায় হেম,
অর্থাৎ মানুষ আর আছে, নাকি শুধুমাত্র শাদা সে ভবন
এবং ওয়াল-পথ নিশ্চিহ্ন করেছে সব সম্ভাবনা, ক্ষেম।
আজ তাকে পথের উপরে দেখি, পড়ে আছে, রক্ত চাপ-চাপ,
আমাদের কোন কান্না যথাযথ নয় আর, সেহেতু সন্তাপ
সুচারু ভণিতা লাগে, যেরকম বীমার দালালি;
সুষুম্নাও নিম্নগতি, সহস্রকমলে লেগে কালি
পরাগকেশরগুলি কুঁচকে গেছে, ঝরে গেছে দল,
আত্ম নাকি শক্তি নয়! সত্যি নয়? নিজেকে দুর্বল
মনে হয় এরপর, তবে কি বন্ধুদল স্বপ্নঘোরে আছে?
তাহলে তর্পনহীন এসব করোটি জেনো ততদিন ঊর্দ্ধমূল গাছে,
যতদিন সন্ততিরা প্রতিজ্ঞা অর্জন করে না ভাঙে সে অনৃত-দেউল..

ততদিন রক্তমাখা, ততদিন পথপাশে, আধা ধর্ম—অর্ধেক নেউল।

অপাঙ্‌ক্তেয় : চার

সে-ই আজ ভয়ের ওপারে! আমরা যারা স্মৃতিজর্জর,
পৃথিবী প্রবীণ হয় আমাদেরই নিস্তরঙ্গ চোখের উপর।
সে তো শুধু শুয়ে থাকে, প্রবীণতা মানে বোঝে—লোল,
বিবেক বা চামড়া হোক, সবেতেই লক্ষ্মীর আসল
কটাক্ষ বর্ষিত হয়, যশঃপ্রার্থী গর্তে পড়ে পা;
তথাপি অচিন্ত্যনীয় দৌড়বার চেষ্টা, অথবা
নিজের মাথার লম্বে ছুঁড়ে দেওয়া দলা-দলা থুতু,
যে থুতুতে বিষ কম, অধিক আহ্বান, যাতে মাংস হাতে--'তু...তু...'
ডাক দিলে ছোটা যায়। প্রতিষ্ঠা...প্রতিষ্ঠা, বোন, অনিবারণীয়!
কী হবে রে তোর খেদে, হ্যালোজেন আলো দেবে কি ও?

সেই শুধু শুয়ে থাকে। দেখে, তার দাদাও অধুনা
লেংচে-লেংচে ছোটে, ইতিউতি তাকায় শুধু না,
পারলেই অন্যকে টেনে ধরে, এইভাবে যদি একটিও
প্রতিযোগী পড়ে যায়, তবে তো কামাল কিয়া, জিও দাদা জিও....

অপাঙ্‌ক্তেয় : পাঁচ

অসমপার্বিক লেখা, ছত্রখান, আর অনুপ্রাস
আরো বেশি মুক্তকচ্ছ, হে ভামিনী, একটা টেলিফোন
অন্তত করলে পরে কিছুটা শৃঙ্খলা আনা যেত,
এ ব্যতীত নিজেদের যুক্তিবাদী ভাবি যদি তবে
ছলনা-ভদ্রতা কিংবা মিঠি-মিঠি বোল—এইসবে
প্রয়োজন ছিল কি বিশেষ, ভেবে দেখো, এ তো
তোমার উচিত নয়। না হয় আমার গেছে অতীত জীবন
অজানা সঙ্কেত থেকে বিজাতীয় কোড পাঠোদ্ধারে,
ভবিষ্যেও ভরসা নেই, উৎসে যদি ভুল থাকে কারো
তার লয় কে ঠেকাবে, বুঢ়বক নিশ্চিত আবারো
সেই ভুল করে যাবে; তা বলে কি তাকে
এমন সান্ত্বনা দেওয়া সমীচিন যাতে ফের আশার বিপাকে
লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়? আমি তো হয়েছি, দেখো, তাই বারে-বারে
যে ধানে তক্তা হয়, জেনে শুনে করি তার নির্বিচার চাষ।

সত্যজিৎ রায়

গুপিদাদা, তুমি কেন
গাধার উপরে চেপে
সব ছেড়ে যেতে-যেতে
ছড়া কাটছিলে একা—
আর, কেন সংসারে
কি গ্রামে কি দরবারে

কোথাও তোমার ঘর
থাকতনা বেশিদিন—
কেন বাঘাদাকে দেখে
কোথাও তোমার মনে
গোপন উ-হুঁ-হুঁ ছিল—
সেইসব আমি আজ
জেনে গেছি, গুপিদাদা,
তুমি যাও, আমি আছি
এই পথে—একই পথে...।

হে প্রাণ, সমষ্টিপ্রাণ...

জাতক

ভেজা শ্যাওলায় পা ডুবিয়ে চলতে-চলতে আমার মনে পড়েছিল সব.
মনে পড়েছিল সহসা, কিংবা তাকে আচমকা-ই বলি,
এ সেই কবেকার কথা, মনে পড়েছিল, যেদিন আকাশ জুড়ে পেখম মেলেছিল ময়ূর,
আর তার নীচ দিয়ে অনেক পথ চলার পর অবশেষে
ঘাসগাছের গোড়ায় ঠেস দিয়ে আমি জিরিয়ে নিচ্ছিলাম খানিক,
শুঁড় তুলে গন্ধ নিচ্ছিলাম ইতিউতি, এমন সময়,
ঘাসপাতার ডগায় আমার চোখে পড়েছিল ছটফটে একবিন্দু আগুন :
লহমায় নীল থেকে হলুদ আর হলুদ থেকে নীল হয়ে যাওয়া আগুনের
ঠিক একটা ফোঁটা, আর..হায়রে, বোকার মতো ভেবেছিলাম
ওটা বুঝি একবিন্দু মধু, তাই সংশয় নিরসনের জন্য
ঘাসের ডাল বেয়ে যে-মুহূর্তে উঠতে যাব ভাবছি...

আচমকাই মনে পড়ল সব। যে সব গতজন্মের কথা—
যখন আমি ছিলাম সাগরফেরত এক বাত্যাতাড়িত চিল,
হাওয়ার ধাক্কা ও জলের ছাঁট যাকে ফিরিয়ে দিয়েছিল গর্তে, আর
হার্লেমের সেই নিরুপায় অন্ধকারে ডানা ঝাপটাতে-ঝাপটাতে যে
ককিয়ে উঠছিল ক্রমাগত—
যার ফুসফুস আর টানতে পারছিল না বাতাস,
যার চোখ আর সইতে পারছিল না আলো.

পাথরের গায়ে ঠোক্কর মারতে-মারতে যার ঠোঁট গেছিল ভেঙে—
হ্যাঁ, আমিই ছিলাম সেই ঝঞ্ঝাতাড়িত দিশি চিল,
মরে যাওয়ার অন্তত আধঘণ্টা পর—শববাহকের স্তব্ধতায়—
যার পালকের উপরে উঠে এসেছিল পিঁপড়েরা,
কুরে-কুরে নিয়ে যাচ্ছিল তার মাংস কিন্তু
লড়াই জারি ছিল তখনো, তাই সেইসব মাংসকণার মধ্য দিয়েই
তার প্রাণ প্রবাহিত হচ্ছিল পিঁপড়েদের মধ্যে, তারপর
এক অন্ধকার থেকে অন্য এক অন্ধকারে সে ফুটে উঠেছিল
পরিশ্রমী কালো এক পিঁপড়ে-মায়ের পেটে।
একদিন যথাসময়ে
(ঢিবির গর্ত না জানলার কোণে তা আমাকে বলেনি মা)
ডিমের দেয়াল ভেঙে জন্ম হয়েছিল সেই নিগারের,
এইমাত্র যে জানতে পারল আসলে সে অভিশপ্ত
সহস্রাব্দ জুড়ে
পূর্বজন্মের কথা আসলে সে কিছুই ভোলেনি।
আমি সেই জাতিস্মর পিঁপড়ে
বিগত জন্ম যার কেটেছিল বার-বার ঐ আকাশ ফুঁড়ে উঠতে চেয়ে, আর
বারংবার ধাক্কায় খেয়ে ফিরে এসে;
যে চিলদের মধ্যেও ছিল দলছুট, যেহেতু শুধুমাত্র
ঘরফিরতি মাছের নৌকোয় ছোঁ মেরে ধান্দার দিনগুজরান পছন্দ হয়নি তার,
যেহেতু এই না-পসন্দ্ জীবনযাপনের যাবতীয় ধাষ্টামোর যোজন-যোজন দূরে
সে দেখেছিল অসম্ভব আশা—
মাথায় আকাশের উপর্যুপরি ধাক্কায় যার গুলিয়ে গেছিল, সংখ্যাক্রম,
চেতন আর অচেতনে ভেদাভেদ শেষাবধি স্মরণ ছিল না যার;
বন্দুক গলির ভাঁটিখানার চালে যখন পা টিপে-টিপে নামত সন্ধ্যা, আর
অন্দরে জ্বলে উঠত জরাগ্রস্ত আলোর শ্লেষ্মা,
যে সময়ে শুরু হত মাতালদের সমবেত সান্ধ্যোপাসনা—তখন
ডানার মেশিনশব্দে গুঁড়ি মেনে নেমে আসত সেও,
টেবিল থেকে টেবিলে ভিজিয়ে নিত ঠোঁট,
চাট বলতে যার ছিল অন্য পাখিদের ভ্রূণ,
হিজড়াদের ভেজা ঠোঁটে যে খুঁজে পেয়েছিল যৌনতা; আমি—
আমিই সেই হতভাগ্য যে ভুলে গেছিল আকাশের গা বেয়ে উঠতে হলে
দিগন্ত থেকে শুরু করতে হয়, একমাত্র সেখানেই
আকাশ স্পর্শ করে থাকে মাটির অলক ও অহংকার, আর
দিগন্তে পৌঁছানোর জন্য দীর্ঘ-দীর্ঘদিন চলতে হয় মাটির উপরে পা রেখে—

রোদে পুড়ে জলে ভিজে এই যে মন্থর যাত্রা—এর বিকল্প নেই কোনো,
শর্টকাট নেই, গ্যালপ নেই; জন্তুর থাবার ফাঁক দিয়ে
পাখির ঠোঁটের ধার দিয়ে, মানুষের শয়তানির ঘাট ঘুরে
তবেই চলতে হয় তাকে, এড়ানো যায় না কিছু, কিচ্ছু এড়ানো যায় না,
তাই এ-জন্মে আমায় পিঁপড়ে হতে হল, যাতে
ফের গোড়া থেকে শুরু করতে পারি,
অথচ জাতিস্মর—যাতে অভিশাপ জারি থাকে পূর্ণমাত্রায়—
সেহেতু জাতিস্মর—যাতে পিঁপড়েদের মধ্যেও আমি থেকে যাই দলছুট,
যাতে আকাশের ওপারে যে অন্ধকার তা আমাকে টেনে নিয়ে চলে,
ইতিমধ্যে কড়ায় গণ্ডায় মাটি শোধ নেয় ঋণ, এইভাবে
দিগন্তের জোড়ে পৌঁছানোর আগেই যেন আমি হতে পারি
অঋণী ও অপ্রবাসী,
তারপর
মরবার জন্য যেন পাখা ওঠে ফের একবার।

৩.

তখন আমার মাথায় টলমল করে দুলে উঠছিল মদ, আর পাক খাচ্ছিল
জোয়ারের ফাঁদে পড়া মাঝিহীন শালতির মতো,
তখন আমার চোখ থেকে ফোঁটা-ফোঁটা ঝরে পড়ছিল মদ, আর
ক্ষমা চাইছিল সেইসব মেয়েদের কাছে
যাদের বুকে হাত ডুবিয়ে আমি অনায়াসে তুলে এনেছি হৃদয়...
ঠিক এ-ই ভাবে মুঠো করে দেখেছি কীভাবে দমবন্ধ হয়ে
ছটফট করতে-করতে নেতিয়ে পড়ে তারা : সেইসব
ফর্সা ও কৃষ্ণ হৃদয়গুলি,
মৃত্যুর পরেও শুধু আমারই জন্য যাদের পুরন্ত ঠোঁটে লেগে থাকে রক্তোচ্ছ্বাস,
আর, সেই মেয়েদের জন্যও আমার শিরা ও ধমনী দিয়ে ঝরে যাচ্ছিল মদ,
আমার পাঁজরের ফাঁকে হাত গলিয়ে বার-বার যারা খুলে এনেছে হৃৎপিণ্ড,
তা থেকে কাঁটা বাছবার ব্রত নিয়েছে যারা,
শেষমেশ সখীর দিকে চেয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে বলেছে,
"বাব্বাঃ! অ্যাতো কাঁটা বাছা যায় বল?"—তারপর যেন
অনবধানেই তাদের হাত থেকে খসে পড়েছে সেই রক্তমাংসের বল
একা-একাই ড্রপ খেয়েছে লাব্-ডুব শব্দ করে করে,
যথাস্থানে কেউ তাকে ফিরিয়ে দেয়নি।
ফলে বাধ্যতামূলকভাবেই আমায় গজিয়ে তুলতে হয়েছে
একটার পর একটা হৃৎপিণ্ড—

ফের কেউ নিয়ে গেলে যাতে রক্তচলাচল বন্ধ না হয় আমার, আর
এইভাবেই—এইভাবেই এই উচ্চাবচ লাইফ ট্র্যাজেডির দিকে চেয়ে
আমার প্রাণের মধ্যে ঝিকমিক করে হেসে উঠছিল মদ, তারপর
হাঁটু ভেঙে বসে পড়ছিল এই নিশ্ছিদ্র মহাবিশ্বের
অন্ধকার আকর্ষণের সামনে।

ও মেয়েরা, দ্বিবিধ মেয়েরা, শোনো,
আমি সব ভুলে গেছি, তোমরাও পারলে ভুলে যেও,
না হয় আমাদের কোনো শুভদৃষ্টি হবে না কখনো,
না হয় আমাদের মধ্যে, এমনকী, মীমাংসাও হবে না কোনোদিন,
তোমাদের পথে তবু আর আমি চৌকাঠ হব না।
ও মেয়েরা, হেঁটে যাও, আগামী গোধূলিগুলি
তোমাদের আরো বেশি সম্পন্ন হোক,
দায়িত্বশীল যারা, পেশায় সক্ষম কিংবা যাদের বংশে আছে
একাধিক বিলেতপ্রবাসী—আমার মতন যারা পাষাণ লম্পট নয়—
তোমাদের খুঁজে পাক সেইসব অনুভবী ছেলেদের দল।
ভালোবেসে তোমাদের ভরিয়ে রাখুক সেই উজলা ছেলেরা,
তাদের দুঃখেও তোমরা পাশে থেকো, ও মেয়েরা,
নিতান্ত করুণাবশে তাদের অহং রেখো তৃপ্ত, সফল। শুধু
কোনদিন-নিয়তির মতো কোনো নিঃসহায় অনিবার্য রাতে
যদি তোমাদের পুরুষেরা তোমাদের আগে নিদ্রা যায়
স্থির চোখে ঘুরন্ত ফ্যানের দিকে চেয়ে থেকে যদি মনে হয়
বিড়ালকে একমুঠি অন্ন দেওয়া অবিপ্লবী কাজ নয় কিছু,
কুকুরকে ঢিল মেরে, যাই হোক, বীরত্ব হয় না;
যদি একবারও মনে হয়—
আমাদের প্রতি গ্রাসে মিশে আছে হত্যার অভ্যস্ত পাপ—
যদি অকারণে গলা ব্যথা করে,
তবে হে জননীজাত, গৃহিণী-সচিব-সখী,
কিংবা আমার এই পুরুষতান্ত্রিকতা মার্জনা করে—
রাত্রির মহাব্যোমে দীর্ঘকায়া এলোকেশি হে নারীটোটেম,
আমার জন্যও একটু প্রার্থনা কোরো।

আমিও তো প্রাণী, বলো, অপদার্থ ছিলাম—আছিও;
তবু তো আমারও নাক টিপে ধরলে চোখ অন্ধকার,
তবু তো আমারও খিদে, কামড়ে দিলে আমারও যন্ত্রণা,

আমার বয়স হয়, অধিকন্তু প্রব্রজ্যার দিকে
আমারও সময় হয় এগোবার, ও মেয়েরা,
অন্তত একবার প্রার্থনা কোরো—যেন আমি যেতে পারি,
একটিই জন্মে আমার এতগুলি জন্মপ্রবাহ যেন বিফলে না যায়,
যেন এই পরিশ্রমী পিঁপড়েজন্মে ফাঁকিবাজ বলে আমি
আর না চিহ্নিত হই, নিজের পায়েই যেন অতিক্রম করতে পারি
সেইসব উষ্ণবালিপথ,
অন্তত একটিও মুমূর্ষুকে দিতে পারি জল বা দর্শন,
যেন আমি ছুঁতে পারি নিজের আঙুল দিয়ে এই বিশ্ব,
গণিতসূত্রগুলি, রূপ ও অরূপ...

৪

হে প্রাণ, সমষ্টিপ্রাণ, মজা নদীখাতে
অলক্ষ্যে বাহিত হতে থাকা হে প্রাণপ্রবাহ,
ছিন্ন ও যুগপৎ অভিন্ন যে তুমি যে তুমি স্থিতি ও গতিশীল,
যে তুমি আজরাইল, অন্ধকার মুখ দিয়ে আত্মকেই আত্মসাৎ করো,
যে তুমি নিঃসীম হাঁ-এ প্রকাশিত করো বিশ্বরূপ
যে তুমি কণা ও ঢেউ,
যে তুমি দীপ্যমান হটে আসা রক্তপতাকায়,
তুমি শোনো, চারটি পাখির জন্য আমার জীবন এত লক্ষ্মীছাড়া, স্বজননিন্দিত
সুপর্ণা নয় এই বিহগেরা—এই কাক, ময়ুর কুঁকড়ো আর ন্যাকা পারাবত—
যাদের মুণ্ডু ছিঁড়ে পাহাড়ে নিক্ষেপ করা আমার কর্তব্য ছিল শৈশবকালেই,
এদেরই বিবাদে আমি তিরিশ বছর ধরে কেন্দ্রছুট, উন্মার্গগামী।
রোজ তারা ঝগড়া করে, একজন দানা খেলে অন্যজন আঁচড়ে দেয় পাখা,
এদের উশকানিতে আমি নষ্ট হয়ে যাচ্ছি প্রতিদিন।
হে প্রাণ, সমষ্টিপ্রাণ,
যে তুমি উদ্ভিদ, মাছ, এন.জি.সি. ৬২৪০,
যে তুমি বসতি করো পৌর্ণমাসী চাঁদের আলোয় আর
চাঁদ ডুবে গেলে পর অদ্ভুত আঁধারে—তুমি শোনো,
এই চার গোয়েবেল্‌স্‌ ভালোবাসতে বাধা দেয়,
প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে কানে-কানে ফিসফিস করে,
"রাজা হবে? রাজা হবে?"
কেন আমি রাজা হব ? রাজা হলে অতিরিক্ত কী পুচ্ছ গজাবে?—
এসব সওয়ালে তারা কর্ণপাত করে না কখনো,
সন্দেহ ছড়ায় তারা, ভালোবাসতে বাধা দেয়—

হে প্রাণ, সমষ্টিপ্রাণ,
যে প্রাণ নারী ও নরের চোখে আশ্রয় অববাহিকাময়,
যে প্রাণ শহিদের চোখে ঊর্দ্ধগামী, অজর, অক্ষর—
ভালোবাসা ছাড়া আর কীভাবে বলো তো আমি বার হব নিজের বাইরে?
কীভাবে যোগ্য হব হঠে আসা পতাকাকে পুনর্বার এগিয়ে নেওয়ার?
বিশ্বাস আমাব চোখে আজ এক হাস্যকর বোধ,
নিজের ফুর্তি ছাড়া আর আমি কিছুই ভাবি না,
কেবল সন্দেহ করি, গুজবের স্বাদ নিতে পরাঙ্মুখ নই,
তথ্যহামলার আমি এইভাবে প্রতিদিন নধর শিকার—
আমাকে উদ্ধার করো —হে প্রাণ, সমষ্টিপ্রাণ,
তুচ্ছতম জীবকোষে—ব্যাপ্ততম নীহারিকা দেশে
শূন্যতার ওপার যে
শূন্যতর   অর্থবহ   অতীব   শূন্যতা
যে শূন্য   চিরগতি   বৈজয়ন্ত,   আনন্দস্বরূপ
            সে তুমি প্রকাশ হও
আমাকে আঘাত করো
            ছিন্ন করো বন্ধ প্রতিবেশ—
আমাকে রক্ষা করো,   শেষ হয়ে যাচ্ছি আমি
নাস্তিক হয়ে যাচ্ছি প্রতিদিন...

আমাকে উদ্ধার করো...হে অদিতি... হিরণ্যগর্ভ কাল
            কালের অতীত...

আলো-কাসোয়া

১

সারারাত আকাশের পূব-পশ্চিম বরাবর পায়চারি করছিল চাঁদ, আর
যখন ঘুম ভাঙল, আয়নায় আমি দেখেছিলাম এক দাগী লম্পটের মুখ;
দেখেছিলাম, কচি আম খসে পড়লে বোঁটা থেকে ঝরে পড়ে
বিন্দু-বিন্দু জলের মত রক্ত, তারপর রাতে যখন হাওয়া ওঠে—
পূব-পশ্চিম বরাবর অস্থির পায়চারি শুরু করে চাঁদ—সে সময়ে
কুকুরের বিষণ্ণ চোখে ভেসে ওঠে অস্পষ্ট ধূসর প্রজন্মস্মৃতি...।
এ হচ্ছে সেইসব কথা যা এতদিন আমি চেপে রেখেছিলাম,
যেভাবে কুমারী মেয়েরা গোপন রাখে গর্ভ, আর
চুপিসাড়ে বমি করে, রোগা হয়ে যায়—কিন্তু আজ
এই বাধ্যতামূলক মার্কেট-ইকনমির যুগে, শোনো হে তোমরা,

যারা প্রতিবাদ করতে পারো না—
যারা যে-কোন ব্যবস্থাতেই মানিয়ে যাও অনায়াসে
যেভাবে জলের মধ্যে মাছ, কিংবা
মাছের মধ্যে অতল কালো জল,
যারা দালাল-ষ্ট্রিট তো দুরন্ত, এমনকি ঢেউ গোনার কাজ পেলেও
তা থেকে বানিয়ে নিতে পারো আড়াই কাঠা জমির উপর
সুশোভন কটেজ—যার মধ্যে অনর্থক বুক-র‍্যাক,
এথ্নিক সোফা ইত্যাদি দেখভাল করার জন্য
দক্ষিণ কলিকাতা নিবাসী দীর্ঘাঙ্গী-ফর্সা-স্লিম-স্নাতক
আধুনিকা ও গৃহকর্মনিপুণা...

যদিও সেই মেয়েটাকেও ভালোবাসত এক বোকাচন্দর।
ঠিক কেন যে বাসত তার কোন যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা
অনেক ভেবেও উদ্ধার করতে পারিনি আমি।
কেননা, এই তো স্পষ্ট তার দিনলিপিতে লেখা আছে :—

"কাল আমি তোমার হাত ধরিনি। তুমিই একবার চেপে ধরেছিলে আমার হাত। যখন আমি তোমার হাত ছুঁলাম, কুঁকড়ে গেলে তুমি। তুমি বড় স্বাধীন পাখি, ইতু। এ স্বাধীনতাও বড় মজার। খাঁচার ওম্ খেতে-খেতে বলে, "খাঁচাটা কী খারাপ!"

"আমি যুদ্ধ আব ভূমিকম্পকে ভয় পেতে শিখেছি। বিগত জন্মে কোন এক যুদ্ধে আমি মাবা গিছিলাম, আর কোন জন্মে ভূমিকম্পে আমার সব ধ্বংস হয়ে গেছিল। এসব খবর কেউ রাখে না। আমি আমার মনের মধ্যে উঁকি দিলে টের পাই। আমার কিন্তু মরতে ইচ্ছে করে না। অথচ, এই সময়ে, আমারই চারপাশের সব মানুষ একমনে মৃত্যুচিন্তা করছে। এবা আমাকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছে। আমার শীত করছে। শিব-শির করে।"

এরপর পঁচিশে ফেব্রুয়ারি মেয়েটি কথা দিয়েও তার সঙ্গে দেখা করে না। আটাশে ফেব্রুয়ারি সে মেয়েটির কলেজের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে অন্তত এক ঘণ্টা। দেখা হয়, কথা হয় না বিশেষ। দেখা হয়—তেসরা এপ্রিল, মেয়েটির সঙ্গে এক বান্ধবী। সেই রাতে ছেলেটির স্বপ্নে অনুপ্রবেশ করে—না, প্রথমে মেয়েটি নয়, বরং তার বান্ধবী...।

"রাত্তিরে ও এল চশমা পরে। খুব রোগা আর কালো দেখাচ্ছিল। ও আমাকে পার্ক-স্ট্রিট ধরে হাঁটিয়ে নিয়ে গেল। গান্ধী-মূর্তির ওখানে অনেক স্কুলের মেয়ে ট্রামে উঠেছিল। তাদের ভীড়ের দিকে চেয়ে ও খুব সুরেলা ও নিস্পৃহ গলায় ডাকল, 'তুলা...তুলা-অ...।' আমি বললাম, 'তুলা কে? ও বলল, 'কেন, আপনি জানেন না, ইতুর আসল নাম তুলা!' —এদিকে ইতু আমার দিকে না-তাকিয়ে বন্ধুকে হাত-মুখ নেড়ে কীসব বলছিল। 'পরে আসতে বলিস, আজ চলি রে, একদম সময় নেই'—এটুকুই আমার কানে ভেসে আসে।"

মোদ্দা কথাটা শুরু হয় অক্টোবরের সাত তারিখে, অর্থাৎ ঠিক ছ'মাস চারদিন পর। মেয়েটি তাকে চাপ দেয় আই-এ-এস পরীক্ষায় বসার জন্য। ছেলেটি জানায়, সে চাইছে গণিত নিয়ে গবেষণা করতে। মেয়েটি একটু ভাবে, তারপর বলে, সেক্ষেত্রে জি-আর-ই বা ঐ জাতীয়...। অল্প হেসে ছেলেটি বলে, অঙ্ক কষতে আমেরিকা যেতে হয় না। ফলে ঝগড়া হয়। দেখা হয় পনের তারিখ। ফের ঝগড়া হয়। পরে মিটে যায়। দেখা হয় তেইশ। মেয়েটি প্রস্তাব করে, ম্যাথ-এ বিশেষ স্কোপ নেই, ফলে বিয়ের পর যদি তার বাবার বিজনেসে... অথবা যদি একটা কমপিউটর সেন্টার...ওটায় তো এখন ওয়াইড প্রসপেক্ট...। এবং, ঝগড়া হয়। মেটে না।

ফলে দেখা হয় না আর। নভেম্বর দুইদিন এবং ডিসেম্বরে আরো চারদিন মেয়েটি কথা দিয়েও আসে না। টেলিফোনে জানতে পারা যায়—সে অসুস্থ, ফোন ধরতে পারছে না, অথবা—"এক্ষুণি বেরিয়ে গেল। না, কোথায় জানি না। কখন ফিরবে? বলতে পারছি না... আচ্ছা, রাখি কেমন..."। অবশেষে আটাশে জানুয়ারি, রাত ন'টার একটু পরে, মেয়েটির বাড়ির ডাকবাক্সে ছেলেটি একটি চিঠি ফেলে আসে। তাতে হাজারো আবেগের মধ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য ছিল এইটুকুই—সে মেয়েটির প্রস্তাবমত সবই করতে রাজি। জি-আর-ই-র প্রস্তুতি নিচ্ছে। এ চিঠির তিনদিন পর পয়লা ফেব্রুয়ারী, সন্ধ্যায়, বইমেলার মাঠে, ছেলেটি মেয়েটিকে দেখে। সঙ্গে তার সেই বান্ধবী এবং-রীতি অনুযায়ী-আরো তিনটি ছেলে, যাদের একজনের হাতে মেয়েটির হাত, স্বাভাবিকভাবেই।
দেখা যখন হয়, তখন আলাপই বা বাদ যায় কেন? অন্য দুটি

ছেলে জেভেরিয়ান, তৃতীয়জন ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি? তার বাবা কলকাতার এক বিগ বুল। অথচ বাঙালি...ক্যান য়্যু ইম্যাজিন ইট!

সেই রাতে
"তারপর? তোষণ ও মনোরঞ্জনের এই বেহায়া প্রতিযোগিতায় তুমি ক্যাবলা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারো না। তুমি যোগ দিতেও পারো না তাদের সঙ্গে, তোমার আত্মসম্মানে বাধে। তুমি চলে যেতে পারো না এদের ছেড়ে, সেটা বিশ্রী দেখায়। শুধু চেয়ে দেখতে পারো এক গাছের ফল খেয়ে অন্য গাছে উড়ে যাচ্ছে পাখি। উড়ে যাচ্ছে—এমনকি বিদায় না জানিয়েই।"

এরকম একটা সময়ে সাপের জিভের মত ফাঁক হয়ে যেতে থাকে তার কলমের নিব। ধীরে-ধীরে সেই ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসে রংচঙে একটা মাকড়শা! নিবের সূচীমুখ বেয়ে টুপ্ করে সে লাফিয়ে পড়ে কাগজের উপর। তারপর যতই সে চলে, তার পা থেকে নিঃসৃত উজ্জ্বল লালায় রেখাঙ্কিত হয়ে ওঠে কাগজ।

"তাহলে? সবকিছু মাথা পেতে নেওয়া। ভবিষ্যৎ যে সর্বনাশ নিয়ে আসে আমার জন্য তা চুপচাপ প্রত্যক্ষ করা। যন্ত্রণায় চিৎকার না করা, না-কাঁদা, না কাউকে বুঝতে দেওয়া। অন্তত, আত্মসম্মানটুকু তো এ যাবৎ বজায় রাখতে পেরেছি আমি।
ভয় হয়। কোন-কোনদিন মৃত্যু যেন একটু বেশি জোরে ডাকে। ভয় হয়. ."

২
ভয় হয়...
যেভাবে বৃষ্টির পর কুকুরের দেহময় ভর করে বিষণ্ণতা—
চোখের মণিতে ভাসে অর্থহীন অপচ্ছায়া, প্রজন্মের অত্যাচারস্মৃতি,
শতাব্দী-শতাব্দীব্যাপী নিদ্রার অগোচরে
যেভাবে মমি-র মত কুঁচকে যায় ভারতীয় রপ্তানীর মুখ,
ফাট্‌কাবাজারে ধস্ অতর্কিতে ভেঙে পড়লে
যেইভাবে সারারাত ঘর-বার করতে থাকে উদ্বিগ্ন চাঁদ,
রেলের লাইন জুড়ে যেরকম শুয়ে থাকে স্কিৎসোফ্রেনিয়্যাক, আর

তার উপরে শুয়ে থাকে রেলের লাইন—
সেইভাবে
দু-হাঁটু অবশ করে উঠে আসে ভয়...

যেভাবে কলেজগামী কিশোরীকে দেখে, ও পাঠক,
তোমার কণ্ঠেও কিছু টনটন করে ওঠে,
রাত্রি গভীর হলে ফুটপাথে শুয়ে থাকা ক্লিনারের দেহ
পেঁচিয়ে গিলতে থাকে বস্তিরই অনাম্নী অঙ্গনা—
অথবা মিছিল শেষে ঐ যে দুজন আজো হেঁটে যায়
হাতে-হাত, মননে-মনন—
তাদের মধ্যে যার অলৌকিক আবির্ভাব, কণারূপ-তরঙ্গের গতি,
তুমি তাকে কী বলো জানি না, তবে
আমি তাকে 'ভয়' বলে ডাকি।

এই ভয় আপাতত হতবাক করে দিচ্ছে
এশিয়ার- আফ্রিকার সারিবদ্ধ দাফনের প্রতিক্রিয়াগুলি,
এই ভয় ডাঙ্কেলের অশালীন লিঙ্গোত্থান থেকে পালাতে-পালাতে
দেখছে আকাশভরা ওজোনছিদ্রের ফাঁক দিয়ে
ঝরে পড়ছে নির্মম রোদ,
দেখছে—ঘাতক এক আলট্রা-ভায়োলেট
প্রমাণলোপের জন্য অতিজাগতিক হিমে গুঁজে দিচ্ছে
জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ চুক্তির প্যাপিরাস;
পৃথিবীর পশুগণ, হেরে যেতে অভ্যস্ত পৃথিবীর যাবতীয় কীট ও কুকুর
অবসন্ন হেঁটে যাচ্ছে সমুদ্রজলের দিকে শুক্লপক্ষে, নির্বাক,
প্রথম নিশায়,
তাদের পায়ের শব্দে—শব্দ নয় : বেজে উঠছে বাঁশি—
হ্যামেলিন থেকে সেই কুখ্যাত বাঁশির আওয়াজ।

দু হাঁটুতে মুখ গুঁজে এই সবই সহ্য করছে ভয়।
সহ্য করছে, যেহেতু সে এখনো একাকী;
যেহেতু সময় আজো প্রস্তুত হয়নি পুরোপুরি,
এখনো ললাট তার সাজেনি চন্দনে,
এখনো টোপর রাখা বইতাকে, সেলোফেন মোড়া,
এখনো গরদে তার আতরের স্পর্শ লাগেনি,
হাতে কেউ তুলে দেয়নি মাকু। আর-

"পুরোহিত আনতে কেউ গেছে নাকি...ও সময়...
ও সময়ের মা, পুরুত এখনো এসে পৌঁছল না কেন?
দেখো দেখি, ও বাড়িতে ওরা সব
জোগাড়-যন্তর করে বসে আছে নির্ঘাৎ,
ও সময়, তাড়াতাড়ি হাত চালা বাবা...।"

দু-হাঁটুতে মুখ গুঁজে এতদিন ভয়
সহ্য করে গেছে সব পাত্রদের দাঁড়িপাল্লা চোখ,
সহ্য করে গেছে সব পণ ও পাওনার ফর্দ...
—ভাস্কো দা গামা, হেস্টিংস, কর্নওয়ালিস...
—দেখি তো মা, চুলের গোছটা...
—ম্যাকার্থি, অ্যালান ডালেস, মার্কোস...
—পিছন থেকে হাঁটাটা কেমন বুঝছ, শালাবাবু...
—রোডস্ সোমোসা, সুহার্তো...
—ভিজে গামছা দিয়ে, মাসি, রংটা কিন্তু দেখে নিও...
—ইন্দিরা, জিয়া, মহেন্দ্র, ইয়েলৎসিন...
—ও খোকা, বাবাকে বল পাকা কথা এখনই না দিতে...

অবশেষে আজ তার কালো রঙে হলুদের ছোঁয়া,
অনামুখী বলে তাকে আজ আর খোঁটা দেয়নি কেউ,
আজই নাকি কেউ এসে তার দুই ভীতু চোখ থেকে
তুলে ধরবে আবরণ,
জ্বলে উঠবে তিন-চারটে ফ্ল্যাশ,
তারপর আরো রাতে বাসরের কোলাহল মুছে দিলে ঘুম,
ঈষৎ নার্ভাস কেউ কানে-কানে বলে যাবে—
"আমার অভয়া তুমি, কোনদিন ছেড়ে যাবে না তো?"

এই সবই হতে পারে, হবেও বা আরোও কিছু পরে,
কিন্তু, এখনো দেখো, বরপক্ষ পৌঁছয়নি এসে।
বাড়িময় উদ্বেগ দানা বাঁধছে প্রতিটি নিমেষে,
সানাই সরিয়ে রেখে শুরু হয়েছে ফিল্মের গান,
ঘর থেকে রাস্তায় পায়চারি করে যাচ্ছে অস্থির চাঁদ...
এই ফাঁকে মিষ্টির শেষ হাঁড়িটাও
ভাঁড়ারে ঢুকিয়ে রেখে একজন—
যে এখন দুঃখ পায় না কথা দিয়ে কেউ না এলেও,

যে এখন আনমনে দেখে যায় ডলারেরও অবমূল্যায়ন,
যে এখন জেনে গেছে শেয়ার বাজার দেখে
কীরকম স্মিত হাসে বিমূর্ত গণিত—
বোনের বিয়ের জন্য তিনরাত্রি ঘুম নেই যার—
তেল ও ময়লাকালো খাতার মলাট খুলে বসে
আঁকড়ে ধরে পেন...

"টিকে থাকো, হে দীর্ঘযাত্রী কদাকার কাঁটাভোজী, এখনো অনেকদিন
তোমার আহত কষে বারংবার কেটে বসবে নোংরা লাগাম। এখনো
অনেকদিন তোমার পেটে আছড়ে পড়বে চাবুক। তোমাকে হাঁটুতে হবে
আঁধির মধ্য দিয়ে দিকভ্রান্ত টলতে-টলতে। এখনো অনেকদিন তোমার
খাবার থাকবে একবেলা, কখনো বা সেটুকুও নয়। তবু তুমি টিকে থাকো,
যাতে লগ্ন সমাগত হলে ছিটকে ফেলতে পারো আরোহীকে।
রক্তভরা থুতুর সঙ্গে উগরে ফেলতে পারো লাগামের অবশেষ। ছুটে যেতে পারো এই অন্তহীন
নির্দয় বালিপাথরের দেশে—একক, স্বাধীন। ততক্ষণ—হে
স্তব্ধতাব গ্রীবা, অশ্রুপতনের অতীত, তৃতীয় বিশ্বের জন্তু—টিকে
থাকো।"

যখন ফড়িংরা ওড়ে

কালো কুয়াশায় ঢেকে যাচ্ছে রেলব্রিজ
তার ফাঁকফোকর দিয়ে
মুহুরীর হাত ধরে লেংচে-লেংচে বেরিয়ে আসছে
সপ্তাহান্তের পেটিকেস থেকে খালাস
সাট্টার পেনসিলার।

থানায় এখন কোন আলো নেই।
কুষ্ঠে ক্ষয়ে যাওয়া শিশ্নের মত একটা মোমের সামনে
হপ্তা ভাগ করতে-করতে
অসন্তোষে মাথা নড়ে উঠছে ডাক-কনস্টেবল ঝা-বাবুর
(সাল্লা, হালুয়ার বাচ্চা এ সপ্তাতেও কম,
এখন বড়বাবুকে আমি কী বলি...)—এদিকে
মেজবাবুর টেবিলে চার্জশিটের ফাইল,
তার মধ্যে মাসে তিনবার কলকাতা-ব্যাঙ্কক করা
কানা তপনের নরম করে আনা কেস,
যদিও মেজবাবু নিজে চেয়ারে নেই।

পরিশ্রমজনিত কারণে আজ রাতে ম্যাকডাওয়েল প্রিমিয়াম,
চিলি চিকেন আর গাছি-তে শ্যামার নাচ।

'নয়ন মুদিলে সব শব...'

এই পুলিশদের বাড়ি সাজাতে হয় টি-ভি, ফ্রিজ, ভি.সি.আর-এ
নিত্য নতুন কিনতে হয় শাড়ি, শিলওয়ার, লিও টয়,
নাহলে স্ত্রী-পুত্রের গুমোট মুখের সামনে
ঘরে ফেরা দুষ্কর হয়ে ওঠে।
সেহেতু আমি এদের দোষ দিইনা খুব।
ঐ স্ত্রী-পুত্রের চোখের সামনে, রোজ সন্ধ্যায়
ঘরের মধ্যেই শুরু হয়ে যায় ম্যাজিক...
—কীভাবে 'সন্তুর' মাখলে সধবাকেও মনে হয় কুমারী...
—কীভাবে 'টাটা সিয়েরা'-র কাচে ঝলসে ওঠে ম্যাসকিউলিন চোয়াল..
—কীভাবে মেয়ের বয়ঃসন্ধি আর মায়ের অস্তগামী যৌনতাকে
একই সঙ্গে উসকে দিতে পারে 'তুফানী ঠাণ্ডা...', তাই
এদেরও দোষ দিইনা খুব।

ঐ অ্যাড-ম্যানদেরও দেওয়া যায় না খুব দোষ,
কেননা, কে না জানে, বিজ্ঞাপন প্রথমেই গিলে খায় তার স্রষ্টাকে;
ফলে, তাকেও চড়তে হয় মারুতি, পরতে হয় ভ্যান-হুসেন।
কিংবা ঐ পনেরটি পরিবার ও শাঁ-শাঁ করে ঢুকে পড়তে থাকা
বিদেশি মালিকদেরও কি দোষ দেওয়া যায়—
যদি জানা থাকে—এটাই নিয়ম,
ব্যবসা এভাবেই করতে হয়,
কেউ না করলে, তাকে অচিরেই যোগ দিতে হয়
ফ্লাইওভারের নীচে শুয়ে থাকা
ভিখারিদের দঙ্গলে!

তবু, আমি প্রত্যেককেই দোষ দিই, এমনকি নিজেকেও,
কারণ, কখনো না কখনো—ফড়িংরা ওড়ে...

২.

যখন ফড়িংরা ওড়ে,
সে সময়ে দীর্ঘ বৃষ্টির পর সমুদ্র শান্ত হয়ে আসে,
ফলন্ত নারকেলের গর্ভে টুপুর-টুপুর শব্দে জমতে থাকে সুস্বাদু জল,
তখন—পেনসিলভেনিয়ার একর-একর জলাভূমি অতিক্রম করে
দুই দিন-তিন রাত্রি না-ঘুম না-খাওয়া লিবার্টি রেজিমেন্ট
প্রথম পল্লীতে ঢুকে পরিজের প্লেটের দিকে দৃকপাতও না করে
জানতে চায়—'কাণ্ডজ্ঞান বইটা দিতে পারেন মশায়,
টম পেইনের 'কাণ্ডজ্ঞান'?

যখন এক লাথিতে পাবের দরজা খুলে
ডিসেম্বরের তুষারপাতের মধ্যে বেরিয়ে আসেন বেচারা বি-বি,
তালি মারা গ্রেট কোটে কান ঢেকে টলতে-টলতে ফেরার সময়
তাঁর মুখ ঢেকে দেয় রাত;
ঘরে ঢুকে আলো জ্বেলে শেলফ থেকে তুলে নেন ডায়েরি
আর লিখে যান—
'আমি এখন মার্কসবাদের অন্তত সাত হাত গভীরে পৌঁছেছি'—
তখনই, উড়তে থাকা ফড়িঙের উন্মাদ ডানার শব্দে
ঘুম ভাঙে অনন্ত চণ্ডীদাসের।
'দেরি হয়ে যাচ্ছে...দেরি হয়ে যাচ্ছে...' বিড়বিড় করতে করতে
সলতের মুখে আগুন ছুঁইয়ে তিনি টেনে নেন তালপত্র,
তারপব পাঞ্চালীবিভঙ্গে গেঁথে যান
কীভাবে ডুবে মরার ভয়ে দেহ দিতে রাজি হত মেয়েরা,
কীভাবে সাধ মিটে গেলে প্রেমিকেরা পাড়ি দিত অন্য কোন দেশে...
ইতিমধ্যে, পিচ্ছিল বিযাক্ত জাল ছয়শো বছর ধরে
বিস্তার করতে থাকে ত্রয়োদশ শতক।

যখন বাজপোড়া হারুর শরীর ঘেঁষে যেতে যেতে
শেয়াল তাকিয়ে দেখে নক্ষত্রের নীলাক্ত সঙ্কেত,
প্রকাণ্ড গথিক থামে ঠেস দিয়ে জন রিড শুনে যান
সামরিক বিপ্লবী কমিটির পক্ষে সওয়াল করছেন ত্রৎস্কি,
সাংবাদিকদের বলছেন, 'এই মুহূর্তে রাজপথে
আমাদের কামানগুলো যা ঘোষণা করছে,
একমাত্র সেটাই আমাদের জবাব।'—

—যখন চতুর্দিক স্তব্ধ হলে নিজের শরীর থেকে বালি সরিয়ে
উঠে আসে সবুজ কাঁকড়া,
জলের অনেক নীচে ধীরে ধীরে চোখ মেলে ধূসর ঝিনুক,
যখন পঙ্গু সেই হাঁসের ডানার পাশে অতন্দ্র পাহারা দেয়
একরত্তি রিদয় হংপাল—
সে সময়ে ঝা-বাবুর হাতের মুঠোর মধ্যে কী জানি কী মন্ত্রে
দোমড়ানো নোটগুলো জ্বলন্ত আঙরা হয়ে ওঠে—
তখনই, ওড়ার সময় আসে ফড়িঙের।

৩.

তোমার বয়স কত? তুমি কি তাদের কোনোদিন
উড়তে দেখেছো?
তুমি কি দেখেছো, তারা আকাশের হাত থেকে
রোদ্দুরের প্রসাধন নিয়ে এসে
সাগরকে কেমন সাজায়?
তাদের ডানার ছন্দ কীভাবে শোষণ করে নাপামের গ্যাস?
নাগোরনো-কারাবাখে তাদের গায়ের রঙে একদিন
কীভাবে বিনতা হত পাহাড়ি গোলাপ?

তোমার বয়স কত?
ফাঁসিতে যাওয়ার গান তুমি কি শুনেছো?
তুমি কি পেয়েছ কোনদিন কলার মধুর মত কিশোরীর ঠোঁটের আস্বাদ?

সন্তানেরা, শোনো,
তোমাদের জন্য আমারা রেখে যাচ্ছি অন্ধকার প্রসূতিসদন,
রেখে যাচ্ছি পূঁজরক্ত, বিদেশির ভাষা আর রঙিন মাছির ঝাঁক,
রেখে যাচ্ছি—পড়োশিকে ঈর্ষা করা, রামের মন্দির আর
চাকরি পাওয়ার জন্য পার্টির পিছু ঘুর-ঘুর--
যেহেতু রাবার দিয়ে আমাদের কশেরুকা এতদিন গঠিত হয়েছে।

সিন্থেটিক অশ্রু আর মাইক্রোচিপ হাসির জগতে
এইভাবে আমাদের কেটে গেল দিন,
ভালোবাসা—সত্যি বলতে—কাকে বলে জানাই হলনা,
কেবল লাইন মারা, ছাম দেখা, পারলে হাতানো,

বিবাহবন্ধন মানে টিপেটুপে সন্ত্রান্ত ঝি-কে ঘরে আনা—
তোমাদের মায়েরা কি তোমাদের এসব বলবে?

যদি বলো, তবে এই—এইটুকু উত্তরাধিকার;
আর কিছু ভাঙা ইঁট, একটি-দুটি দগ্ধ শিলালিপি।
কখনো সেসব ভাষা উদ্ধার করতে পারো যদি
তবে এক অনির্বচনীয়
স্বপ্নসম ইতিহাস তোমাদের মুগ্ধ করবে।
আমরা গড়েছি সেই কল্পকথা নিজ হাতে কোন একদিন,
ভালোবাসতে ভুলে গিয়ে—ভেঙেছি আমরাই।

অথচ, বিস্ময় এই—আবারও গড়ার কথা ছিল।
লক্ষ্মী আজো মধ্যরাতে গৃহস্থের দুয়ারে-দুয়ারে
ডেকে যান—কে জাগে, কে জাগে...?
সন্তানের মৃতদেহ কোলে নিয়ে পথে পথে এমাম হোসেন
জিহাদের এত্তেলা পাঠান।
যাদের জাগার কথা ছিল—হায়—জাগতে হবে এই ভয়ে তারা
জোর করে মটকা মেরে থাকে।

এসব মানুষ দেখে ঘেন্না হওয়া স্বাভাবিক মানি,
তবে তাই, ঘেন্না কোরো, তবু
অনন্তের কাছাকাছি কোন এক দীর্ঘ সময় জুড়ে
নির্বিকার শৈত্যের পর—সন্তানেরা, শোনো,
প্রসারণশীল এই অতিবিশ্ব ঢেকে যায় মেঘে।
স্পন্দন শুরু হয় অতঃপর, ঝাঁকে-ঝাঁকে প্লাজমা ফড়িং
আবার উড়াল দিয়ে নতুন নিষেক শুরু করে;
স্পার্তাকুস দেখেছিল মৃত্যুর মুহূর্তে সেই উড়ালের অতিবর্ণালী,
চাটগাঁ-র পাহাড়ের গায়ে
অকালে মরতে তাই টেগরার শোচনা হয়নি।

তোমরা অপেক্ষা কোরো,
ফড়িঙেরা একদিন উড়েছিল—আবারও উড়বে।

আলাদিন ও আশ্চর্য প্রদীপ

সূচি

আমি কী রকম ভাবে বেঁচে আছি

স্বপ্নপ্রয়াণ

বাসনা

অনির্বাণ : ১৫০

আমি কী রকম ভাবে বেঁচে আছি

আমার পুরুষকার

সবৎস বর্ষার মেঘ; তুমি তার নীচে একা-একা
ইলিশ-গুঁড়ির মধ্যে, শক্ত করে কোমরে আঁচল,
বাঁ-হাতের চার-আঙুলে মৃদু-মৃদু দুলন্ত কলস,
অদূরে কুয়োর পাড়, যার ধারে নওল-কিশোর
সতেজ ডুমুর-চারা, জনৈক বিড়াল পিছু-পিছু...
এরপরে সব আবছা, অনুপুঙ্খ মনে নেই কিছু।

স্মৃতিকে ছাড়িনা তবু; মনে পড়ে, সেদিন দুপুর।
রেল-ইয়ার্ড...তা যা হোক, অন্তত কিছুটা তো দূর,
পরিত্যক্ত কার-শেডে তাস-খুরি-বাংলার বোতল,
স্তব্ধতায় ঘাপটি মারা চারজন ঘন আর গোল,
সেই সঙ্গে খোলা চোখ কলস সমান্তরালে ঋজু;
মুখভাব?...কী বিপদ, অনুপুঙ্খ মনে নেই কিছু।

থেকেই বা কার লাভ, হে কিশোরী, তুমি তো এখনো
ইলিশ-গুঁড়ির মধ্যে, কটিবিদ্ধ আঁচলেও কোন
প্রতিবর্ত ক্রিয়া নেই, পরিবর্তে সুতনু জঙ্ঘায়
বৃষ্টির শিহরে রোম ফুলে ওঠা, আর তার গায়
শীকরের শীতবাষ্প, কুয়োপাড়ে মুহূর্ত পরেই
কারা এসে ঘিরে ধরবে সে-বিষয়ে কোন জ্ঞান নেই।

থানা ডেকেছিল; তবু বৈদ্যবাটী গেছিলাম চলে,
মাতালের সাক্ষ্যে কোন ফল নেই বলে।

আমার পুরসভা অঞ্চল

কানের লতিতে কাঁচা ডালিমের দানা
কখনো দুলছে কখনো রয়েছে স্থির;

আলো ছিঁড়ে আনা আঁধারে সওয়ার আমি,
কাপুরুষ নই, বীর।

নিশুতি আঁধার, চারপাশ দেখা যায়না,
বহুদূরে এক ঠায় রাত-জাগা আলো,
সেই দিগন্তে ছুটছি এমন-সময়
দু-চোখ ঝলসে বিদ্যুৎ চমকালো।

সে-ঝলকে দেখি রাস্তার দুই ধারে
গোপন এবং নিষিদ্ধ বেচা-কেনা,
কারা বিক্রেতা? তারা আমাদেরই লোক,
খদ্দের ডেকে বলছে, 'কী নিবি, নে না?'

কী বেচছে তারা? এতদিন যত মুক্তো
চোখের মণিতে লালন করেছি—তা-ই;
এতদিন যারা ছিল ইমানের রক্ষী
মোটামুটি আজ ফিরিঅলা সব্বাই।

দেখি, একলাই চলেছি, শিরস্ত্রাণ
খসে গেছে কবে, আড়ষ্ট অঙ্কুশ;
শোনো, আমি এক উত্তর-ফাল্গুনী,
বীর নই, কাপুরুষ।

সকাল ১১.৫৫ মিনিট
১৯।৫।৯৪

আমার লোকাল কমিটি

এল-সি বলেছে, ঝামেলায় জড়াবেনা
এল-সি বলেছে, তোমার জন্য প্রায়ই
সমস্যা হয় আমাদের সকলের;
এল-সি বলেছে এল-সি বলেছে তাই।

এল-সি বলেছে, একা কোন কাজ নয়,
হঠকারীরাই কেবল ওসব করে;
এল-সি বলেছে, আমাদের আগে মানো,
রাজ্য-কমিটি যা-বলছে সেটা পরে।

এল-সি বলেছে আমাদের আগে বলো,
একা-একা কোন প্রতিবাদ করা মানা;
জানিয়ে দেখেছি, ফল যা হয়েছে তার,
শুধু আমি কেন, অন্যেরও সেটা জানা।

ঘরে বসে থাকি, বই পড়ি, টি-ভি দেখি,
এল-সিতে গেলে আলগোছে তুলি হাই;
যদি দেখি কোন আক্রান্তর মুখ—
এল-সি বলেছে...বাপ্‌রে, এড়িয়ে যাই।

আমার এখনো আশা

ওরা—সারসেরা মরে যায়, তবু পাসপোর্ট নেয়না।

কিছু কি ঘটবে এরপরও,
সাইনবোর্ড পাল্টে ফেলা ছাড়া?

তুমি ছুটেছিলে; আমি জানি, নিজেও তা জানো।
শুধু খেয়াল করোনি,
বেশ কিছুদিন হল একঠাঁয়ে, অভ্যাসবশত,
করে যাচ্ছো ছোটার মাইম।

ওইসব সারসেরা কখনো থামেনা।
তুমিও কি...
কিছু কি ঘটবে এরপরও?

আমার ভগবদগীতা

নিরীহ লোকের গায়ে কালশিটে, চাঁদার জুলুম,
শনি-মন্দিরের পাশে চোলাই আর সাট্টার ধুম।

আরাধ্য দেবতা আজ স্থপতিদানব সেই 'ময়',
ভণ্ডামিতে সংক্রামিত ইদানিং নিজেরই সময়।

তোমাকে তাড়িয়ে দেবে? দিতে পারে। তুমি সেই লোক,
চোখ বুজে থাকেনা যে, স্বজন-বন্ধুর কাছে বিপজ্জনক।

যে-যাই বলুক, তবু দায় থাকে, জেনো পরন্তপ,
যে যুদ্ধ স্থগিত আজ, তুমি তার দধীচি ও শব।

লেনিন নিষিদ্ধ রক্তে? ক্লীবতারই কাছে আজ ঋণ?
অস্বীকার করো পার্থ, কথা দাও, তুমিই লেনিন।

ঈষা

একজন আমায় হরণ করেছিল,
অন্যজন ঠেলে দিয়েছিল আগুনে—
আমি কোন দিকে যাবো?

তাদের সমস্যা ছিল নিজস্ব ও পারস্পরিক—
ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব, গুপ্তহত্যা, কুবেরের বিষয়-আশয়,
জেনানামহলের কূটনীতি আর ভাবমূর্তির চিন্তা,
জমি ও জমিদখলের লড়াই—তার জন্য
রাক্ষস, রণবীর, বজরঙ্ বা বানর...কতরকম যে সেনা!
আমার সঙ্গে তাদের কোন সংঘাত ছিলনা।
তবু একজন আমার চুলের মুঠি ধরে হিঁচড়ে তুলেছিল রথে, আর
অন্যজন নির্দেশ দিয়েছিল অগ্নিপ্রবেশের।
আর, সেই আগুন যখন চতুষ্পার্শে লেলিহান,
হিরণ্যলোহিত সেই তীব্রতা ছাড়া অন্যসব নাস্তি মনে হয় যখন,
আমায় স্থির করতে হয়েছিল—
আমি কোনদিকে যাবো?

হায় আমি স্থির করেছিলাম, কেন যে স্থির করেছিলাম হায়...

সে কত দীর্ঘদিন আমি কোন প্রসাধন করিনা

দীর্ঘকাল গ্রহণ করিনা আমিষ,
আশ্রমের কঠোর জীবনে এতদিনে আমি দৃষ্টিকটু কৃশা
স্মৃতিকে ঘৃণা করতে এখন এই মন অভ্যস্ত হয়ে গেছে।

অবশেষে, অর্ধশিক্ষিত এক ভাস্করের হাতে গড়া
নিজের আদলের এক সুবর্ণপিণ্ডের সামনে, আজ,
ততোধিক নির্বিবেক শত-শত মাংসপিণ্ডের সামনে, আজ,
আবার যেন লেপ্‌টে ধরেছে সেই আগুন।
বাতাস এখানে হৃষ্কা, যজ্ঞাগ্নিসম্ভূত ভস্মে
চরাচর স্তম্ভিত নিঃস্ব হয়ে আছে।
এ সেই সময়, যখন দিন বা রাত্রি কিছু বোঝা যায় না
কানের পর্দা বেয়ে চুঁয়ে নামে গলিত প্রলাপ...
কী এদের অভিপ্রায়, কী চায় এরা,
নারীমাস, পুত্রার্থ নাকি রাজোচিত ভাবমূর্তির উদ্ধার
কী, কী চায় এরা?
আমাকে কি আরো একবার ঠিক করতে হবে—
আমি কার কাছে যাবো—
বিনা দোষে যাদের একজন আমায় অন্তরীণ করে রেখেছিল, আর
অন্যজন দিয়েছিল নির্বাসন?

হে অযোধ্যার পুরস্ত্রীগণ,
যাদের জন্য আপনারা প্রস্তুত করেন ঘৃতপক্ক তণ্ডুল,
যাদের সন্তান আপনারা ধারণ করেন গর্ভে,
যাদের কল্যাণ কামনায় আপনাদের হাতে শঙ্খ-কঙ্কন—
তারাই তুলেছিল আমাব নির্বাসনের দাবি।

মাননীয়া রক্ষোকুলবধূরা,
চতুঃষষ্টি ক্রীড়ায় আপনারা যাদের অঙ্কশায়িনী হন,
যাদের তুষ্টির জন্য ব্যবহার করেন কুঙ্কুম, তাম্বুল ও লোধ্ররেণুকা,
যাদের উদ্ধারের জন্য আপনারা, এমন কি, যুদ্ধযাত্রাতেও পিছপা নন-
অশোক কাননের বহির্দ্বারে তারাই ছিল আমার প্রহরী।
প্রতিদিন তাদের দৃষ্টি আমাকে লেহন করেছে,
অহোরাত্রি শুনতে হয়েছে যৌন-উপহাস।

অনাগরী, অনভিজ্ঞা ও আমার বানরসুন্দরীরা,
এই মুহূর্তে যাদের পথ চেয়ে তোমরা বসে আছো,
যাদের জন্য প্রস্তুত করছ বেতসের সরঞ্জাম,
ক্লান্তি অপনোদনের জন্য মাধ্বী ও মৌরেয়,
পরিধানের জন্য বন্যপুষ্পমালা,
যাদের জন্য তোমরা দীর্ঘদিন প্রোষিতভর্তৃকা কিংবা এখনো অনূঢ়া—
আমার অগ্নিপ্রবেশে তারা কোন প্রতিবাদ করেনি;
টুঁ-শব্দও শোনা যায়নি নির্বাসনের সময়,
এবং, এখনো—এই তো তাদের দুই চোখ ক্রীতদাসের চেয়েও ক্লীব,
লাঙ্গুলগুলি চক্রাকার, মেরুদণ্ড নবনীত, উত্তেজনায়
ব্যাদিত মুখবিবর।

এখন আপনারাই স্থির করুন,
আমার কি কোনো একদিকে যাওয়া খুব দরকার?

একটি লোকগীতি

আমি পূর্বদিকে করি সূর্যপ্রণাম
পশ্চিমে করি ওজু,
উত্তরে আমি হুজুরে আলা
দক্ষিণে দিনমজুর।

ও মুরিদ, আমার কী হবে
আমি মুর্শেদ পালাম না।

আমি পূবদিকে রই চোরের অধম
পশ্চিমে সাজি সৎ,
উত্তরে আমি বেজায় প্রেমিক
দক্ষিণে লম্পট।

ও মুর্শেদ, আমার কী হবে
আমি যে নবী পালাম না।

আমার পূবদিকে হয় পুকুর ভরাট
পশ্চিমে জুহি চাওলা,
উত্তরে ঘুঘু গ্রামপ্রধান
দক্ষিণে থাকে হাওলা।

ও নবী, আমার কী হবে
আমি যে নূর পালাম না...

উদয়ের পথে

ছেলেটির বয়স তখন সাত—
পরিমাণমত চাঁদা দিতে না-পারায়, তার বাবাকে
সপাটে চড় কষিয়েছিল পাড়ার এক নেতা;
কেউ কোন প্রতিবাদ করেনি।

দু'বছর পর—
সরকারি জমিতে শনিমন্দির তুলতে বাধা দেবার জন্য
'প্রকাশ্য দিবালোকে' তার দাদাকে ফেলে পিটিয়েছিল
যে-সব ছেলেরা,
একদা তারা অন্য দলের হলেও, এখন ঐ নেতারই অনুগামী।

ছেলেটি এসব দেখেছিল।

সে দেখেছিল—
(১) একটা লোকও বাধা দিতে আসেনি। (২) অজ্ঞান দাদার মুখে জলের ঝাপটা দিতেও পারেনি কোন বন্ধু কারণ 'পাঞ্জা' কেটে নেওয়ার হুমকি ছিল। (৩) পাড়ার ডাক্তার প্রাথমিক চিকিৎসা করতেও আসেনি। (৪) থানা কোন এফ-আই-আর নেয়নি। (৫) পুরপিতা তার অসহায় বাবাকে বলেছিলেন, 'দোষ তো আপনার ছেলেরই, সে কেন লাগতে যায়...!'

দেখতে-দেখতেই ছেলেটির ষোল বছর বয়স হল
তার গালে এখন কচি দূর্বা, হাড় হয়ে উঠেছে চওড়া;
নাইন-টেনের মেয়েরা এখন তার দিকে আড়চোখে তাকায়,
কিন্তু, তারা জানে না,

দূর্বাঘাসের নীচে তার চোয়াল হয়ে উঠেছে কঠিন,
চোখে জমেছে রক্ত, যে রক্ত শাদা চোখে দেখা যায়না।

গল্পে বা সিনেমায় এসব ছেলেরাই এখন রুখে দাঁড়ায়,
শোধ নেয় বাপ-দাদার অপমানের,
নিজের হাতে তুলে নেয় বিচার—
অমিতাভ বচ্চন থেকে শাহ্‌রুখ খান অন্তত
আমাদের এমনটাই দেখিয়ে আসছেন।

কিন্তু, শিল্প ও জীবনের মধ্যে,
কল্পনা ও বাস্তবতার মধ্যে
অহর্নিশ যে লুকোচুরি চলে,
তাতে মাঝে-মধ্যেই আমাদের শিল্প ও কল্পনা যে
বেশ কিছুটা বিপর্যস্ত বোধ করে তাতে আর সন্দেহ কী!

ষোল বছরের ঐ ছেলে, একদিন, সামান্য বিবাদে,
আর তিনজন বন্ধুর সঙ্গে,
নিজের বাবার পেটেই ঢুকিয়ে দিল চাকু।
খুব স্বাভাবিক,
ছোট থেকেই সে দেখেছে
এই লোকটাকে মারা যায়—কেউ কোন প্রতিবাদ করেনা।

বাধা দিতে এসেছিল দাদা,
ফালাফালা হয়ে গেল সেও।
তাকেও তো মারা যায়,
মারলে কোন শাস্তি হয়না,
পুলিশ এফ-আই-আর নেয়না,
পুরপিতা চায়ে চুমুক দিয়ে বলেন, 'দোষ তো ওরই...।'

তারপর খুনের অস্ত্রগুলো ধুয়ে-মুছে পরিপাটি করে
টেবিলে সাজিয়ে রেখে
স্বাভাবিক মুখে বেরিয়ে পড়ল চারজন।
ভোরের আগেই তিনজন সীমান্ত পেরিয়ে গেল,
দূরে কোথাও বৃষ্টি হওয়ায়
যাত্রাপথে তারা ঠাণ্ডা বাতাসও পেয়েছিল।

আর, চতুর্থজন—আমাদের নায়ক—আশ্রয় নিল
সেই নেতার কাছে,
একদা যিনি চড় মেরে তার বাবাকে সহবৎ শিখিয়েছিলেন।

কোন প্রত্যক্ষদর্শী নেই—সে জামিন পেল।
প্রত্যক্ষদর্শী নেই—পিতৃসম্পত্তি পেতেও অসুবিধা হল না।

পাড়ার মোড়েই এখন তার আড্ডা,
চোখের রক্ত আরো গাঢ় হয়েছে,
এমনকি শাদা চোখেই এখন তা দেখতে পাওয়া যায়।
নাইন-টেনের সেইসব মেয়েরা তাকে দেখলেই এখন
ঘরে ঢুকে যায়,
আবার, দমচাপা সেই ভয়ের মধ্যে
কেউ-কেউ যে অন্য কোন আকর্ষণ বোধ করেনা—
এমনও নয়।

এরকম কেন হয়!

হে ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাগণ,
এরকম কেন হয়—
এটাই তো আপনাদের প্রশ্ন?

তবে শুনুন,
শুধুমাত্র নিষ্ক্রিয়তা আর উদাসীনতা দিয়ে
এই মহতী বাস্তবতার অনুপম ভিত্তিটি
আপনারাই এতদিন ধরে তৈরি করেছেন।

এখন আপনাদের ভেড়ুয়া বললে,
ভেড়ুয়াদেরই, মাইরি বলছি, খিস্তি করা হয়।

গুহাপঞ্চক

১
রাত্রি তো আসেই।

আর আমি বেইমান কল্পনার চাপ সহ্য করতে পারিনা। সহ্য করতে পারিনা তোমার দ্বিচারিতা আর নির্বিবেক। একা-একা, গুহাবন্দি থেকে-থেকে আমি বুড়ো হয়ে যাচ্ছি।

২
এই তো সুখ! এ-আমার দেখা হয়ে গেছে। সুখের ঘন প্রলেপে ঢেকে গেছে প্রতি রোমকূপ। শ্বাস নেয়ার জন্য শুধু নাক। যদি সে-টুকুও বন্ধ হয়ে যায় এই ভয়ে খবরের কাগজ পড়া ছেড়ে দিয়েছি। ছেড়ে দিয়েছি তোমার আনকোরা ইশতেহারগুলো পড়াও।

৩
ইশতেহার লেখে বাচ্চারা। রকমারি ঘোষণা করতে তাদের আটকায় না। সেটা বয়সোচিত বলেই সংগত।
পরিণত মানুষের পরিচয় তার কাজে। সে যদি ক্রমাগত নিজেকে ঘোষণা করতে শুরু করে, তবে বুঝতে হবে, ঘোষণাটাই তার অন্যতম কাজ। অতঃপর তাকে সন্দেহ করতে হয়।

৪
চারপাশে শীত আর জল। স্বপ্ন দেখার দিন চলে গেছে। এ-জন্য আমায় হতভাগ্য ভেবোনা। বিগত স্বপ্নের জন্য স্মৃতিকাতরতা আমারও আছে।

মাঝে-মধ্যে মনে হয় উঠে দাঁড়াই। বেরিয়ে পড়ি। কিন্তু, কী লাভ? সন্ধ্যা নামলেই মাথার ভিতরটা ফাঁকা হয়ে যায়। শরীর কোনো সান্ত্বনা দেয়না। নিবিড়তা মনে করিয়ে দেয় প্রাচীন বঞ্চনাগুলির কথা। আব, ও নিশান, তোমার এই কীটদষ্ট রূপ আমার ভালো লাগেনা ভালো লাগেনা।

তবু তোমাকেই প্রণাম। তোমার এই জীর্ণতার বিনিময়েই আমি পেয়েছি অপেক্ষা ও উপবাসের দীক্ষা—এককথায়, পরিণতি।

বিপথগামী কোন লেখককে তার কমরেডদের চিঠি

[অথবা শিরোনামটি উল্টেও পড়তে পারেন]

ফুটপাথে যারা আজো ভাত রাঁধে
তাদের কী হবে?
ময়দানে যারা কাগজ কুড়োয়
তাদের কী হবে?
যারা ঝাঁট দেয় ট্রেনের কামরা
তাদের কী হবে?
কমরেড, তুমি শুনতে পাচ্ছ কি?

কমরেড, এসো হাতে-হাত রাখো, বিরোধ মেটাই
কমরেড, চলো মানুষের কাছে ফের ফিরে যাই,
আমরা ছাড়া তো কেউ নেই দেখ ওদের এখনো,
আমরা ছাড়া তো ভালোওবাসেনি কেউ কোনোদিনও—
কমরেড, তুমি শুনতে পাচ্ছ কি?

কাপ ধোয়া ছাড়া কিছুই পারেনা যেসব শিশুরা,
তাদের কী হবে?
ঘোলা দৃষ্টিতে চেয়ে থাকা ছাড়া কিছুই পারেনা যে-সব মানুষ
তাদের কী হবে?
কমরেড, আমি লেখা ছাড়া আর কিছুই পারিনা —
আমার কী হবে?
কমরেড, তুমি শুনতে পাচ্ছ কি?

কমরেড, এসো হাতে-হাত রাখো, বিরোধ মেটাই,
কমরেড, চলো, কাঁধে-কাঁধ দিয়ে শত্রু ঠেকাই,
তোমরা ছাড়া তো কেউ নেই দেখ আমার এখনো
তোমরা ছাড়া তো ভালোওবাসেনি কেউ কোনোদিনও—
কমরেড, তুমি শুনতে পাচ্ছ কি?

কমরেড, তুমি শুনতে পাচ্ছ কি?

মাও-কে যা বুঝেছি

ভুলের সাথে ভুল ঠুকলেও ফুলকি জ্বলে,
ফুলকি থেকে
আগুন জ্বলুক,
এ-ঘর ও-ঘর, সবার ঘরে-ঘরে।

মেদ গলে যাক, মজ্জা গলুক,
জাড্য ভেঙে
চঞ্চলতা,
পানাপুকুর উথ্‌লে যাক ঝড়ে।

মেঘের সাথে মেঘ ঘষলেও
কামান ডাকে,
কামান দাগো
প্রতি পাড়ার সদর দপ্তরে।

থিয়েটারওয়ালা

(স্মরণ : উৎপল দত্ত)

মাল গেছে!—লাফিয়ে উঠেছে কেরানিরা;
যদিও আনতজানু শহর-শহরতলি-গাঁ,
নির্বাসিত অভিনেতা তবু তার কন্যাসহ খুশি,
পেট চেপে হেসে যাচ্ছে শ্রীরকৃষ্ণ দাঁ।

মালিকেরা স্মিতমুখ; প্রত্যেকে ফুলের বোকে হাতে
সার বেঁধে দাঁড়িয়েছে, তাহলে এবার র‍্যালা শুরু...
আমরা তো মেজাজে আছি, ফেঁপে উঠছি বরং নিয়ত,
কোতায় বিপ্‌লব্‌ বাওয়া, তুমিই তো আগে গেলে গুরু..

কোথায় বিপ্লব, তুমি কথা বলো উদ্ধত নটুয়া,

মাথার উপরে আর ছাদ নেই, আদিগন্ত ফৌজিচারণা,
একা-একা শুয়ে আছো! ধিক তুমি, লড়াই থামেনি,
আমাদের ফেলে আজ এইভাবে পালাতে পারোনা...

সেহেতু সৈনিক আজো শায়িত সে অনশ্বর বিভা—
দেহপট সনে নট হারায়না শ্রেণী বা প্রতিভা।

হিতোপদেশ

ড্যাট ওয়াজ আ ডার্টি ট্রিক, বিলি,
আমি বলছি সান্তিয়াগোর কথা,
তখন তুমি বাচ্চা ছিলে বটে
তবু সেটাই শুরু অসভ্যতার।

দাদার পরে দাদা-ই পাল্টায়
পাল্টায় কি হফ্‌তা-তোলার দিন?
এখন তুমি নিজেই গ্যাংস্টার,
সোমালিয়ার অবস্থা সঙ্গিন।

ওয়াজ ইট ড্যাট নেসেসারি, মাই বয়?
অহরাত্রি বহুজাতিক স্তরে
দেয়াল ধরে দাঁড়িয়ে থাকো কেন,
বউ তো শুনি ভালই আয় করে!

নাকি এ এক বে-এক্তার নেশা
দাদা বনবার উন্মাদ ইচ্ছে;
নোরিয়েগা তো নস্যি, এই ড্রাগের
মূল পেডলার ফ্রিডরিশ নিট্‌শে।

যদিও তাঁর করুণ পরিণতি
অজানা নয় তোমারও ভাইটি,
তথাপি, হায়, শোচনাহীনভাবে
কাল বাগদাদ, আজকে হাইতি...

শুরু করেছ নোংরা গ্লোব-সকার,
যেখানে রোজ বাঁশি বাজার আগেই
ঠিক হয়ে যায় জিতবে কোন দল,
ঠিক হয়ে যায় কত পড়বে ভাগে।

বায় দা ওয়ে, এ-দেশে বাচ্চারাও
এভাবে রোজ জিততে চায় না,
তাদেরও আছে যেটুকু স্বচ্ছতা
তোমার তা নেই...ভাবাই যায়না!

প্রশ্ন শুধু একটা—আল-কাপোন,
কতদিন...আর কদ্দিন এইভাবে?
চিরকাল তো পৃথিবী থাকবেনা
ঢাকা তোমার রাষ্ট্রীয় কিংখাবে;

থাকবেনা আর পার্ষদ ফুকিয়ামা,
থাকবেনা আর ল্যাংলি-পেন্টাগন;
সময় তার সামুদ্রিক ঝড়ে
উড়িয়ে নেবে বিকারগ্রস্ত মন।

এবং, কোন অ্যাসাইলেমের সেল
দেখবে, তোমায় কী-ভাবে পিষছে,
এমনই হয়, মাই ডিয়ার বিল,
হয়েওছিল ফ্রিডরিশ নিট্শে-র।

উইল ইট বি নেসেসারি...হে বয়,
অহরাত্রি বহুজাতিক স্তরে
দেয়াল-ধরা থামিয়ে দাও বরং,
বউ তো তোমার ভালই আয় করে।

আপনি কি আদর্শ মার্কিন নাগরিক হতে চান?

ওরা হ্যামবার্গার খায়
ওরা মর্টগেজে বাড়ি কেনে
ওরা ফুর্তিও করে থাকে
তবে, শনি-রোব্বার মেনে

ওরা ডিজনিল্যাণ্ডে যায়
আরও নানাবিধ করে বায়না
ওরা পশুদের ভালবাসে
তবে, কালো লোকদের চায়না

ওরা চিকিৎসা-বীমা করে
ওরা বীমা করে শিক্ষার
ওরা নিজের কফিন কিনতেও
বীমা মনে করে দরকার

ওরা ভোট দেয় দুটি দলকে
ভোট নিয়মিত দিয়ে যায়
যারা সৌদি-তে সেনা রাখে
রাখে দিয়েগো-গার্সিয়ায়

যারা জীবাণু যুদ্ধ করে
যারা অস্ত্রের ব্যবসায়ী
যারা বুশ-রেগন বা বিল
যারা মাদলিন অলব্রাইট

ওরা কোক বা বুরবোঁ খায়
সেটা ক্রেডিট-কার্ডে কেনে
ওরা বাগানের ঘাসও ছাঁটে
তবে, শনি-রোব্বার মেনে

ওরা চাকরি রাখার চিন্তায়
কী করবে তা ভেবে পায়না
ওরা গণতন্ত্রও মানে

তবে, অন্যের দেশে চায়না

ওরা নিয়মিত ট্যাক্স দেয়
ওরা গ্রে হাউণ্ড বাসে চড়ে
ওরা নিজেদের দেশে আজও
কোনও যুদ্ধকে ঘৃণা করে

ওরা ভোট দেয় দুটি দলকে
ভোট অবিরত দিয়ে যায়
যারা কার্বাইডকে পোষে
যারা নিমের পেটেন্ট চায়

যারা অকাতরে খুন করে
চিলি, লিবিয়া বা বাগদাদে
যারা অবরোধ জারি রাখে
আর, লক্ষ শিশুরা কাঁদে

ওরা ভোট দিয়ে যায় তবু
ওরা ভোট দেয় সজ্ঞানে
ওরা চার্চেও নাকি যায়
প্রতি রবিবার দিনমানে

ওরা চার্চেও যায়, পিতা,
একী নিদারুণ অস্মিতা

ধাবা

তড়কা ও দেশি মদের গন্ধ তো বটেই,
এছাড়াও বোবাধরা মধ্যাহ্নে
খাটিয়ায় বেহুঁশ অন্তত একজন
বিপুলকায়, বৃদ্ধ শিখ;
বাঁধানো বাসস্ট্যাণ্ড মানেই যেমন
নিদেনপক্ষে একটি উন্মাদ।

নিশাদুপুরের কাছাকাছি
রুক্ষ তালুর চাপে মাঝপথে ঠেসে ধরা
একটি গোঙানি;

অতঃপর, শিশুশ্রমিকের পাপবিদ্ধ ঘুম।

সমীপেষু

নর্মদা আমি দেখিনি কখনো, নর্দমা ঘেঁটে জীবন কাটাই,
দেখিনি কখনো জল-দর্পণে গাছ-বউদের সাঁঝকানাকানি,
আরো যা দেখিনি—অববাহিকায় আধপেটা জান-কবুল ভাঁইলা,
আর তার মাঝে সূর্য-দীঘল আগুনের পাখি—হে আপসহীনা,
আমার বউ তো আপনার নামে মুগ্ধ-আকুল; কেবল বেচারা
আমারই মাথায় তার্কিক এক রহস্যমাছ শুধু ঘাই মারে...

মেধা পাটকর, নর্মদা ছাড়া দেশে আর কোন মানুষ থাকে না?

মানছি আমরা আদিবাসী নই, তবু তো দেখতে ততটাই প্রাণী,
ফুসফুসে ঢালি কার্বন আর মুমূর্ষু ভাষা আঁকড়িয়ে থাকি,
আমরাও খুব ভালো নেই মেধা, বন্ধুরা বহু-বছর ফেরারী,
সমাজ-আঁধিতে চারপাশ ঘিরে দক্ষিণরায়...দক্ষিণরায়
এ সময় যদি আমাদের হাত না-ধরেন তবে, ওগো মহীয়সী,
কোন মোহানায় বৈঠা বাইবো, যদি না-আসেন আমাদেরও গাঙে—

মেধা, আপনার ডানার ঝাপটে আমাদের পালে ঝড় উঠবেনা?

তাই আশা রাখি—আসন্ন কোন মেঘমালা দিনে ঐ মুখশ্রী
আমাদের সব ভীতু ঠোঁটে-ঠোঁটে প্রথাবিরুদ্ধ গুরুসঙ্কেত
বুনে দেবে, আর বলে যাবে : ওঠো, মানুষ তো শুধু একবারই মরে।
হবে তো এমন, কথা দিন মেধা? অন্যথা এই গরিব চারণ

শ্রুতি ও পুঁথিতে, বাষ্পে-বাতাসে, দেশ-দেশান্তে জানিয়ে ফিরবে—
পৌত্তলিকের নির্জীব দেশে আপনিও এক ব্যবস্থাপ্রিয়া,
শুধু প্যাকেজিং পরিকল্পিত, যার দায়িত্বে সে-সব লোকেরা—

মেধা পাটকর, বিশ্বব্যাঙ্কে আপনার যারা বন্ধু রয়েছে।

ইমিগ্রেশন অফিসে

প্রশ্ন—
১. কোথা থেকে এসেছেন?
২. কেন এসেছেন?
৩. বিশেষ করে এ-দেশই আপনার উৎসাহের কারণ কেন?
৪. এখানে আপনার কর্মসূচী কী?

উত্তর—
মৃতদের পক্ষ থেকে আমি এসেছি।

এসেছি মৃত গণ্ডাদের পক্ষ থেকে
জীবিতদের জন্য।
যাই হোক, এ প্রসঙ্গে
আয়োনেস্কো অবান্তর, জানবেন।

ভারতবর্ষকে আমার প্রথম দৌত্যস্থান
বেছে নেওয়ার পিছনে এই বিবেচনা কাজ করছিল যে,
জীবিত মোট চল্লিশহাজার গণ্ডারের মধ্যে
অন্তত কুড়ি হাজারের বাস এখানেই।

অবশ্য, দৌত্যের এই শুরু,
এরপর আমায় কথা বলতে হবে
সাপ থেকে হরিণ, কাক থেকে ফ্লেমিঙ্গো,
ক্যাঙারু থেকে কচ্ছপ, পঙ্গপাল থেকে প্রজাপতি—
এবং, সব লতা-গুল্ম-বৃক্ষের সঙ্গেও।

শুধু, মানুষ না।
নির্দিষ্টভাবে একমাত্র তাদের সঙ্গেই আমায়
কথা বলতে বারণ করা হয়েছে।

অধিকাংশ ছাত্রী

পরীক্ষার একমাস আগে
'সমুত্থান আধুনিকতার'—
পড়ে, তারা শিবরাত্রিতে
পুজো দেয় ষোড়শোপচার।

ভাষা নিয়ে অন্নদাশংকর
কী বলেন তাও তারা জানে,
অতঃপর টি-ভি অন করে
মন দেয় হিট 'স্বাভিমানে'।

কাব্যের 'আত্মা' তারা পড়ে,
'বাচ্যকে ছাড়িয়ে যায় ধ্বনি'—
এইসব পার্ট-টু-তে লিখে
বর খোঁজে, মোটামুটি ধনী।

'বলিদান' পড়ে পণপ্রথা
কাকে বলে তাও জেনে যায়,
পরীক্ষার পর-পরই তাই
পণ দিয়ে বিয়ে হয়ে যায়।

প্রতিবেদন

বিশেষ করে এখানেই লিখে রাখা ভাল,
ছেলেদের কাছে পরিকল্পনামাফিক বিক্রির জন্য
মেয়েদের এক পত্রিকায়—

যে, ছিঁচকে-মধ্যবিত্ত এই সমাজে প্রথম সুযোগেই আমি নারীবাদী হয়ে গেছিলাম।
কিন্তু, দুটি গুণ্ডাকে অন্তত কাছ থেকে পর্যবেক্ষণের ফলে
পুনর্বিবেচনার অবকাশ পাওয়া গেল।

একজন, যে বৃদ্ধ-অশক্ত ভিখিরির সানকি থেকেও
পয়সা ছিনিয়ে নিয়ে হ্যাঃ হ্যাঃ করে হাসে, এবং অপরজন
পাড়ার এক মহিলার সামনেই তাঁর দুবলা স্বামীকে পিটিয়ে লাশ বানাল।
স্থানীয় সুধীজনের সঙ্গে সে-দৃশ্য আমিও প্রত্যক্ষ করেছি।

পরবর্তী সময়ে, একান্ত এক সাক্ষাৎকারে, বধূটি আমায় জানিয়েছিলেন—
'বিশ্বাস করুন, ওঁকে না-মেরে শয়তানটা যদি আমায় ধর্ষণও করত,
তাও যেন আমি বেঁচে যেতাম!'
কোনো যৌন-অবদমন কি এই অনুভব বহন করে আনে?
প্রশ্নটি করার পর সেই যে মহিলা ঝটিতি উঠে গেলেন, আর
কখনো তিনি আমার মুখদর্শন করেননি।
কিন্তু, এ প্রশ্ন তো করতেই হত, কেননা তথ্য এই যে,
'শয়তানটা' তাঁকে ধর্ষণের এতটুকু আগ্রহ দেখায়নি।

কারণ, এই দুই গুণ্ডা, এত কিছুর পরেও
তাদের উজ্জ্বল বায়োডাটা প্রমাণের জন্য এ-কথা জানাতে ভুলত না যে,
তারা নারীদের সম্মান করে; করে এসেছে।

অতঃপর নারীদের সম্মান করাকে আমি সন্দেহ করতে শিখলাম।

স্বপ্নপ্রয়াণ

কুয়াশায় মাঠ আবছা
নেমে আসে এক কিন্নর,
হাইওয়ে ট্রাকে পিচ্ছিল
স্বপ্ন আবার ছিন্ন।

স্বপ্ন আবার ছিন্ন।
তার ফাঁক দিয়ে সর্পিল

তৎপর এক সিম গাছ
ছুঁড়ে দেয় তার আঁকশি।

ছুঁড়ে দেয় সেই আঁকশি
শাশ্বত যার সংজ্ঞা,
কেউ তাকে বলে সংকট,
মোকাবিলা বলে কেউ-কেউ।

মোকাবিলা বলে সেইসব
বীর, যারা উত্তীর্ণ;
আমরা পেরেছি? কে-জানে!
ওরা কি পারবে? জানিনা।

ওরা কি পারবে? জানিনা।
যেহেতু তুচ্ছ চেষ্টায়
ওদের মধ্যে কুয়াশা,
কুয়াশায় মাঠ আবছা।

কুয়াশায় মাঠ আবছা
হাইওয়ে ট্রাকে পিচ্ছিল
অদূরে তামস দরিয়ায়
মাছ নিয়ে যায় কোন চিল?

মাছ নিয়ে যায় সেই চিল
আসলে যে কোন পাখি নয়,
ডানা মেলা একা কিন্নর
খোঁজে তার আঁশগন্ধা

খোঁজে সেই আঁশগন্ধা
নারী, যার কোন আঁখি নেই,
নীল বিষণ্ণ চুমুতে
যে আঁকে বাতাসে স্বপ্ন

স্বপ্ন আবার ছিন্ন
স্বপ্নেরই এটা সংজ্ঞা
অনুজরা আজ ভিন্ন
শিলিগুড়ি থেকে বনগাঁ।

ফিনিক্স

—'চক্ষুহীন গলিতে কে-কে?'

—'আমরা বস্, এবং একে
খরচা করে ছিপি খুলেছি সবে।'

—'খতম হল? কে রে সে লোক?'

—'আমি। আমার দু-দুটো চোখ
মরার পরেও অধীর, দেখছ না?'

—'লিঃ পাগ্লা, এটা কী কেস!
ছিটেল নাকি, দেখে তো বেস
ফাণ্টুস মাল মনে হচ্ছে গুরু।
মরার এত ইচ্ছে কেন
বাদ দিয়ে সব ভ্যানর-ভ্যানর
বানাম করে বলো তো বড়ে ভাই?'

—'তুমি কিচ্ছুই বুঝবে না তার;
বলছি তবু, ঐ আকাশ আর
এই মাটিকে, এই ধুলোকে
অনির্বাণ দিনগুলোকে
আবার আমি নতুন করে
গড়ে তুলতে চাই।'

সম্পর্ক

সম্পর্ক কড়া নাড়ে, সম্পর্ক চিঠি দেয়,
সম্পর্ক ফোন করে, অধিকন্তু ন দোষায়
এই ভেবে রাগ করে, অনুরাগও করতে চায়—
সম্পর্ক এরকমই...সম্পর্করা আসে-যায়।

যখন শূন্য থেকে ঝড় ছিঁড়ে পড়তে-পড়তে
নানা মেঘ, বায়ুস্তরে সম্পর্ক করতে-করতে
মন্দকথা...মন্দনাম...মন্দবেগে তার অজান্তে
নামে এই পৃথিবীতে, নামে সব সম্পর্কান্তে

তখন তাহাকে বলি, কী পেলে সত্যি বলো,
এতসব সম্পর্ক—এমন কী তাতে হল?
সে বলে, 'ইমান তুমি, তোমাকেই হক বলছি
অহোরাত্রি তার জন্য সম্পর্ক আমার টলছে,

যে আমাকে গাল দিচ্ছে, যে আমাকে বলছে—তুমি
ঝড় ছিলে, হে মাতাল, এখন আর কোনো উন্মিদ
নেই, তুমি ভোগে গেছ সম্পর্ক করতে-করতে,
তোমার গতিও নেই, হায়, তুমি ভাঙবে বলতে।'

হ্যাঁ, আমি ভাঙব বলতাম—আচমকা ঝড় বলে—
শালা, ঘাম মুছতে আমি এসেছি কি ধরাতলে?
'ধরাতল' শব্দটাও...ভাবো কী অধঃপতন,
এসব লিখছি আমি, খেলছিও ইতস্তত।

তবে সে ফুরিয়ে এল, লীলেখেলা, চাতুরালি,
পরিপাটি শব্দ দিয়ে সুখী-সুখী গেরস্থালি;
আবার ফিরছি দেখ দোজখের অগ্নিঝড়ে,
জহর ছড়িয়ে দিতে ধান্দাবাজ এ শহরে।

বেগম, অধীনে রেখো ঐ দুটি রাঙা পায়ে,
এ-সম্পর্ক যদি যায়, বলো জ্বলি কী উপায়ে?

রক্তকরবী

তোমার কথা শুনেছি কতবার
কত যে লোক বলে তোমার নাম,
আমি ছিলাম নির্বাপিত দেশে
আমি কি আর তোমায় চিনতাম!

পুরাণে বলে, লোককথায় বলে—
আসবে তুমি, কখনো-কোনদিন,
মুছিয়ে দেবে গেরস্থালি চোখ,
অনামিকায় ফোটাবে আশ্বিন।

পেরিয়ে গেছি মেঝেনদের দেশ
পেরিয়ে গেছি কুষ্ঠে খসা গ্রাম,
জানো কি তুমি, অনেকে এখানেও
ফিসফিসিয়ে বলে তোমার নাম?

পেরিয়ে গেছি দস্যুদের তাঁবু
পেরিয়ে গেছি ভগ্ন বন্দর,
যেখানে রোজ বালিতে দোহা লেখে
বিলাপরত দু'জন অন্ধ।

তাদের থেকে তোমার নাম করে
টুকে নিয়েছি লুপ্ত প্রার্থনা,
না-হলে ঐ হতভাগ্যদের
মনোবিকার কখনো সারত না।

পেরিয়ে গেছি নিশানরাঙা পথ,
কোথায় আছো, কীভাবে আছো তুমি?
পায়ের নীচে দগ্ধ ধানখেত,
পায়ের নীচে শীতল মালভূমি...

চেরাগ হাতে নানান দেশে যারা
ঘুরে বেড়ায়, সাত-সুলুক রাখে,
তারা বলেছে, আমরা কেউ নই,
সেই মেয়েরা চিনতে পারে তাকে;

যাদের হাত ফ্যাকাশে হয় ক্ষারে,
যাদের হাত চুলোতে স্যাঁকা হয়,
যাদের খুব কথা বলার সাধ—
কথা বলতে যাদের আরো ভয়...

তাদের সাথে যখন দেখা হল,
তখন ভীতু দৃষ্টি অনুসারে
মানচিত্রে পথ বসিয়ে আমি
এক ছুট্টে তেরো-নদীর পারে।

মস্ত এক পাঁচিল পার হয়ে
পরের-পর দরজা ঠেলে-ঠেলে...
খুঁজে পেলাম তোমাকে, নন্দিনী,
নিখোঁজ এই পাগলিদের সেলে।

বাসনা

খাওয়া হয়নি শালিধানের চিঁড়ে
খাওয়া হয়নি সোনামুগের ডাল,
দেখা হয়নি পুন্যিপুকুর ব্রত
স্বপ্নে আমার বউ আসেনি কাল

ও জ্বর, তুমি এসোনা এক্ষুণি...

ছোঁয়া হয়নি বাদার মুথা ঘাস
ভোমর-কালো সোনাই-দীঘির জল,
ঘোরা হয়নি বনবিবির থান—
মাজার জুড়ে চেরাগ ঝলোমল

ও জ্বর, তুমি এসোনা এক্ষুণি...

আজো তোমায় দেখা হয়নি সুখী
ধরা হয়নি লতিয়ে ওঠা হাত,
লেখা হয়নি কবিতা একটাও
সারা হয়নি আখরি মোনাজাত

ও জ্বর, প্লিজ, এসো না এক্ষুণি...

কুড়িয়ে পাওয়া গান

কুড়িয়ে পাওয়া গান, তুমি আমার ঘরে থাকো কয়েকপল
বসতে দেব কাঁঠাল-কাঠের পিঁড়ে এবং তৃষ্ণা পেলে কপূর-দেয়া জল,
দেখো আমার গেরস্থালি, খিড়কি-পুকুর, আশ-শ্যাওড়ার ডালে
সতৃষ্ণ এক মাছরাঙা আর একটেরে ঐ হেঁশেল-ঘরের চালে
সদ্য ফোটা লাউয়ের ফুল, তার উপরে শিশির কয়েক ফোঁটা,
ভরে এসেছে বেগুন-গাছ, পিছন দিকে মরিচ গোটা গোটা—
গান, তুমি কি ঘেমে গিয়েছো? হতেই পারে, ছিলে পথের ধারে
একলা এবং অনাদৃত, কত-না লোক অজস্র সম্ভারে
পাশ কাটিয়ে চলে গিয়েছে, তুমিই শুধু শুকনো মুখে একা...
নেহাৎ আমি দীঘির জলে নেয়ে ফিরছি, তাই না হল আচম্বিতে দেখা,
আর কিন্তু লাজ কোরোনা, বাঁদিপোতার গামছা দেখ ঐ
দাওয়ার উপর মেলা রয়েছে, মুখ-ধোওয়ার ঘটিটা ছাই কই...
ওঃ, এই তো গুড়ের হাঁড়ির পাশেই রাখা, শুকিয়ে যাওয়া গান,
কুয়োতলায় ঘুরে এসো, ততক্ষণে তোমার জলপান
তোয়ের করি; চিঁড়ে-দৈ আর সবরি কলা, সঙ্গে খেজুর গুড়...
গুড় না-খাও, বাতাসা আছে, কদমা আর নকুলদানা ধামায় ভরপুর,
যা-ইচ্ছে খেতে পারো, অতঃপর মিঠাই দেব পাতে,
খাওয়ার পরে মৌরি দেব, মৌরেয় না, কিমাম দেয়া পানও দেব হাতে,
শুতে দেব শীতলপাটি, বাতাস দেব তালপাতার পাখায়,
জানবে তুমি সার্থক এই ধানছড়া আর চরণচিহ্ন আঁকা,
এবার তোমায় কুশল নেব, বলব : তোমায় বেঁধেছে কোন কবি
কার এরকম সহজ নজর, জীবনযাপন কার এতটা গভীর?
গান, তুমি কি জবাব দেবে, নাকি থাকবে স্বভাবলাজুক চুপ?

স্তব্ধতার অন্তরায় ডেকে উঠবে কুবো পাখি, এবং তোমার রূপ
সরস হবে, ভরে উঠবে, স্মরণ ঝেঁপে ডেকে আনবে আষাঢ়
ছিল না যা, মনে হবে হয়ত ছিল—নিবিড় ভালোবাসার
সে-সব দিন আমায় ভাবো নত করবে? প্রহরকালের মিতা,
যাওয়ার আগে দেখিয়ে দেব উন্মার্গগামিতা।

তরুণ কবির প্রতি

যখন আমায় নিঃশেষিত ভাবো
তখন আমি উড়াল দিই হাওয়ায়,
যখন আমায় দ্বীপান্তরী ভাবো,
আমি তখন তোমারে ঘরের দাওয়ায়

তরুণ, ওগো তরুণ, তুমি
আমার হাতে শিউরে উঠবে না?

পচন। তুমি পচন কাকে ভাবো?
পচন মানে, ভিন্ন কোনো দেহ
ফুটিয়ে তোলা সারের রূপ ধরে—
এতে তোমার আছে কি সন্দেহ?

তরুণ, ওগো তরুণ, তুমি
আমার বুকে লতিয়ে উঠবে না?

যখন তুমি নষ্ট ভাবো আমায়
তখন আমি নিজের ভাষাজাল
বিছিয়ে দিই তোমার অগোচরে
তোমার গানে বাজে আমার তাল

তরুণ, ওগো তরুণ, আমার
অস্থি দিয়ে বজ্র বাঁধবে না?

২১শে ফেব্রুয়ারি বা ১৯শে মার্চ : তোমাকে

তুমি দেবী চৌধুরানি, আমি ব্রজেশ্বর
আমি তোমার আশকারাতে চণ্ডাল, বর্বর

তুমি আমার গোসল-পানি, আমি কানের দুল
তুমি আমার বেগুন দিয়া ইলশা মাছের ঝুল

তুমি আমার নারানগঞ্জ, আমি রমনার মাঠ
আমি সারেং, অপেক্ষাতে তুমি স্টিমার-ঘাট

তুমি আমার কুণ্ডলিনী, আমি তোমার পীর
তুমি হইলে জয়নাব আর আমি যুধিষ্ঠির

ভালোবাসব সূফি মতে, বিয়ে করব কণ্ঠী
বদল করে, যদি আমায় পুরুষ ভাবো অন্তিম

কে ঈশ্বর? পাত্তা দিই না, অন্ন আজো ভূমা
ফজর কালে সোহাগ করি, আহ্নিকে দিই চুমা

তোমায় দেখে অন্ধ ভোলা, উন্মাদ অ্যান্টনি
ঈশ্বরেরও অধিক তুমি, ঈশ্বরী পাটনী

অনির্বাণ : ১৫০

হে চিরাগ

"বুর্জোয়া সমাজে পুঁজি হল স্বাধীন, স্বতন্ত্র-সত্তা, কিন্তু জীবন্ত মানুষ হল পরাধীন, স্বতন্ত্র সত্তাবিহীন।"

'অর্থস্য পুরুযো দাসো দাসত্বর্থো ন কস্যাচিৎ।
ইতি সত্যং মহারাজ ! বদ্ধোহস্মর্থেন কৌরবেঃ।।'

—ভীষ্মপর্ব

নির্বাপন নেই তার, ঝড়ে শিখা হেলে-দোলে শুধু,

কভু পথ মুছে যায়, কভু দেখো প্রখররোশন;
নিত্য ঝড়; নিত্য শিখা—এইভাবে শতক পেরিয়ে
বিচ্ছুরিত ঘৃণামসি, ততোধিক শ্বাসরুদ্ধ ইশক্।
এ-সংসার লীলাক্ষেত্র, হে চিরাগ, আজো ভালোবাসো?

১.

'বিসমিল্লাহ্-এ-রহিম' বলো, কিংবা 'দুগ্‌গা মা'।
যাত্রারম্ভে এতদ্ভিন্ন কথা কবে না।।
'বদর-বদর' নয়, না 'দক্ষিণরায়'।
ডাকিলে সফর জেনো বুঝি মাটি যায়।।
ধর্ম ছাড়া রাজনীতি শুনিতে কেমন।
নুন ছাড়া তরকারি খাইতে যেমন।।
এ-পারে চালাই বেবি, ভিন্ন-পারে অটো।
উভয় বাহনে শোভে শাহ্রুখের ফটো।।
সাতচল্লিশ দেখি নাই, একাত্তরও নয়।
জানি তবু দুইয়ে-দুইয়ে দোয়া অব্দি হয়।।
জানি, মালাউন-বাড়ি জ্বালানো সম্ভব।
কাটা-র দোকান ঘিরে 'শ্রীরাম' তাণ্ডব।।
সুদ নয় লভ্যাংশ : বৈদিক গণিত
কত-না মন্দির আর দুখী মসজিদ।।
জানি, কে পাড়ার দাদা, কে সহসা লাল।
জানি, কে গো মিলিটারি, ঘাতক-দালাল।।
আরো জানি, সায় দেয়না যে প্রতি কথাতে।
তার বাড়া শত্রু নাই দিনে কিংবা রাতে।।
কে ঋণ-খেলাপি, কে-বা আদম-ব্যাপারি।
কে হয় এন-জি-ও, কার খেলা রকমারি।।
আরো জানি কে-যে দেয়, কাকে দেয় ঘুষ।
না-নিলেই তুমি অন্য পার্টির পুরুষ।।
গণসহি, গণঝাণ্ডা, মেশিন, দানা-ও।
'কাফের মানুষ' : 'ধর্মনিরপেক্ষ নও'।।
সবুজ-গেরুয়া রং বাড়ে জানি কবে।
ফ্যান-ফ্রিজ বিক্রি যদি কমে যায় তবে।।

অতঃপর লাগ্ ভেল্‌কি, লাগো তাড়াতাড়ি।
ব্যবসা গাড়িতে বাপা, বন্ধ হবে বাড়ি।।
পূবালী টিপ্পনী ইহা সমাজ-বাখানে।
এ-সব জানিত কি সে ইহুদি-জার্মানে।।

২.

'আমাদের যুগ, অর্থাৎ বুর্জোয়া যুগের কিন্তু এই একটা সরল বৈশিষ্ট্য আছে;
শ্রেণীবিরোধ এখানে সরল হয়ে এসেছে।'

জীবন গাঙ্গুলী—বিমান কোম্পানির ঝাড়ুদার; বয়স : ছেচল্লিশ, জাতি : ব্রাহ্মণ; গ্রাম : চণ্ডীতলা; স্টেশন : শক্তিগড়; জিলা : হুগলি; সপ্তাহান্তে বাড়ি; চাকুরি জীবন : ছাব্বিশ বৎসর; বর্তমান বেতন : নতুন পে-স্কেলে কত হল জানা যায়না, তবে আগে ও-টি ছাড়া কমবেশি সাত হাজার; ভূ-সম্পত্তি : নিজ নামে সিলিং বরাবর, বাকিটা স্ত্রী-পুত্রের খাতে, আজকাল প্রস্তাবিত কারখানার হোর্ডিং মেরে রাখলেও হচ্ছে; দুধেল গাই : দুটি; হালের বলদ : চারটি; মাখাল বা মুনিষ : তিনটি; পুত্রঃ দুটি; স্ত্রী : একটি; ভদ্রাসন : দ্বিতল। এ-ব্যতীত ফ্রিজ, কেব্‌ল টি-ভি, বড় পুত্রের কিস্তিবন্দী কাওয়াসাকি-বাজাজ এবং ছোটপুত্রের বায়নাক্কায় সদ্য কেনা হিরো রেঞ্জার (নগদ)। তাছাড়া, রান্নাঘরে আপিসের ছাপ মারা দুধ-চিনি-চা-কফি-টাওয়েল-কাপ-প্লেট-মৌরি...টেলিফোন ও কন্যা নাই।

না-না-না আর না...আর কী...আর না...ঐ এক গোছা...
সব এন-এস-সি, ইন্দিরা ইয়ে নামও তো থাকে না,
বড়লোকদের বেপার ওসব, আমার কিন্তু ব্লেক মানি নাই...

বেতনটা বেশি? চোখ টাটাচ্ছে? এই বেতনেই এত কিছু হয়?
হয় নাই তো হে, নেহাৎ ওটি-টা, আর মাঝে মাঝে একেক চালান..
লেবেলটা যদি ঘষা-ঘষা হয়...এই তো কালকে...সোনি টেপ ছিল...
না-না অত খায়...ছয় ভাগ হল...একটা নেবেন? ফেন্সি-র থেকে
কম দামে দেব...

কী কথা বলেন! বাবা-টাবু নই, আমি তো নেহাৎ শ্রমিক মানুষ,
মেম্বার আছি ইউনিয়নের, মে-দিনের লাল ঝাণ্ডা ওঠাই, দুনিয়ার সব
মজদুর ভাই, এক হতে হবে, না-হলে কীভাবে বিপ্লব হবে...
কী হল? পিছনে হাতটা যায় না? কইরে গোবরা, কোতায় মরলি,

হেইপাশে আয়, বাবুর পিছনে তেলটা লাগা তো, কেলে বেটা শুধু
খায় আর খায়, সত্যি বলছি, এই এক কাঁড়ি...গেরস্ত লোক...জোটাই কী করে...

যা বলছিলাম, আমাদেরই শুধু বেতন দেখেন, ঐ পূব পাড়ে কলিমুদ্দির
ঘর দেখেছেন? কোন কাজ নাই, মাস গেলে শুধু বেতনগ্রহণ। কারখানা? সে তো
বন্ধ করবেই। তবু মাস গেলে বেতনটা আসে...অধিগ্রহণ আধগ্রহণ...
আমরা তো বলি 'বেতনগ্রহণ', দেখেছেন ওর জোতের বহর?

'বুর্জোয়া শ্রেণী শাসন চালাবার উপযুক্ত না, কারণ তারা দাসত্বের মধ্যে দাসের অস্তিত্ব
নিশ্চিত করতে অক্ষম, তাদের এমন অবস্থায় না-নামিয়ে পারে না, যেখানে দাসের
দৌলতে খাওয়ার বদলে দাসকেই খাওয়াতে হয়।'

যা বলছিলাম, ভাবলে কতাটা অনেয্য নয়, শুধু কি বেতনে কুলোয় এতটা?
কলিমুদ্দিন বড় পুত্রটি...আমি তো বলব সুপুত্র সেটি...আববে রয়েছে
বছর তিনেক। দেদার পাঠায়, তবে তো এতটা।
আমার দুটো তো? কিস্যু হবে না। চোখ বুজলেই সব বেচে খাবে।
বলেছি ওদের জননীকে সব। বুঝে করবে গা। অপোগণ্ডটা বলে কী—সাদাত
ওয়েল্ডিং করে! আরে বাপু, তুই তাই কর দিকি...

'সমালোচনামূলক কল্পনাশ্রয়ী সমাজতন্ত্রবাদ ও কমিউনিজমের যা তাৎপর্য তার সঙ্গে
ঐতিহাসিক বিকাশের সম্বন্ধটা বিপরীতমুখী।'

৩

লছমনপুর বাথে থেকে আলপথে বেরিয়ে পড়ল কালচে রক্তধারা। হিম আর আতঙ্কে সারা রাত সে জমাট বেঁধেছিল। ভোর তাকে গলিয়েছে—উনিশ-কুড়ি বছর বয়সী বৃদ্ধাদের চিরাচরিত অশ্রুও।

বেরিয়ে পড়ল সে : আলপথে-খেতপথে, শামুকের ভাঙা খোলার উপর দিয়ে, চিৎ হয়ে থাকা কাচপোকাকে ডুবিয়ে, কার্তিক শেষের বাতাসে উড়ে আসা খড়কে ভাসিয়ে, বয়ে চলল, আনমনা, দিগ্বিদিকহীন...।

তাকে মাড়িয়ে গেল পুলিশের বুট, ভূমিহারের নাগরা, লালুপ্রসাদের কেড্‌স্, অটলবিহারীর চপ্পল। সে ভ্রূক্ষেপ করল না।

শুধু একবারই সরে আসতে চেয়েছিল ত্রস্তভাবে। কিন্তু, কোনদিকে যাবে? একদিক থেকে আসছে এম সি সি-র মিছিল। অন্যদিকে লিবারেশন গোষ্ঠী। অন্যান্য দিকে আর সব আনুষ্ঠানিক বামপন্থীরা। চাপা হিসহিসানি ছেয়ে ফেলেছে চারপাশ। বাতাসে ঘোর হয়ে আসছে বারুদের গন্ধ। তবে, গন্ধটা বড় সন্দেহজনক।

এরা তারই আপনজন, তাই এদের পায়ে পিষে-যেতে সে চায়নি। সে চায়নি এদের অনেক কিছুই। চায়নি, এম সি সি-র বুলেট বিঁধুক লিবারেশনের বুকে। লিবারেশনের ব্যারেল তাক করুক সি পি আই-কে। সি পি আই-র থুতু ছিটকে যাক সি পি আই (এম)-র গায়ে; আর, সি পি আই (এম)-র কটূক্তি বিদ্ধ করুক এম সি সি-র নিশান। সে এদের এক দেখতে চেয়েছিল। চেয়েছিল, একটাই অভিন্ন বাম মোর্চা! তবেই সে আবার ফিরতে পারবে ঘরে। উনিশ-কুড়ি বছরের মেয়েরা সত্তরেও তরুণী থেকে যাবে তখনই।

কিন্তু, তার চাওয়ায় রাজনীতির কিছু যায় আসে না। যেমন, বুক ভরা সদিচ্ছাতেও যায়-আসেনা কিছুই। অনবধানেই তাকে পিষে গেল কড়া পড়া, গোড়ালি ফাটা, শিরাবহুল একদল পা। একদঙ্গল বন্ধুজনোচিত খালি পা।

ককিয়ে উঠল সে। হৃদযন্ত্রে কে-যেন ফুটিয়ে দিল সূচ। শ্বাস আটকে এল। প্রবলভাবে কয়েকবার খাবি খেয়ে এলিয়ে পড়ল—লছমনপুর বাথে থেকে ভেসে আসা কালচিটে আকাঙ্ক্ষার ধারা। নিজের থানাটুকুও যে পার হতে পারল না।

ধানের নাড়া-র গায়ে ছিটে হয়ে লেগে থাকল সে। এক কোয়াণ্টা শূন্যতা থেকে নিসৃত কার্তিকের বাতাস সেঁদিয়ে গেল অন্য কোয়াণ্টার বুকে। থ্রি নট থ্রি-র আচমকা নির্ঘোষে ঝটপটিয়ে উড়ে পালাল টিয়ার ঝাঁক। অতঃপর, চিরাচরিত সেই স্তব্ধতা—যা তাকে নির্মাণ করেছিল গত মধ্যরাতে।

'সমগ্রভাবে প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে কমিউনিস্টদের কী সম্পর্ক?...প্রলেতারীয় আন্দোলনকে রূপ দেওয়া বা গড়ে-পিটে তোলাব জন্য তারা নিজস্ব কোন গোষ্ঠীগত নীতি খাড়া করে না।'

৪

ওদের চোখে আমরা এখন বড্ড ভালো, বড্ড সোনা,
ওদের গায়ে সোয়েটারটি আমার লোমে-কাঁটায় বোনা
ওদের গায়ে আমাদের তেল, ওদের চুলে আমাদের জেল,
বিপরীত যে হতেও পারে এমন গপ্পো যায়কি শোনা?
ওদের চোখে আমরা এখন বাধ্য এবং বোধ্য সোনা।

ওরা গড়বে কারখানাটি, আমরা দেব চাষের জমি
আমরা পেতে রাখব আঁচল ওদের যখন উঠবে বমি
আমরা ধারি ওদের টাকা, আমরা পড়ি ওদের লাকাঁ,
বিপরীত যে হতেও পারে এমন কথা শুনছি কমই
ওরা করবে কর্ষণ আর আমরা দেব ভোগ্য জমি।

ওরা রাখবে কাছা এঁটে, আমরা খুলব নীবিবন্ধ
বেগুন-চাষে ওদের আগা, আলুর চাষে ওরা কন্দ
আমার মুখে ওদের ভাষা, আমার চোখে ওদের আশা,
বিপরীত যে হতেই পারে এমন কথা খুবই মন্দ
ওরা শিখবে কামসূত্র, আমরা খুলব নীবিবন্ধ।

'বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রের সর্বোত্তম প্রকাশ শুধু তখনই যখন তা একটা বাক্যালঙ্কার মাত্র। শ্রমিকশ্রেণীর উপকারের জন্য চাই অবাধ বাণিজ্য। সংরক্ষণ শুল্ক শ্রমিক শ্রেণীর উপকারের জন্যই। কারাগার সংস্কার : তাও উপকারের জন্য। বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রের এই হল শেষ ও একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ কথা।

সংক্ষেপে : এই কথাটি দিয়ে বলা যেতে পারে—বুর্জোয়ারা শ্রমিকশ্রেণীর উপকাবের জন্যই বুর্জোয়া।'

৫

রুপোলি বিকেলবেলা ঘূর্ণি হাওয়ার গান শোনো,
আমার শিরায় আজো চুঁইয়ে-চুঁইয়ে জমে রাত
পৃথিবীর মাটি ভেজে এখনো চোখের জলে, তুমি
কথা বলো, কথা বলো, থেকোনা অমন নির্বাক

কার খেত জ্বলে যায়, কার ঘর ভেঙে যায় ঝড়ে
কার গান জমে থাকে ভয়ের গহীন কন্দরে
কার আর কেউ নেই, শুধু মুখে দুঃখের দাগ—
কথা বলো, হে চিরাগ. থেকোনা অমন নির্বাক

কারা কার গ্রাস কাড়ে, কারা ছায় ধর্মের জাল
কার বুকে স্বপ্নেরা আজো করে উথাল-পাতাল
কারা আছে বুক বেঁধে, কার চোখে বিকীর্ণ রাগ
হে চিরাগ, কথা বলো, থেকোনা অমন নির্বাক

কার পাতা ঝরে গেছে, ছেয়ে দাও ঘন সবুজাভা
কার ডানা ভেঙে গেছে, শুশ্রুষা দাও তাকে স্নেহে,
যে কুকুর অভুক্ত, তার মুখে তুলে দাও ভাত
হে চিরাগ—স্বাধীনতা—আমাকে বানাও উন্মাদ

দু'দশ বছর কোন কথা নয় সময়ের স্রোতে
আবার রোশন করো খুব দেরি এখনই না-হতে
তুমি ছাড়া কিছু নেই এ-ভুবনে প্রাপনীয় সাধ
স্বাধীনতা, স্বাধীনতা, আমাকে বানাও উন্মাদ...

'প্রত্যেকটি লোকের স্বাধীন বিকাশ হবে সকলের স্বাধীন বিকাশের শর্ত।'

[এই রচনার প্রারম্ভে একটি উদ্ধৃতি মহাভারতের, আর বাকি সব কমিউনিস্ট ইশতেহার (এন-বি-এ প্রকাশিত) থেকে নেওয়া।

লেখাটি তৈরি হতে পেরেছিল শ্রীজয় গোস্বামীর চাপ, উৎসাহ আর তাড়ায়—একথা মনে করে কৃতজ্ঞ লাগছে।]